রাধে-গোবিন্দ গোপীনাথ, গোপীজন বল্লভ।

শ্রীদীনবন্ধু শর্ম্মা

ভক্তি।

১৯শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ভাদ্র মাস, ১৩২৭ সাল।

মঙ্গলাচরণম্।

"আজানুলম্বিত ভুজৌ কনকাবদাতৌ
সংকীর্ত্তনৈক পিতরৌ কমলায় তাক্ষৌ।
বিশ্বম্ভরৌ দ্বিজবরৌ যুগধর্ম্মপালৌ
বন্দে জগৎ প্রিয়করৌ করুণাবতারৌ॥"

নিতাই নাম।

নিতাই নামটি বড়ই মধুর নিতাই আমার প্রাণ।
শরণাগত কলির জীবে নিতাই করেন ত্রাণ॥
নিতাই আমার সর্ব্বস্বধন নিতাই মাতা পিতা।
নিতাই নিতাই বলরে মন নিতাই প্রেম দাতা॥
নিতাই বিনা হয়না কিছু নিতাই নামটী বড়।
নিতাই নামে আনে প্রাণে গৌর ভক্তি দড়॥
বড়ই মধুর বড়ই করুণ আমার নিতাই চাঁদ।
ঢুক্‌লে কাণে ছাড়তে নারে এমনি প্রেমের ফাঁদ॥
ভবের মাঝে বড়ই চতুর নিতাই ভজে যেই।
নিতাই বিনা কলির জীবের ইষ্ট কেহ নেই॥
সব চিন্তা ছাড়রে মন নিতাই নিতাই বল।
সকলি অনিত্য হেথা নিতাই পারের সম্বল॥

দীন—শ্রীভোলানাথ ঘোষ বর্ম্মা।

জন্মাষ্টমী।

মথুরার রাজা কংশাসুর বড় দুর্দ্দান্ত রাজা ছিলেন। যেমন ক্রূর তেমনি

নিষ্ঠুর। জীবনের প্রভাতেই তিনি নিজ পিতা উগ্রসেনকে কারারুদ্ধ করিয়া নিজে তাঁহার রাজ্যপদ গ্রহণ করিয়াছিলেন, তবে কংস ভগিনী দেবকীর প্রতি একটু স্নেহ ছিল, সেই জন্য পিতাকে কারারুদ্ধ করিবার পরেও ভগিনী যাহাতে উপযুক্ত পাত্রে ন্যস্ত হয় তাহার চেষ্টা করিয়াছিলেন। যদুবংশ সম্ভূত বসুদেবের সহিত ভগ্নির উদ্বাহ ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া যখন স্বীয় সুন্দর রথে নিজ সারথি হইয়া বসুদেব এবং দেবকীকে তাঁহাদের আবাসে পৌঁছাইতে যাইতেছিলেন, তখন পথিমধ্যে দৈববাণী দ্বারা অবগত হন যে এই ভগ্নির অষ্টম গর্ভস্থ সন্তান দ্বারাই তাঁহার ইহজীবনের লীলাখেলা শেষ হইবে। তখন তাঁহার সেই ভগ্নিস্নেহের পরিবর্ত্তে দারুণ হিংসাই অন্তর্ভাব হইয়াছিল। ভগ্নিকে আর পৌঁছাইয়া দেওয়া হইল না, তৎক্ষণাৎ রথ ফিরাইয়া আনা হইল এবং বসুদেব ও দেবকীকে কারারুদ্ধ করা হইল। নিষ্ঠুর হৃদয়হীন কংশ মরণ ভয়ে ভীত হইয়া প্রতিজ্ঞা করিল যে, ভগ্নির গর্ভস্থ সন্তানদিগকে জন্মিবামাত্র শমন ভবনে প্রেরণ করিয়া অদৃষ্টের লেখা খণ্ডন করিবে—নিজের ভগ্নি ও ভগ্নিপতীকে চিরজীবনের জন্য কারারুদ্ধ করিয়া নিয়তিকে ফাঁকি দিবে।

ক্রমে ক্রমে এক একটী করিয়া দেবকীর সাতটী সন্তানকে বিনষ্ট করিয়াও কংশ নিশ্চিন্ত হইতে পারে নাই, কেন না দৈববাণী হইয়াছিল যে, অষ্টম গর্ভস্থ পুত্রই তাহার নাশের কারণ হইবে। দেবকীর এবার সেই অষ্টম গর্ভ এই ভাদ্র মাসেই তাঁহার দশমাস পূর্ণ হইয়াছে, কংশও এবার আরও বেশী সাবধান হইয়াছে। ভগ্নির দশমাস পূর্ণ হইবার পূর্ব্ব হইতেই কারাপহরীর সংখ্যা দ্বিগুণ করিয়া দিয়াছে—কোন ক্রমেই যেন কেহ কারাপ্রাচীরের ভিতর প্রবেশ করিতে বা বাহির হইতে না পারে তাহার বিশেষ ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছে।

আজ কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী, প্রভাত হইতেই গগনমণ্ডল জলদাবৃত, সারাদিনই অল্প অল্প বৃষ্টিপাত হইতেছে, তবে মার্ত্তণ্ডদেব পতিত পাবন ভগবানের আগমন আশায় ধরিত্রী কি প্রকার অবস্থা ধারণ করিয়াছে তাহা দেখিবার জন্য একবার উদয় হইয়া আবার মেঘের ভিতর অন্তর্হিত হইলেন—যামিনী আগমনের পূর্ব্ব হইতেই ধরণী অন্ধকারে আচ্ছন্ন, প্রকৃতি সুন্দরী আজ যেন ভগবানের আগমন আশায় নূতন সাজে সজ্জিত হইয়াছেন বলিয়া তাড়াতাড়ি নিজেকে অন্ধকারে ঢাকিয়া ফেলিয়াছেন। আজ অরুণোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই দেবকীর শরীর অসুস্থ বোধ হইয়াছিল, সারা দিবসে সেই অসুস্থতা ক্রমে বৃদ্ধি হইয়া রাত্রি একপ্রহর অতীত হইতে না হইতেই দেবকীর অবস্থা বেশ খুবা গিয়াছিল। বসুদেব

চিন্তায় আকুল, এই দুর্যোগে বিশেষতঃ রাত্রে সন্তান হইলে কি প্রকারে তাহাকে রক্ষা করিবেন তাহার কোন উপায়ই স্থির করিতে পারিতেছিলেন না। বসুদেব দেবকী সাতটী সন্তান বিসর্জ্জন দিয়াও যে জীবন ধারণ করিয়া আছেন, সে কেবল সেই অষ্টম গর্ভের সন্তানের আশায়। মনে মনে আশা আছে এইবার যে সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবে তাহা দ্বারাই কংশের বিনাশ ও তাহাদের উদ্ধার হইবে। সময় কাহারও অপেক্ষা করে না, যদিও বিপদের ভীত, কারাগার মধ্যে বসিয়া বসুদেব সেই বিপদবারণ মধুসূদনকে ডাকিতেছেন, দেবকীও প্রসব বেদনায় কাতরা হইয়া ভগবানকে স্মরণ করিতেছেন, উভয়েই ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া আছেন। কারা প্রাচীরের বাহিরে প্রহরীদিগের যে চীৎকার ইতিপূর্ব্বে শোনা যাইতেছিল তাহাও ক্রমে নিস্তব্ধ হইল। এমন সময়ে শ্রীভগবান সেই কারা মধ্যে চতুর্ভুজ মূর্ত্তিতে প্রকাশ হইলেন। সেই মূর্ত্তি দর্শনমাত্র স্বামী স্ত্রী উভয়েরই দিব্য জ্ঞান হইল, তখনও মায়া আসিয়া তাহার প্রবল আধিপত্য বিস্তার করে নাই, তাই তাহারা উভয়ে সেই শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারীর স্তব করিতে লাগিলেন, এবং শ্রীমুখের আদেশের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। তখন গোলকবিহারী বলিলেন "বসুদেব! দেবকী! তোমরা আমাকে পুত্ররূপে পাইবার প্রার্থনা করিয়াছিলে, তাই আমায় পুত্ররূপে পাইয়াছ, আমাকে পাইবার জন্য অনেক কষ্ট সহ্য করিয়াছ আর কিছুদিন অপেক্ষা কর আমি শীঘ্রই কংশের নাশ এবং তোমাদের উদ্ধার করিব। এখন আমাকে লইয়া বৃন্দাবনে চল, সেখানে গোপরাজ-মহিষী যশোদা এক কন্যা প্রসব করিয়াছেন আমাকে সেই কন্যার স্থানে রাখিয়া তুমি সেই কন্যা লইয়া মথুরায় প্রত্যাগমন কর—আমি যোগমায়াকে আদেশ দিয়াছি, তাহার প্রভাবে এখন পৃথিবীর যাবতীয় প্রাণিই নিদ্রায় অচেতন, তোমার কোন বিঘ্ন বাধাই ভোগ করিতে হইবে না, আমার কৃপায় তুমি সকল বিপদেই উত্তীর্ণ হইবে। ঐ প্রকার আদেশ শুনিয়া বসুদেব ভূমিষ্ঠ শিশুকে ক্রোড়ে গ্রহণ করিতে যাইয়া দেখেন যে, সেই শিশু আর চতুর্ভুজ নাই স্বাভাবিক মানবের ন্যায় দ্বিভুজ হইয়াছে এদিকে ভগবানের চতুর্ভুজ মূর্ত্তি অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গেই বসুদেব ও দেবকীর হৃদয়ে মায়ার আবির্ভাব হইল। বাৎসল্য রসে প্রাণ ভরিয়া গেল। হরিণী যেমন ব্যাধের ভয়ে নিজ শাবককে নিজ বক্ষের মধ্যে লুকাইয়া রাখে সেই প্রকার দেবকীও সেই শিশুকে লইয়া হৃদয় মধ্যে ধারণ করিলেন। বসুদেব কিন্তু মন বাঁধিয়াছেন এজন্য দেবকীকে শ্রীভগবানের আদেশ স্মরণ করাইয়া দিয়া—শিশুকে তাহার ক্রোড় হইতে নিজ

ক্রোড়ে গ্রহণ করিলেন। এখনি শিশুকে নন্দালয়ে লইয়া যাইবেন, ভগবানের কৃপায় সকল বিঘ্ন উত্তীর্ণ হইবেন মনে সে বিশ্বাস থাকিলেও এক একবার শঙ্কা হইতেছে যে, এই ভীষণ দুর্ভেদ্য লৌহকপাট বুঝি খুলিবে না, আর দ্বার খুলিলেইত সম্মুখে সেই নৃশংস কারাপ্রহরী। আবার দীননাথের সেই অভয়বাণী মনে হইতেছে। বসুদেব শিশুকে বক্ষে লইয়া আস্তে আস্তে কপাট টানিলেন সেই লৌহ দ্বার নিঃশব্দে খুলিয়া গেল বাহিরে আসিলেন, আসিয়া দেখেন প্রহরীগণ সব গাঢ় নিদ্রায় অচেতন, বাহিরের প্রকৃতির অবস্থা তখনও পূর্ব্বের ন্যায় ভয়ানক। তথাপি বসুদেব অনেক আশ্বস্ত হইয়াছেন—দীনবন্ধুর কৃপায় এক ফোঁটাও বৃষ্টির জল তাহার গায়ে পড়িতেছে না, কে যেন তাহাদের মস্তকে ছত্র ধারণ করিয়াছে—এই প্রকার চিন্তা করিতে করিতে বসুদেব যমুনাতীরে উপস্থিত। শ্রীবৃন্দাবন যমুনার পরপারে, সেখানে যাইতে হইলে যমুনা পার হইতে হইবে। নদীতীরে আসিয়া বসুদেব দেখিলেন খেয়াঘাটে জনমানব নাই বা পারের উপযুক্ত কোন নৌকাও নাই, এদিকে বর্ষা সমাগমে যমুনা পরিপূর্ণা তার উপর আজ আবার তার বক্ষের উপর দিয়া গোলকনাথ পার হইবেন এই আনন্দে যমুনা আজ গর্ব্বে আরো স্ফীতা—দু'কূল প্লাবিতা। বসুদেব তীরে দাঁড়াইয়া চিন্তা করিতেছেন কি প্রকারে পরপারে যাইবেন, এমন সময় বিদ্যুতের আলোকে বসুদেব দেখিলেন—একটা শৃগাল হাঁটিয়া নদীপার হইল, তখন বসুদেব বুঝিতে পারিলেন—কেন এখানে নৌকাদি নাই। জল এখানে এত অল্প যে সকলে হাঁটিয়াই নদীপার হয় সুতরাং নৌকার আবশ্যক হয় না। তখন তিনিও হাঁটিয়া নদীপার হইতে চলিলেন। যমুনার মধ্যস্থলে উপস্থিত হইলে ক্রোড়স্থ শিশু হঠাৎ তাহার বক্ষচ্যুত হইয়া জলমধ্যে পড়িয়া গেল। বসুদেব হাহাকার করিয়া চারিদিক অনুসন্ধান করিতেছেন। কিন্তু শিশুকে পাইতেছেন না। এদিকে ভগবান তখন যমুনার বাঞ্ছাপূর্ণ করিতেছেন। যমুনা এক একবার সেই বিরিঞ্চিবাঞ্ছিত শ্রীচরণ হৃদয়ে ধারণ করিতেছেন। যমুনা ভগবানকে হৃদয়ে পাইয়া শীঘ্র বিদায় দিতে চাহিতেছেন না দেখিয়া ভগবান তাহাকে আশ্বাস দিয়া কহিলেন "যমুনে! অধিকক্ষণ আমাকে বক্ষে ধারণ করিতে পাইলে না বলিয়া কাতর হইও না, এই যুগলীলার শ্রেষ্ঠ অংশ আমার বড় সাধের প্রেমলীলা তোমার তীরে নীরেই অভিনীত হইবে, তুমি প্রাণ ভরিয়া দেখিও। বসুদেব তখনও যমুনার মধ্যে দাঁড়াইয়া নিজ অদৃষ্টকে ধিক্কার দিতেছেন ও যমুনায় শিশুর অন্বেষণ করিতেছেন। এবার শিশু ভাসিয়া উঠিলে বসুদেব তাহা দেখিয়া তাড়াতাড়ি বুকে

তুলিয়া লইলেন এবং বিশেষ সাবধান পূর্ব্বক চলিয়া নদীপার হইলেন। শ্রীবৃন্দাবনে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে সেখানে জনমানবের সাড়া নাই সেখানেও সকলে ঘোর নিদ্রায় নিদ্রিত। ক্রমে ক্রমে বসুদেব নন্দরাজের পুরীতে উপনীত হইলেন, দেখিলেন পুরীর দ্বার উন্মুক্ত, প্রহরীরা নিদ্রিত, তখন পুরমধ্যে প্রবেশ করিয়া বসুদেব একেবারে সুতিকাগারে উপস্থিত হইলেন, সেখানেও দেখিলেন নন্দরাজ মহিষী যশোদা এক কন্যা প্রসব করিয়া মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িয়া আছেন, ধাত্রী প্রভৃতি সকলেই অচেতন কেবলমাত্র সদ্যপ্রসূত কন্যাটী চেতন অবস্থায় মাতৃ-ক্রোড়ে শুইয়া আছে। বসুদেব তখন ভগবানের আদেশ স্মরণ করিয়া নিজ সন্তানকে যশোদার ক্রোড়ে অর্পণ করিয়া তাহার পরিবর্ত্তে যশোদার কন্যাকে নিজ ক্রোড়ে গ্রহণ করিয়া যখন রাজপুরীর বাহির আসিলেন তখন দেখিলেন রাত্রি তৃতীয় প্রহর অতীত হইয়াছে--তাহা দেখিয়া বসুদেব আর এক মুহূর্ত্তকালও অপেক্ষা না করিয়া সেই কন্যাকে লইয়া মথুরায় চলিয়া আসিলেন। মথুরায় তাহাদের আবাস স্থান সেই কারাগারের সম্মুখে আসিয়া দেখিলেন তখনও দ্বার যে ভাবে তিনি মুক্ত রাখিয়া গিয়াছিলেন সেই ভাবেই উন্মুক্ত রহিয়াছে, প্রহরীরাও সব নিদ্রিত। তখন বসুদেব কারাগার মধ্যে প্রবেশ করিলেন ও দেবকীর ক্রোড়ে সেই সদ্যপ্রসূতা কন্যাকে অর্পন করিলেন। কন্যাটী দেবকীর ক্রোড়ে যাইয়া কাঁদিয়া উঠিল, সেই ক্রন্দন শব্দে প্রহরীদের নিদ্রা ভঙ্গ হইল, পৃথিবী আবার যেন জাগিয়া উঠিল। চারিদিকে সাড়া পড়িয়া গেল, প্রহরীরা তৎক্ষণাৎ কারাধ্যক্ষের নিকট সংবাদ দিল যে, রাত্রে রাজার ভগ্নির একটী সন্তান হইয়াছে—কারাধ্যক্ষ তৎনই রাজবাটীতে সংবাদ দিবার জন্য ছুটিল। কংশ সংবাদ পাইবা মাত্র আজ্ঞা প্রচার করিল "এখনি সেই সদ্যোজাত শিশুকে লইয়া আইস, তাহাকে নিজহস্তে বধ করিয়া চিরদিনের জন্য নিশ্চিন্ত হইব।" কংশ মনে মনে ভাবিতেছে এইত দেবকীর অষ্টম গর্ভের সন্তান, ইহাকে এখনি বিনাশ করিব, তবে আর আমার ভয় কি।

আদেশ মাত্রই অনুচর দেবকীর নিকট হইতে শিশুকে আনিতে ছুটিল। দেবকী অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া কংশচরকে বলিল "এটীত পুত্র নয় এটী কন্যা আমার পুত্র হইতেই রাজার ভয় কন্যা হইতে তাহার কি অনিষ্ট হইতে পারে যে তিনি এই সদ্যজাত কন্যাকে বধ করিবেন, অতএব তুমি দয়া করিয়া আর একবার রাজার নিকট যাইয়া আমার প্রার্থনা জ্ঞাপন কর, যদিও আমি আমার সাতপুত্রকে তাহার হস্তে বধের জন্য দিয়াছি, এক বারের জন্যও

তাহাতে আপত্তি করি নাই, কারণ সে সকল পুত্রসন্তান ছিল, দৈববাণী আমার পুত্রের দ্বারাই তাঁহার অনিষ্ট হইবার কথা ঘোষণা করিয়াছে,—কন্যা হইতে ত তাঁহার কোন অনিষ্টের কথা বলে নাই, এখন রাজা যদি এই কন্যাটিকেও অভয় দেন তাহা হইলে আমি সেই সকল পুত্রশোক অনেক ভুলিতে পারিব।” কংশচর পুনরায় রাজার নিকট আসিয়া ঐ সমস্ত কথা বলিল; তখন কংশ ক্রোধে অনুচরকে অনেক ভর্ৎসনা করিয়া আদেশ দিল, যদি সে এই মুহূর্ত্তে সেই কন্যাকে দেবকীর নিকট হইতে লইয়া না আইসে তবে তাহারও প্রাণদণ্ড হইবে। দেবকীও যদি সেচ্ছায় না দেয় বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিবে। সে সামান্য প্রহরী, পরের জন্য নিজের প্রাণ দিতে পারে না? তাই সে ছুটিয়া পুনরায় দেবকীর সন্নিধানে উপস্থিত হইল ও বলপূর্ব্বক দেবকীর ক্রোড়স্থ কন্যাটিকে লইয়া রাজার নিকট প্রস্থান করিল। নিষ্ঠুর হৃদয়হীন অসুর সেই কংশ যখন কন্যাটিকে হাতে পাইল তখন মুহূর্ত্ত মাত্র চিন্তা না করিয়া তাহার পদদ্বয় ধরিয়া সম্মুখস্থ শিলাখণ্ডে আছাড় মারিবার জন্য স্বীয় মস্তকোপরি উত্তোলন করিবামাত্র সেই সদ্যোজাত কন্যা তাহার হস্তচ্যুত হইয়া শূন্যমার্গে চলিয়া গেল, যাইবার সময় দৈববাণীতে বলিয়া গেল,—

“তোমারে বধিবে যে গোকুলে বাড়িছে সে
দেখ গিয়া নন্দঘোষের ঘরে।”

“যিনি যুগে যুগে ধর্ম্মস্থাপনের জন্য ও অধর্ম্মের বিনাশ জন্য অবতীর্ণ হন তিনিই তোমার বধ সাধন করিবেন।” দুরাচার কংশের বোধ হইতে লাগিল এই কথার প্রতিধ্বনি যেন সমস্ত পৃথিবীময় ঘোষণা করিতেছে,—

তোমারে বধিবে যে গোকুলে বাড়িছে সে
দেখ গিয়া নন্দঘোষের ঘরে।

শ্রীসতীশচন্দ্র ঘোষ বাগুই।

শ্রীল প্রভুপাদের কৃপাপত্র।

পরম প্রীত্যাস্পদ শ্রীমান্ ভক্তিসম্পাদক ভাইজীউ—

ভাই দীনেশ, তোমার সুবিখ্যাত ভক্তি পত্রিকায় প্রকাশিত “শ্রীশ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়ার যুগল ভজন” শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করিয়া, বিশেষতঃ তোমার সম্পাদকীয় মন্তব্যে তুমি এ সম্বন্ধে কিছু বলিবার জন্য অনুরোধ করায়, আমার কিছু বলা

আবশ্যক বিবেচনা করিয়া সংক্ষেপে দুই একটী কথা বলিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

বর্ত্তমান সময়ে ধর্ম্মজগতের যেরূপ অবস্থা তাহাতে এ জাতীয় প্রবন্ধ সম্বন্ধে কিছু বলিতে প্রবৃত্তি হয় না। কিন্তু ক্রমেই এই এক কথা লইয়া নানা পত্রিকায় এমন কি সভাসমিতিতেও যেরূপ বাগ্‌যুদ্ধ চলিতেছে তাহাতে একেবারে কিছু না বলিলে ধর্ম্মহানি আশঙ্কায় বলিতে হইতেছে। সংবাদপত্রে এই ভাবের আলোচনা যে কলিযুগের স্বধর্ম্মোচিত বলা বাহুল্য।

পরম কারুণিক সদ্ধর্ম্ম প্রবর্ত্তক শ্রীশ্রীমহাপ্রভু কলিজীবের দুর্গতিতে কাতর হইয়া তাহাদের পরম কল্যাণের পথ প্রদর্শন মানসে যুগানুগত ধর্ম্মের প্রচার ও তদনুরূপ শ্রীমূর্ত্তিতে জগতে প্রকট হইলেন।

তিনি বঙ্গদেশে ও বাঙ্গালি জাতির মধ্যে সগণে পরিবৃত হইয়া আবির্ভূত হইয়া এদেশ ও জাতিকে যে ধন্য করিয়াছেন, এবং এ দেশবাসী যে তাঁহার বিশেষ কৃপার পাত্র হইয়াছিলেন এ কথা সানন্দভরে মুক্তকণ্ঠে সকলেই উদ্‌ঘোষিত করিবে, সন্দেহ নাই।

স্বয়ং ভগবানের জগতে আবির্ভাব কখনও একটীমাত্র উদ্দেশ্য লইয়া হয় না; বহির্দৃষ্টিতে কোন উদ্দেশ্য লক্ষিত হইলেও তদভ্যন্তরে কোন গূঢ় রহস্য নিহিত থাকে। আজ বৃন্দাবনের ব্রজেন্দ্র নন্দন শ্রীধাম নবদ্বীপে শচীনন্দন রূপে প্রকট হইলেন। জগৎবাসী তাঁহার প্রকট লীলার অনির্ব্বচনীয় মাধুর্য্য দর্শনে মুগ্ধ হইল; আপামর ব্রাহ্মণ হইতে চণ্ডাল পর্য্যন্ত সকলে হরি নামের সুমধুর কীর্ত্তনে জগৎকে মুখরিত করিয়া তুলিল, সংসার নূতন আকার ধারণ করিল। জগত এতদিন ভগবান্‌কে ভীতির চক্ষে দেখিয়া সন্ত্রস্ত হইয়া তাঁহার উপাসনা করিত, কিন্তু আজ তাহা বিদূরিত হইল। আজ কি করিয়া তাঁহাকে ভাল-বাসিতে হয়, কি করিয়া তাঁহাকে নিজের করিতে পারা যায় তাহা শিখিল। কোন্ উচ্চ ভজনের ফলে তিনি অর্জ্জুনের সারথ্য, যশোদার বন্ধন, গোপবালক-গণের ও গোপীগণের উচ্ছিষ্ট সাদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই নবোদ্‌ঘাটিত প্রেমের পন্থা প্রকাশিত হইল। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষরূপ চতুর্ব্বিধ পুরুষার্থ যে পুরুষার্থই নহে, প্রেমই যে জীবের পরম পুরুষার্থ—ইহা তিনি আপামর জীবের দ্বারে দ্বারে যাইয়া উপদেশ করিলেন। যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা ও সমাধিকে হীন গৌরব করিয়াদিলেন। হাসিয়া কাঁদিয়া নাচিয়া গাহিয়া যে তাঁহাকে প্রেমের বন্ধনে বাঁধিতে পারা যায়, সেই পরম পুরুষার্থ প্রেম লাভের উপায় জগৎবাসীকে উপদেশ করিলেন ও স্বয়ং আচরণ করিয়া দেখাইলেন।

পাছে শাস্ত্রের কূটার্থে উপদিষ্ট তত্ত্ব ভিন্নাকার ধারণ করে সেই জন্য স্বয়ং আচরণ করিলেন। এ কৃপা আর কোথাও নাই, সহস্র সহস্র বৎসর ব্যাপী অনশনে থাকিয়া তপোক্লেশ সহ্য করিয়াও যাহা কোন দিন কেহ পায় নাই বা প্রাপ্তির সম্ভাবনা ছিল না, আজ তাহা স্বয়ং আচরণ করিয়া জীবকে শিক্ষা দিয়া অনায়াস সাধ্য করিয়া দিলেন। উপাসনার পথ দেখাইবার জন্য, শাস্ত্রবাক্যের অক্ষুণ্ণ মর্য্যাদা রক্ষা করিবার জন্য স্বয়ং আচরণ করিলেন, "আপনি আচরি ধর্ম্ম জীবেরে শিখায়"। জীব। এমন মহাজন আর কোথায় পাইবে? যাহার পথানুসরণের বিষয় শাস্ত্র নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যাবতারের ইহাই বাহিরের উদ্দেশ্য বা গৌণ কারণ। কিন্তু অন্তরঙ্গ কার্য্য জীবের দুর্ব্বোধ্য বা অজ্ঞেয়। তবে কৃপাশক্তির প্রেরণায় শ্রীকবিরাজ গোস্বামী প্রমুখ তাঁহার বিশেষ কৃপাপাত্রেরা নিজ নিজ গ্রন্থে যাহা ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন জীবের সেইটুকুই বোধগম্য হইতে পারে, এবং এই অন্তরঙ্গ কার্য্যের অংশাবলম্বনই ভজন ও ভজনীয় তত্ত্বের উপদেশ; কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন "অন্তরঙ্গ কার্য্য নিজ রস আস্বাদন" শ্রীকৃষ্ণাবতারে যাহা অবশিষ্ট ছিল, যাহার মাধুর্য্য দেখিবার বাসনায় ব্রহ্মা বৎস ও গোপবালকগণকে হরণ করিয়াও সম্পূর্ণ দেখিতে পান নাই, যাহার সূচনা মাত্র দেখিয়াছিলেন, ও অবশেষে স্বয়ং মোহিত হইয়া অখিল ব্রহ্মাণ্ডপতি অনন্ত ষড়ৈশ্বর্য্যের আধার-ভূত স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে, "পশুপাঙ্গজায়" শব্দে অভিহিত করিয়াছিলেন। সেই ভগবানের মাধুর্য্যেরই প্রকাশ বিশেষ মূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গ। চিরদিন যে হ্লাদিনী শক্তির মাধুর্য্য স্বয়ং রসরাজ ও মাধুর্য্য হ্লাদিনী শক্তিরসার মহাভাবরূপা শ্রীমতী রাধিকার পৃথক ভাবে পরস্পর আস্বাদন করিয়া আসিতেছিলেন, আজ তাহার একত্রে এক যোগে আস্বাদ অভিপ্রায়ে রসরাজ মহাভাব উভয় মূর্ত্তি এক হইয়া গেলেন, ইহাই এ অবতারের বৈশিষ্ট।

তাই কবিরাজ গোস্বামী বৃন্দারণ্যের নিত্য নব নব বৃক্ষতলাশ্রয়ী শ্রীরূপ গোস্বামীপাদের বাক্য উদ্ধৃত করিয়া দেখাইলেন—

রাধাকৃষ্ণ প্রণয় বিকৃতি হ্লাদিনী শক্তিরস্মা-
দেকাত্মানাবপি ভুবি পুরা দেহ ভেদং গতৌ-তৌ॥
চৈতন্যাখ্যং প্রকট মধুনা তদ্বয়ঞ্চৈক্যমাপ্তং।
রাধা ভাব দ্যুতি-সুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপং॥

এই শ্লোকে শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-তত্ত্ব এবং পরবর্ত্তি শ্লোকে তাঁহার উদ্দেশ্য ও

তৎসঙ্গে জীবের ভজনীয় তত্ত্বের নির্দ্দেশ করিলেন।—

"শ্রীরাধায়াঃ প্রণয় মহিমা কীদৃশো বানয়ৈবা
স্বাদ্যো যেনাদ্ভুত মধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ।
সৌখ্যঞ্চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশং বেতিলোভাৎ-
তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভ সিন্ধৌ হরীন্দুঃ।

ইহা হইতে আমরা উক্ত অবতারের উদ্দেশ্য এবং ভজনীয় পরতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যদেবকেই পাইতেছি। জীবকে যে প্রেম ভক্তির শিক্ষা প্রদান করিলেন, সে প্রেম কাহার? ইহার অনুশীলনে দেখা যায় যে, শ্রীমতী রাধিকার প্রেমই স্বয়ং অঙ্গীকার করিলেন, এবং জীবকে তাহাই শিক্ষা দিলেন, ইহাই গৌড়ীয়-বৈষ্ণব দর্শনের মুখ্য উপাসনা।

সেইজন্য শ্রীরূপ গোস্বামিপাদ অপর স্তোত্রে লিখিলেন

অপারং কস্যাপি প্রণয় জনবৃন্দস্য কুতুকী
রসস্তোমং হৃত্বা মধুরম্‌ উপভোক্তুং কমপি যঃ।
রুচং স্বামাবব্রে দ্যুতিমিহ তদীয়াং প্রকটয়ন
স দেবশ্চৈতন্যাকৃতিরতিতরাং নঃ কৃপয়তু॥

অর্থাৎ যে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কৌতুহলের বশবর্ত্তী হইয়া নিজ প্রণয়ী গোপীজন-নিকরের মধ্যে শ্রীরাধার অপার অনির্ব্বচনীয় মধুর রস সমূহকে আহরণ করতঃ উপভোগ করিবার জন্য তাঁহার অঙ্গকান্তি প্রকটে নিজ শ্যাম কান্তিকে আবরণ করিয়াছেন সেই চৈতন্যাকৃতি শ্রীকৃষ্ণ আমাদিগকে অত্যন্ত কৃপা করুন। ইহা হইতে আমরা পরমমধুর সাকার মূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যের উপাসনা করিলেই যে তাঁহার শক্তিবর্গের শ্রেষ্ঠরূপা শ্রীমতী রাধিকার সহিত তাঁহার উপাসনা করা হইবে তাহা স্পষ্টই দেখিতে পাইতেছি, এবং ইহাই গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের চরম উপাসনা। যে অবস্থায় বা লীলায় এই মাধুর্য্যের পূর্ণবিকাশ প্রকট হইয়াছে সেই অবস্থা বা সেই মূর্ত্তিই উপাস্য। শ্রীবৃন্দাবন লীলায় আমরা একই শ্রীকৃষ্ণকে তিন অবস্থায় বিকাশ দেখিয়া থাকি। দ্বারকালীলায় তাঁহার পূর্ণত্বের বিকাশ, মথুরালীলায় পূর্ণতরত্বের বিকাশ এবং শ্রীবৃন্দাবন লীলায় পূর্ণ-তমত্বের বিকাশ উপলব্ধি করিয়া থাকি। কারণ আনন্দময় ভগবানের বৃন্দাবনে শুদ্ধ মাধুর্য্যের বিকাশ ছিল বলিয়াই তিনি তদবস্থায় পূর্ণতম। শ্রীনবদ্বীপ লীলায় ইহা একটু পরিবর্ত্তিত হইল। প্রথম বা আদিলীলায় তাঁহার ঐশ্বর্য্য মিশ্রিত মাধুর্য্যের দ্বারা পূর্ণত্বের, দ্বিতীয় বা মধ্যলীলায় সন্ন্যাস গ্রহণের পর তীর্থভ্রমণাদি কালে ঐশ্বর্য্যের

কিঞ্চিৎ হ্রাস হইয়া মাধুর্য্যের পূর্ণ বিকাশায় পূর্ণতরত্বের এবং অন্তলীলায় যেখানে ঐশ্বর্য্যের গন্ধমাত্রও নাই এমন সম্পূর্ণ মাধুর্য্যের বিকাশে পূর্ণতমত্বের উপলব্ধি করিয়া থাকি।

এই জন্যই আজ গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণ বসুদেব নন্দন কৃষ্ণের উল্লেখ করিয়া 'আরাধ্যো ভগবান ব্রজেশ তনয়ো" ইত্যাদি বাক্যে গোপীগণের অনুগত হইয়া শ্রীনন্দনন্দন গোপীজনবল্লভ কৃষ্ণের উপাসনার বিষয় উপদেশ করিয়াছেন, কিন্তু তাই বলিয়া যে বসুদেব নন্দন উপাস্য নহেন বা উপাসনা করিতে হইবে না বা করিলে কি ক্ষতি হইবে এমন কথা বলা হয় নাই।

এখন পাঠক মহাশয়গণ বুঝিবেন শ্রীশ্রীগৌর বিষ্ণুপ্রিয়ার যুগল ভজন গৌড়ীয় বৈষ্ণবের উপাস্য এবং ভজনীয় কিনা?

উক্ত ভজন বিষয়ক প্রবন্ধ লেখক যে তাঁহার প্রবন্ধে কি লিখিয়াছেন তাহার কোন মাথামুণ্ডু খুঁজিয়া পাইলাম না। "যদা যদাহি ধর্মস্য" ইত্যাদি অবতার-তত্ত্বের কথা কহিয়া তিনি ক্রমোন্নতিবাদের অবতারণা করিয়া যে উর্ব্বর মস্তিষ্কের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন তাহা আদৌ প্রাসঙ্গিক নহে।

দ্বিতীয়, শ্রীকৃষ্ণ "পরতত্ত্ব নহেন" এ শাস্ত্র তিনি কোথায় পাইলেন, তাহা শাস্ত্রবাক্যের সহিত দেখাইলে ভাল হইত। তিনি একস্থানে লিখিয়াছেন—"যদি শ্রীরাম-সীতা ও শ্রীরাধা কৃষ্ণ ভজন শাস্ত্রসম্মত হয়, তবে শ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া ভজন অশাস্ত্রীয় হইবার কোনও যুক্তি নাই।" লেখক কি উদ্দেশ্যে এ কথা লিখিয়াছেন তাহার অর্থ বুঝিলাম না।

যে জাতির মধ্যে শিলাশিলাও, কুলাল চক্র, হল, স্বর্ণকারের যন্ত্র পূজায় শাস্ত্রীয় যুক্তি ও বেদ চিরকাল হইতে উদ্ঘোষ্যমান রহিয়াছে, যে জাতি তেত্রিশকোটী দেবতার আরাধনা করিয়া থাকে সেই জাতির মধ্যে শ্রীভগবানের শক্তি লক্ষ্মীগণের অন্যতমা পতিব্রতা শিরোমণি শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণীর আরাধনা হইবে না— এ কথা কোন পাষণ্ডও বলিতে পারে না, অপরের কথা কি। প্রবন্ধ লেখক—অনেক বাজে কথার অবতারণা করিয়াছেন। স্বকীয়া পরকীয়া রস দেখাইতে গিয়াছেন কিন্তু আলোচনার প্রণালী দেখিলে মনে হয় ঐ বিষয় তিনি কিছুই বোঝেন নাই। গোস্বামীপাদগণের রচিত কোন গ্রন্থ অধ্যয়ন করিলে এরূপ ভাবে স্বকীয়া পরকীয়া ভাব লিখিতে যাইতেন না।

অবশেষে বক্তব্য যিনি এই তত্ত্ব ও গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের উপাস্য কি তাহার বিষয় জানিতে ইচ্ছা করিবেন তিনি শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর সহিত রায় রামানন্দ

মহাশয়ের কথোপকথন বিশেষ মনোযোগসহ পড়িবেন, অথবা আমাদিগের পরম সুহৃদ বিদ্বদ্‌কুল-গৌরব পণ্ডিত শ্রীল রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ মহাশয় বিরচিত "রায় রামানন্দ" গ্রন্থ পাঠ করিলে সমস্ত সন্দেহ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া প্রকৃত উপাস্য-তত্ত্বের নির্ণয় করিতে সক্ষম হইবেন। অলমিতি।

শ্রীসত্যানন্দ গোস্বামী (সিদ্ধান্তরত্ন)।

শ্রীচৈতন্যাষ্টকের বঙ্গানুবাদ।

(১)

প্রেমের প্রাবল্য বশে আসিয়া মানব বেশে
বহু ভাগ্যমানি', থাকি' অবনী উপর।
লক্ষীবান যে গউরে সদা উপাসনা করে
গিরীশ শ্রীপতি আদি অমর নিকর॥
শ্রীস্বরূপ দামোদর আদি যত ভক্তবর
শিখাইলা সবে, যেই প্রেমের আকর।
কর্ম্ম যোগে অনাবৃত স্বভজন রীতি যত
আর কি হবেন তিনি নয়ন গোচর?

(২)

সুরেশ আদির ত্রাণ পাইতে নির্ভয় স্থান
সর্ব্ব উপনিষদের সাধ্য পরতম।
ইহ পরলোক দ্বয়ে মানে যাঁরে মুনিচয়ে
অখিল সর্ব্বস্ব নিধি অভীষ্ট পরম॥
দাস্য রসাশ্রিতগণ যাঁরে করে নিরীক্ষণ
দাস্য ভক্তি মধুরতা যেন মূর্ত্তিধর।
যিনি গোপললনার শুদ্ধ-প্রেম ঘনসার
আর কি হবেন তিনি নয়ন গোচর?

(৩)

ত্রিভুবনে নিরুপম যাঁর প্রেম ভক্তি ধন
হেন স্বরূপের গোষ্ঠী কৃপাসুধাদানে।
অদ্বৈতের অতিপ্রিয় শ্রীবাস পণ্ডিতাশ্রয়
পরম পুরীয়ে তোষে গুরু আচরণে॥

উৎকলেশ গজপতি অনুগ্রহে তাঁর প্রতি
ত্বরান্বিত যেই গৌর দীনদুঃখ হর।
বিশ্বপ্রেম পরায়ণ সেই গৌর প্রাণধন
আর কি হবেন মম নয়ন গোচর ?

(৪)

যাঁহার উজ্জ্বল কায় অর্ব্বুদ কন্দর্প প্রায়
সুমধুর রসের আধার সুমোহন।
জিতেন্দ্রিয় যতীগণ উত্তমাঙ্গ বিভূষণ
অরুণ করাত যার গৈরিক বসন।
গঞ্জিয়া সুবর্ণ শোভা সমধিক মনোলোভা
যাঁহার অঙ্গের প্রভা নেত্র সুখকর।
শ্রীরাধার কান্তিচোর সেই মোর প্রাণগোর
আর কি হবেন মম নয়ন গোচর ?

(৫)

জপিতেন হরেকৃষ্ণ উচ্চকণ্ঠে অতিস্পষ্ট
নাচিত রসনা নাম মূর্ত্তি পরশিয়া।
সংখ্যা রাখিবার তরে গ্রন্থি করি কটি ডোরে
বামকরে রাখিতেন সে গ্রন্থি ধরিয়া॥
শ্রবণান্ত নেত্রদ্বয় দীর্ঘার্গল ভুজ দ্বয়
খেলারসে আন্দোলিত যাঁর নিরন্তর।
শ্রীরাধার ভাব চোরা সেই মোর প্রাণ-গোরা
আর কি হবেন মম নয়ন গোচর ?

(৬)

সিন্ধুকূলে কুসুমিত উপবন শ্রেণী কত
নিরখিয়া বৃন্দারণ্য স্মরি' অনিবার।
সেই স্মৃতি সহজাত প্রেমে হ'য়ে ধৈর্য্যচ্যুত
ভাবের ভূষণে অঙ্গশোভিত যাঁহার॥
কোথাও বা কৃষ্ণ কৃষ্ণ আবৃত্তি করিয়া স্পষ্ট
নাচিত রসনা যাঁর জুড়ায়ে অন্তর।
ভকতি রসিক গোরা মোর প্রাণ মনচোরা
আর কি হবেন মম নয়ন গোচর ?

(৭)

নীলাচল-পতি রথে আরোহিলে, রাজপথে
বিপুল প্রেমের উর্মি জনিত নর্ত্তনে।
মহোল্লাসে নিমগন হইলা যে গৌরাধন
হইতেন অচেতন রথ সন্নিধানে॥
সর্ব্ব কীর্ত্তন রত পার্ষদ বৈষ্ণব যত
রাখিত যাঁহার তনু মণ্ডলী ভিতর।
কৃষ্ণপ্রেমে গর গর সে গৌর সুন্দর বর
আর কি হবেন মম নয়ন গোচর?

(৮)

উচ্চকণ্ঠে সংকীর্ত্তনে আনন্দে বিহ্বল মনে
প্রেমাশ্রু ধারায় ধরা করিয়া সিঞ্চিত।
কদম্ব নব কেশর জিনিয়া নিবিড় তর
রোমহর্ষে রমণীয় অঙ্গ বিভূষিত।
ঘন স্বেদবিন্দু বর ব্যাপ্ত তনু রসময়
মুকুতা খচিত যেন স্বর্ণ তরুবর।
কলিভয় বিনাশন সেই গৌর প্রাণধন
আর কি হবেন মম নয়ন গোচর?

(৯)

সুবিশ্বাসে সমুজ্জ্বল বুদ্ধি যাঁর নিরমল
এ গৌর-অষ্টক হেন বিদ্যাবান নর।
একান্ত ভকতি ভরে অধ্যয়ন যদি করে,
গৌরপদে প্রেম তার স্ফুরুক সত্বর॥

(১০)

প্রভু শ্রী-বিপিন বিহারী চরণ
স্থাপিয়া মানস-সিংহ আসনে।
যুগল চরণে শির লাগাইয়া
বন্দনা করিয়া অনন্য মনে॥
গৌর প্রেমদূত 'রামদাস' আজ্ঞা
শিরে ধরি তাঁর করুণা বশে।

গৌড়ীয় ভাষায় গৌরাঙ্গ অষ্টক
প্রকাশে অধম বিনা আয়াসে ॥
জনক ঈশ্বর মাতা আহ্লাদিনী
নিত্য ভজনাখ্য শ্রীসত্য দাস।
দাও পদরজ গৌর ভক্তবৃন্দ
ও পদ রেণুতে সতত আশ।

শ্রী[illegible]চরণ দাস।

শ্রীশ্রীঈশ্বরতত্ত্ব।

অবয়ব-তত্ত্ব। ভগবান দেখিতে নরাকৃতি হইলেও তাঁহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও তত্তৎ শক্তি বা ক্রিয়াদি মানবের ন্যায় নহে।

মানুষের দেহ যেমন রক্তমাংসময় পিঞ্জর স্বরূপ, ভগবানের সেরূপ নহে। মানুষের আত্মা যেমন মায়াবশযোগ্য অতি সূক্ষ্ম চিৎকণা, ঈশ্বরের সেরূপ নহে। তাঁহার দেহও যে পদার্থ, আত্মাও সেই সচ্চিদানন্দময় পদার্থ। স্বল্পাক্ষরে বলিলে বলিতে হয় তাঁহাতে দেহ দেহী ভেদ নাই। তিনি মায়া বশ যোগ্য নহেন। মায়া তাঁহার দাসী।

মানুষের চক্ষুতে যেমন দর্শন ব্যতীত শ্রবণ বা আঘ্রাণাদি অন্য কোন ক্রিয়াই সম্ভবপর হয় না, মানুষের শ্রবণেন্দ্রিয়ে যেমন কেবলমাত্র শ্রবণ ব্যতীত দর্শন বা আস্বাদনাদি অপর কোন কার্য্যই সম্পন্ন হয় না, ঈশ্বরের সেরূপ নহে। তদীয় প্রত্যেক অঙ্গই সকলেন্দ্রিয় বৃত্তিশীল। "অঙ্গানি যস্য সকলেন্দ্রিয় বৃত্তিমন্তি" (ব্রহ্মসংহিতা।)

অবতার চরিত্র পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায়, কেহ কোন কার্য্য মনুষ্যোচিত ভাবে করিতেছেন আবার অপর কার্য্য অলৌকিক ভাবে করিতেছেন। অবতারী ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবে দেখিতে পাই, দেহ-সম্বন্ধ ব্যতীত আবির্ভূত হইলেন, লীলা সম্বরণ কালে কিন্তু অন্যরূপ। ভগবান শ্রীগৌরাঙ্গ দেবের আবির্ভাব কালে দেহ সম্বন্ধ দৃষ্ট হয় কিন্তু অপ্রকট কালে সম্পূর্ণ অলৌকিক ব্যাপার। তাঁহারা স্বেচ্ছাময়, স্বতন্ত্র ও সম্পূর্ণ স্বাধীন। অতএব তাঁহাদের নরসদৃশ অবয়ব হইলেও যেন আমরা কখনও তাঁহাদের ভগবত্তা বিস্মৃত হইয়া ভ্রমে পতিত না হই।

উপাসনা-তত্ত্ব।—এখন অনেকে বলেন যে, ভগবান যদি এত বড়, ভগবানের যদি সমান কেহই নাই, তবে আর তাহার উপাসনা বা মনস্তুষ্টির চেষ্টা কেন? তোষামোদে কি তাঁহাকে ভুলান যায়? উপাসনা করিয়া কাজ হাসিল করা কি তাঁহার নিকট আশা করা যায়? তাঁর কি কোন অভাব নাই যে, তিনি দু'টো মিষ্টি কথা বা দু'টাকার মিষ্টান্ন লইয়া বর দিবেন?

কথাটা ফেলিবার কথা নয়। উহার মধ্যে অনেকটা সত্য আছে। কিন্তু উপাসনা মানে কি, তাহা না বুঝার দরুণেই ঐরূপ আপত্তি উপস্থিত হইয়াছে।

উপাসনার অর্থ ভগবানের সমীপবর্ত্তী হওয়া বা তাঁহাকে দেখা বা স্মরণ করা।

বাস্তবিক দেখুন, তাঁহাকে ভুলে বলেই জীব অহংভাবে পতিত হয়, এবং এই অহংভাব হইতেই মমতা, ভয়তা ও পরতা, —সেই জীব বিষয় ভ্রমে পড়িয়া নানা দুঃখ পায়। আপন পর ঘুচাইতে হইলে, সবাইকে সমান দেখিতে হইলে, আমিত্বকে বিশ্বে ডুবাইতে হইলে বিশ্বনাথের কথা স্মৃতিতে জাগরূক রাখা আবশ্যক। আর তিনি আনন্দময়, তাঁর কথা মনে থাকিলে নিরানন্দ কি আর থাকিতে পারে? তিনি মঙ্গলময়, তাঁর কথা মনে থাকিলে, আর কি অমঙ্গল আশঙ্কা হইতে পারে? প্রতীয়মান দুঃখেও ভাবী মঙ্গলের আশা জন্মে। জীব যেন অটল অচলের ন্যায় দৃঢ় বিশ্বাস বলে বলীয়ান হইয়া হাস্য মুখে সংসারে বর্ত্তমান থাকে, পতিত দুঃখী-দরিদ্রের ভরসা স্থল হইয়া উঠে। কেবল যে নিজেই আনন্দ পায় তাহা নয়, তাহার নিকটবর্ত্তী যাহারা সেও আনন্দময় হইয়া যায়।

যে নিরন্তর মনে মনে সেই মঙ্গলময়কে স্মরণ করে, তা'র মুখে কি কাহারও প্রতি কটু কথা বাহির হয়? সে কি কখনও কাহাকে উদ্বেজিত করিতে পারে? সে যে সর্ব্বত্রই সেই তাঁহাকে দেখিতে পায়। সে আনন্দময় হইয়া যায়। মৃত্যু? মৃত্যু কি? সে যে তাঁর সেই আনন্দময়ের সাদর আহ্বান! দেহরূপ শৃঙ্খলে আবদ্ধ হওয়ায় যে সঙ্গলাভে তার পদেপদে বাধাবিঘ্ন অন্তরায় উপস্থিত হইত, দেহচ্যুত হইলে সেই সঙ্গ তাহার সুলভ হইবে! সে সুখে তাহাকে আলিঙ্গন করে।

তাই উপাসনা, তাই অর্চ্চনা। কোন কিছুর প্রার্থনা নয়, কিছু যাচ্ঞা নয়, কেবল স্মরণ। প্রার্থনা করিলেই আত্মোপাসনা বা স্বার্থ সন্ধান করা হয়। আমিত্বের প্রতিষ্ঠা হয়। তাই কেবল স্মরণ। বিস্মৃতি পরমং দুঃখং।

কেবল জপ, নিরন্তর যোগ, অনুক্ষণ ধ্যান; প্রত্যহ অভ্যাস করিতে হয়, অভ্যাস ক্রমশঃ বাড়াইতে হয়। পরিশেষে আপনা আপনিই সতত মনে আসে। এরই নাম উপাসনা।

তাই শ্রীমন্মহাপ্রভু সংখ্যা পূর্ব্বক নাম জপের ব্যবস্থা করিয়াছেন। কি করুণা! কি দূরদৃষ্টি! বিস্মৃত জীবকে স্মরণ করাইবার কি সুন্দর ও অব্যর্থ ব্যবস্থা, সুষুপ্তকে চেতন করিবার কি অমোঘ সুকৌশল। হায়! আমরা এমন মিত্রকেও উপেক্ষা করিতেছি!

মিষ্ট স্তব-স্তুতি বা মিষ্টান্নাদি ভক্ত দেন আপন ভাবে। ভগবান সেই ভাবেরই বশ। সেই ভাব, সেই সম্বন্ধ অধিকার করিতে হইলে প্রত্যহ স্তব করিতে হয়, প্রত্যহ মিষ্টান্নাদি উপহার দিয়া অর্চ্চনা করিতে হয়, প্রত্যহ প্রণাম করিতে হয়। ইহাই সাধনা বা উপাসনা। শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, চরণসেবন, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্ম নিবেদন সাধনা এই নববিধ। ইহার মধ্যে—

"এক অঙ্গ সাধে কেহ সাধে বহু অঙ্গ।
নিষ্ঠা হৈতে উপজয়ে প্রেমের তরঙ্গ॥

———(০)———

শ্রীশ্রীনরহরি সরকার ঠাকুর।*

গৌরাঙ্গ রঙ্গিণী ভেল দাস নরহরি।
চৈতন্যের হাটে ফিরে লইয়া গাগরী॥ (নরোত্তম দাসের হাটপত্তন)
প্রেমের আলয় বন্দ নরহরি দাস।
নিরন্তর চিত্তে যার গৌরাঙ্গ বিলাস॥ (বৈষ্ণব বন্দনা)

আমরা আজ যে পুণ্যশ্লোক-চরিত মহাত্মার বিষয় আলোচনা করিয়া ধন্য হইব মনে করিতেছি, প্রাচীন গ্রন্থ সমূহে তাঁহার সম্বন্ধে বিস্তারিত ভাবে কিছুই লিপিবদ্ধ হয় নাই। শ্রীগৌরাঙ্গের সেই অন্তরঙ্গ ভক্ত সম্বন্ধে তেমন বিশেষ স্থানীয় প্রবাদেরও অসদ্ভাব রহিয়াছে। তদানীন্তন কালীন এই সমস্ত মহাত্মা যশোলাভ করাকে অতীব ঘৃণার বিষয় বলিয়াই মনে করিতেন তজ্জন্যই কি ভক্তি-সাহিত্যে এইরূপ নীরবতার দৃশ্য দেখিতেছি? যাহা হউক এস্থলে আমরা আমাদের জ্ঞান-মত তাঁহার সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব।

* ১৩২৬ সালে 'শ্রীল শিশিরকুমার ঘোষ' পুরস্কার প্রাপ্ত এবং গত ২৫শে শ্রাবণ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের অধিবেশনে লেখক কর্তৃক পঠিত।

বঙ্গের অমর কবি ও ভক্ত নরহরির মধুর-স্মৃতি গৌর-ভক্তগণের বড়ই আদরের জিনিস। সেই জাহ্নবী-তীরবর্ত্তী কাবাকুঞ্জবন একদিন যে দেবরূপী মনুষ্যের মধু-কণ্ঠগানে ঝঙ্কৃত হইয়াছিল, আজিও তাহার মোহন মূর্চ্ছনায় গৌর-ভক্তমণ্ডলীর তৃষিত চিত্ত পরিতৃপ্ত হইতেছে।*

শ্রীনরহরি সরকার বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত শ্রীখণ্ড গ্রামে বৈদ্যবংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতা শ্রীনারায়ণ দেব সরকার একজন ধার্ম্মিক ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার দুই পুত্র, জ্যেষ্ঠ মুকুন্দ ও কনিষ্ঠ নরহরি।

নদীয়ার মাধবমিশ্রের তনয় গদাধরের ন্যায় আমাদের নরহরিও আকুমার বৈরাগ্যাবলম্বন করিয়াছিলেন। বৃন্দাবনলীলায় যিনি শ্রীমতী রাধারাণীর প্রাণ-সখী মধুমতী ছিলেন, শ্রীগৌরাঙ্গের বিলাস-বাসনা পূর্ণ করিতে তিনিই পুরুষদেহ ধারণ করিয়া শ্রীনরহরি রূপে প্রকাশ হন। যখন শ্রীভগবানের আমাদের মধ্যে আগমন করিবার আবশ্যক হয়, তখন তাঁহার ভক্তগণ তাঁহার কার্য্যের সুবিধার জন্য বা লীলার পরিপুষ্টির নিমিত্ত অনেক সময় তাঁহার পূর্ব্বেই পৃথিবীতে আগমন করিয়া থাকেন। এই জন্যই শ্রীগৌরাঙ্গের জন্মের প্রায় সাত বৎসর পূর্ব্বে ব্রজের মধুমতী নবীনালীলায় নরহরি রূপে জন্মগ্রহণ করিলেন।

শ্রী সরকার ঠাকুরের অদ্ভুত মহিমা।
ব্রজের মধুমতী যে গুণের নাই সীমা॥ (ভক্তি-রত্নাকর)

যথা—শ্রীগৌর-গণোদ্দেশে—

পুরা মধুমতী প্রাণসখী বৃন্দাবনে স্থিতা।
অধুনা নরহর্য্যাখ্যঃ সরকারঃ প্রভোঃ প্রিয়ঃ॥

---

* শ্রীনরোত্তম দাস ঠাকুর মহাশয়ের গুরুদেব শ্রীশ্রীলোকনাথ গোস্বামী শ্রীকবিরাজ গোস্বামীকে তাঁহার অমর গ্রন্থ শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে স্বীয় নাম পর্য্যন্ত উল্লেখ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত শিশির বাবু তাঁহার শ্রীনরোত্তম চরিত গ্রন্থের প্রথমেই এ সম্বন্ধে এইরূপ বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন,—"শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ তখন শ্রীবৃন্দাবনে বাস করেন, তিনি শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থ লিখিবেন সঙ্কল্প করিয়া, শ্রীলোকনাথ গোস্বামীর নিকট অনুমতি লইতে গমন করিলেন। শ্রীলোকনাথের ভজনেই দিবানিশি যাইত, কাহারও সহিত বাক্যালাপের সম্বন্ধ ছিল না। শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রার্থনা জানাইলে তিনি সুখে অনুমতি দিলেন, কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে একটি নিষ্ঠুর আজ্ঞা করিলেন যে, ঐ চরিতামৃত গ্রন্থে তাঁহার নাম পর্য্যন্ত উল্লেখ করিতে পারিবেন না।" পাছে তাঁহার কোনরূপ প্রতিষ্ঠা হয় বলিয়া শ্রীলোকনাথ গোস্বামী এরূপ আজ্ঞা করিলেন, আর আমরা হতভাগ্য জীবগণ, সেই নিমিত্ত তাঁহার নিগূঢ় জীবনের ঘটনাগুলিও জানিতে পারিতেছি না।

যথা—শ্রীযদুরূপ কৃত পদ্যং—

শ্রীবৃন্দাবন বাসিনো রসবতী রাধা ঘনশ্যাময়ো—
রাসোল্লাস রসাত্মিকা মধুমতী সিদ্ধানুগা যাপুরা।
সেয়ং শ্রী সরকার ঠক্কুর ইহ প্রেমার্থিতঃ প্রেমদঃ
প্রেমানন্দ মহোদধির্বিজয়তে শ্রীখণ্ড ভূখণ্ডকে॥

যথা—শ্রীকর্ণপুর কৃত পদ্যং—

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভোরতি রূপা মাধ্বীক সম্ভাজনং
সান্দ্র প্রেম পরম্পরা কবলিতং বাচঃ প্রফুল্লং মুদা।
শ্রীখণ্ডে রচিত স্থিতিং নিরবধি শ্রীখণ্ড চর্চ্চার্চ্চিতং
বন্দে শ্রীমধুমত্যুপাধিবলিতং কঞ্চিন্মহা প্রেমদং॥

শ্রীগৌরাঙ্গ যখন গয়াধাম হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া সুবিমল ভক্তিভরে ডগমগ হইয়াছিলেন, তখন একে একে ভক্তগণ চারিদিক হইতে আসিয়া মধুলুব্ধ ভ্রমরের ন্যায় তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া অবস্থান করিতেছিলেন। আমাদের প্রিয় নরহরিও এই সময়ে আসিয়া তাঁহার প্রাণগৌরের সহিত মিলিত হইলেন।

শ্রীনরহরির গৌরাঙ্গপ্রীতি বর্ণনা করিবার ভাষা বোধ হয় জগতে সৃষ্টি হয় নাই। যিনি গৌরচরিত চিন্তা করিতে করিতে সর্ব্বদা বলিতেন,—"গৌর বলিতে জনম যাউক, কিছু না চাহিয়ে আর।" যাঁহার নয়ন শ্রীগৌরাঙ্গের রূপ-মাধুর্য্য ব্যতীত অন্য সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইত না এবং নিরবধি সেই অনন্ত প্রেমামৃত সমুদ্র সন্দর্শন করিয়াও যিনি বলিতেন,—"এ দু'টী নয়নে না ভরে হে'লব লাখ আঁখি যদি হয়।" যিনি শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেমরসে আত্মহারা হইয়া সদা ডগমগ থাকিতেন, সেই ঠাকুর নরহরির গুণের কথা আমরা কি বলিয়া বর্ণনা করিব তাহা জানিনা।

নরহরি নদীয়া অবতারের কথা শুনিয়া দেখিতে আসিয়াছিলেন, আসিয়া দেখিলেন, প্রকৃতই সেই তাহাদের তিনি আসিয়াছেন। নিজজনকে দেখিয়া কে কবে ছাড়িয়া যায়? যাঁহার লাগিয়া মদনদহনে দহিতেছিলেন, সেই পরাণনাথকে যখন পাইলেন, তখন আর তাঁহাকে ছাড়িয়া দিবেন কেন? শ্রীগদাধরের ন্যায় সর্ব্বদা তিনি প্রিয়তমের সঙ্গে সঙ্গে থাকিতেন। স্বহস্তে শ্রীঅঙ্গের বেশবিন্যাস করিয়া দিতেন। সুন্দর মালতী ফুলের মালা গাঁথিয়া, প্রভুর গলায় পরাইয়া, প্রভুকে নব-নটবর বেশে সাজাইতেন, আর সেই অনুপম, অপার্থিব রূপমাধুরী নয়ন ভরিয়া দেখিয়া দুর্নিবার পিপাসা তৃপ্ত করিতে চেষ্টা করিতেন। নয়নের

অঞ্জনের ন্যায় শ্রীগৌরাঙ্গের রূপের জ্যোতিকে তিনি যে কখনও নয়নছাড়া করিতে পারিতেন না তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

শ্রীগদাধরে শ্রীমতী রাধারাণীর প্রকাশ। শ্রীগৌর ভুবনমোহন বেশে সজ্জিত হইলে ভক্তগণ শ্রীগদাধরকে তাঁহার বামে ও নরহরিকে দক্ষিণে দিয়া শোভা দেখিতেন। গদাধরকে যেমনই আমরা প্রভুর বামে দেখি, নরহরিকেও তেমনি দক্ষিণে দেখিয়া মোহিত হই। নরহরির কাজ ছিল—প্রভুর অঙ্গে চামর ব্যজন করা। এই কার্য্যে আর কাহারও অধিকার ছিল না। ভুবনমোহন বেশে প্রভু, চারিদিকে নানাভাবে সেবা-নিরত ভক্তগণ, আর তাঁহার প্রিয়তমের পার্শ্বে প্রিয় নরহরি চারু চামর হস্তে লইয়া ধীরে ধীরে ব্যজন করিতেছেন। শ্রীগৌর যখনই নৃত্য করিতে উঠিতেন, শ্রীগদাধরের হস্তধারণ করিয়া উঠিতেন, আর নৃত্যকালে শ্রীনরহরি মহাপ্রভুর দক্ষিণে থাকিয়া নৃত্য করিতেন। এই মনোহর নৃত্য দর্শনে ত্রিভুবন সুশীতল হইয়া যাইত। মহাজনগণ এ সম্বন্ধে শত শত পদ রচনা করিয়া গিয়াছেন। আমরা এখানে তাহার একটি মাত্র উদ্ধৃত করিলাম—

দেখ দেখ গোরাচাঁদ নদীয়া নগরে। গদাধর-সঙ্গে রঙ্গে সদাই বিহরে॥
বামে গদাধর দক্ষিণে নরহরি। সুরধুনী তীরে দুঁহু নাচে ফিরি ফিরি॥
কিবা সে বিনোদবেশ বিনোদ চাতুরী। বিনোদ রূপের ছটা বিনোদ মাধুরী॥
দেখিতে ২ হিয়ায় সাধ লাগে হেন। নয়নে অঞ্জন করি সদা রাখি যেন॥
কহয়ে জগদানন্দ গোরা প্রেম কথা। সোঙরিতে হৃদয় উথলি যায় তথা॥

একদিন এইরূপে নৃত্য করিতে করিতে মহাপ্রভু পূর্ব্ব লীলা স্মরণ করিয়া, বিরহবিহ্বল-চিত্তে ধূলায় গড়াগড়ি দিতেছেন, আর প্রিয় নরহরির মুখপানে চাহিয়া প্রাণ উঘারিয়া প্রাণের বেদনা প্রকাশ করিতেছেন,—

নাচে শচীনন্দন, ভকত জীবন ধন, সঙ্গে সঙ্গে প্রিয় নিত্যানন্দ।
অদ্বৈত শ্রীনিবাস, আর নাচে হরিদাস, বাসুঘোষ রায় রামানন্দ॥
নিত্যানন্দ মুখ হেরি, বোলে পহু হরি হরি, প্রেমায় ধরণী গড়ি যায়।
প্রিয় গদাধর আসি, প্রভুর বামপাশে বসি, ঘন নরহরি মুখ চায়॥
প্রভু নাহি মেলে আঁখি, কহে মোর কাঁহা সখী, কাঁহা পাব রাই দরশন।
কহ কহ নরহরি, আর সম্বরিতে নারি, ইহা বলি ভেল অচেতন॥
এখনি আছিনু সেথা, কে মোরে আনিল এথা, রসে রসে নিকুঞ্জভবনে।
গেল সুখ সম্পদ, এবে ভেল বিপদ, বিষাদয়ে এ লোচন দাস॥

আপনারা জানেন, জগতে একমাত্র পুরুষ সেই কানাইয়ালাল। আর জগদ্বাসী তাঁহাকে সখী (গোপী) ভাবে ভজনা করিয়া কৃতার্থ হয়। পরম সুন্দর গৌর অবতারেও তদ্রূপ, একমাত্র পুরুষ সেই রসিকশেখর শ্রীগৌরাঙ্গ, আর নদীয়াবাসী আপনাদিগকে নবীনানাগরী এবং তাঁহাকে নবীন নাগর ভাবে ভজনা করিয়া ধন্য হইয়াছেন। সেই ব্রজভাবে মাতোয়ারা, মধুর রসের রসিক ভক্তগণ, তাহাদের রসিকশেখরকে আর অন্য কি ভাবে দেখিবেন?

এই মধুর নাগরী-ভাবের উপাসনা প্রণালী আমাদের শ্রীনরহরির দ্বারাই প্রচারিত হয়। তিনি নিজেকে সখী বলিয়াই মনে করিতেন এবং অনেক সময় তদনুরূপ বেশ ধারণ করিয়াও অবস্থান করিতেন। তখন তাহার অবস্থা কিরূপ হইয়াছিল তাহা তাঁহার স্বরচিত পদে শ্রবণ করুন।

মরম কহিব সজনি কায়, মরম কহিব কায়।
উঠিতে বসিতে দিক নিরখিতে, হেরি এ গৌরাঙ্গ রায়॥ ধ্রু॥
হৃদি সরোবরে গৌরাঙ্গ পশিল সকলি গৌরাঙ্গময়।
এ দু'টি নয়ানে কত বা হেরিব, লাখ আঁখি যদি হয়॥
জাগিতে গৌরাঙ্গ ঘুমাতে গৌরাঙ্গ, সদাই গৌরাঙ্গ দেখি।
ভোজনে গৌরাঙ্গ গমনে গৌরাঙ্গ, কি হৈল আমার সখী॥
গগনে চাহিতে সেখানে গৌরাঙ্গ, হেরি এ নয়নে সদা।
নরহরি কহে গৌরাঙ্গ চরণ, হিয়ায় রহল বাঁধা॥

২

শয়নে গৌর, স্বপনে গৌর, গৌর নয়ন তারা।
জীবনে গৌর, মরণে গৌর, গৌর গলার হারা॥
হিয়ার মাঝারে গৌরাঙ্গ রাখিয়া, বিরলে বসিয়া রব।
মনের সাধেতে সে রূপ চাঁদেরে, নয়নে নয়নে থোব॥

সইলো কহনা গৌর কথা।

গোরার যে নাম, অমিয়ার ধাম, পীরিতি মূরতি দাতা॥ ধ্রু॥
গৌর শবদ, গৌর সম্পদ, সদা যার হিয়ায় জাগে।
কহে নরহরি, তাহার চরণে সতত শরণ মাগে॥

বাসুঘোষ প্রভৃতি ভক্তগণ কর্ত্তৃক এই সর্ব্বোত্তম নাগরী ভাবের ভজন-প্রথা অনুসৃত হইয়া সাধারণ্যে প্রচারিত হয়; এবং স্বরূপ দামোদর, অদ্বৈত ও নিত্যানন্দ প্রভু কর্ত্তৃক ইহা বিশিষ্টরূপে অনুমোদিত হয়। আর এই জন্যই গৌর-গদাধর

গৌর-নরহরি, গৌর-নিত্যানন্দ, গৌর-লক্ষ্মী-বিষ্ণুপ্রিয়া ভজন এতাবত কাল চলিয়া আসিতেছে।

শ্রীগৌরাঙ্গ নবীন নাগর না হইলে ভক্তগণ তাঁহার পার্শ্বে লক্ষ্মীপ্রিয়া ও বিষ্ণুপ্রিয়াকে স্থাপন করিয়া আনন্দ পান কেন? আর গদাধর ও নরহরি যখন বামে ও দক্ষিণে শ্রীগৌর অঙ্গে হেলান দিয়া থাকিতেন, তখন তিনি কিসের জন্যইবা অত আনন্দিত হইতেন। তিনি কি কেবলমাত্র ভুবনমঙ্গল হরিনাম প্রচার করিতেই আসিয়াছিলেন—না, শুধু তাহা নহে। তিনি আরও দেখাইতে আসিয়াছিলেন যে, তিনি জীবের একমাত্র নিজজন—প্রাণের প্রাণ ভগবান। তাঁহাকে পাইতে হইলে মধুর ভাবের যে উপাসনা প্রণালী, তাহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। সেই পরম পুরুষ যখনই ধরায় অবতীর্ণ হন, প্রকৃতিগণও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে আগমন করেন। তাঁহারাই যে তাঁহার শক্তি—প্রকৃতিগণ পুরুষ ছাড়া কিরূপে থাকিবেন? তাই গৌরলীলায় নিতাই আছেন, নরহরি আছেন, গদাধর আছেন, লক্ষ্মী-বিষ্ণুপ্রিয়া আছেন। তাই নাগরীগণ তাঁহার আনন্দদায়ক।

ঠাকুর লোচনদাস এই লীলা সুন্দররূপে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণ এজন্য চিরদিন তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ থাকিবেন। ইহা শ্রীবৃন্দাবন দাসের চৈতন্য-ভাগবত গ্রন্থে বর্ণিত না হওয়ায় ঠাকুর নরহরি তাঁহার প্রিয়শিষ্য লোচনকে লিপিবদ্ধ করিতে অনুমতি দেন। কথিত আছে—লোচনদাস তাঁহার গুরুর আদেশে মাত্র ১৪ বৎসর বয়সে ১৪৫৯ শকে) এই সুললিত সঙ্গীতময় অপূর্ব্ব গ্রন্থ রচনা করেন। বলা বাহুল্য, শ্রীচৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থ পাঠ করিয়া সরকার ঠাকুরের বহুদিনের আকাঙ্ক্ষা তৃপ্ত হইয়াছিল। লোচন তাঁহার মন্ত্রশিষ্য ছিলেন।* তিনি চৈতন্যমঙ্গলে স্বীয় গুরুদেব সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—"প্রাণের ঠাকুর মোর নরহরি দাস। তাঁর পদ প্রসাদে এ পথের প্রতি আশ॥"

আমাদের মনে হয়, শ্রীল লোচনদাস গুরুর আদেশে, যদ্যপি তাঁহার নিপুণ হস্তে লেখনী ধারণ না করিতেন, তাহা হইলে আমাদের প্রিয়তম শ্রীগৌরাঙ্গ

* শ্রীসরকার ঠাকুরের অন্যতম শিষ্য—চিরঞ্জীব সেন সম্বন্ধে "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" গ্রন্থের ৩০০ পৃষ্ঠায় এইরূপ লিখিত আছে,—"এই যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পদকর্ত্তা গোবিন্দ কবিরাজ চৈতন্য-সহচর পরম ভাগবত চিরঞ্জীব সেনের পুত্র ও শ্রীখণ্ডের প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক এবং কবি দামোদরের দৌহিত্র। চিরঞ্জীব সেন শ্রীখণ্ডের নরহরি সরকারের শিষ্য; তাঁহার বাড়ী কুমারনগর ছিল, কিন্তু তিনি দামোদরের কন্যা সুনন্দাকে বিবাহ করিয়া শ্রীখণ্ডে আসিয়া বাস করেন। উত্তরকালে তাঁহার পুত্রদ্বয় পুনরায় কুমারনগরে পৈত্রিক বাসস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন, কিন্তু উক্ত স্থানের বৈষ্ণবদ্বেষী শাক্তগণ দ্বারা উৎপীড়িত হওয়াতে পদ্মাপারস্থিত তেলিয়াবুধরী গ্রামে বাড়ী করেন।"

সুন্দর, নাগর বলিয়াই আখ্যাত হইতে পারিতেন না। তাঁহার নিপুণ রচনা রস-ভঙ্গিমা দ্বারা কেমন সুন্দর ও সরলভাবে, একাধারে নদীয়া ও ব্রজের মধুর লীলা, ভক্তগণকে আস্বাদন করাইয়াছেন দেখুন। যথা—চৈতন্যমঙ্গল, মধ্যখণ্ডে—

ক্ষণে গৌরলীলা গদাধর করি সঙ্গে।
ক্ষণে শ্যামলীলা রাধা রাস রস রঙ্গে॥
চমৎকার লীলা দেখি সব ভক্তগণ।
হরি হরি জয় জয় বোলে ঘনে ঘন॥

*　*　*　*

গদাধর-প্রভু—সুগন্ধি চন্দন অঙ্গে করিল লেপন।
দিব্য মাল্য গলে দিয়া করয়ে স্তবন॥
এই মত প্রতিদিন করে পরিচর্য্যা।
শয়ন মন্দিরে করে শয়নের শয্যা॥
চরণ নিকটে নিতি করয়ে শয়ন।
নিরন্তর শ্রদ্ধা ভক্তি-পর তার মন॥
প্রভুর সম্মুখে কহে অমৃত বচন।
শুনি বিশ্বম্ভর প্রভু আনন্দিত মন॥
তাহার অমৃত বাণী সিঞ্চিল অন্তর।
নাচিবারে যায় প্রভু ধরি তার কর॥
নরহরি ভুজে আর ভুজ আরোপিয়া।
শ্রীবাসের ঘরে নাচে রাস বিনোদিয়া॥
গৌর দেহে শ্যাম তনু দেখে ভক্তগণ।
গদাধর রাধা রূপ হইল তখন॥
মধুমতি নরহরি হৈলা সেই কালে।
দেখিয়া বৈষ্ণব সব হরি হরি বোলে॥

*　*　*　*

শ্রীনিবাস ভুজে এক ভুজ আরোপিয়া।
গদাধর করে ধরি বাম কর দিয়া॥
নরহরি অঙ্গে প্রভু শ্রীঅঙ্গ হেলিয়া।
শ্রীরঘুনন্দন মুখ কান্দয়ে হেরিয়া॥
শ্রীরাম পণ্ডিত অঙ্গে দিয়া পদাম্বুজ।
ক্রীড়া করে মহাপ্রভু আচার্য্য সম্মুখ॥
যেন রাস-মহোৎসবে বেড়ি গোপীগণ।
কীর্ত্তনের মাঝে এই মত সুশোভন॥

এই মতে কতক্ষণে নৃত্য অবসানে।
হরষিত অদ্বৈত আচার্য্য সীতা সনে॥
* * * *
অতি অপরূপ এই নদীয়া বিহার।
একত্রে সভার কথা কহিব তাহার॥
নরহরি গদাধর বৈসে দুই পাশে।
শ্রীরঘুনন্দন পদ নিকটে বিলাসে॥
অদ্বৈত আচার্য্য আর নিত্যানন্দ রায়।
আপনে ঠাকুর নিজ গুণ গাথা গায়॥

এই মধুর লীলা আস্বাদন করিয়া যখন শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু, শ্রীঅদ্বৈত প্রভু, শ্রীসীতাদেবী, এমন কি শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া পর্য্যন্ত ভাবে বিভোর হইতেন, তখন গৌড়ীয় ভক্তগণ যে চিরতরে এই অপূর্ব্ব অমৃতাধার হইতে সুধা আহরণ করিবেন তাহাতে আর সন্দেহ কি?

অধুনা লুপ্ত স্বরূপগোস্বামীর কড়চা হইতে ভক্তিরত্নাকরে উদ্ধৃত একটী শ্লোক এই স্থানে লিপিবদ্ধ করিতেছি,—

অবনি সুরবর শ্রী পণ্ডিতাখ্যো যতীন্দ্রঃ
স খলু ভবতি রাধা শ্রীল গৌরাবতারে।
নরহরি সরকার স্বাপি দামোদরস্থ
প্রভু নিজদয়িতানাং তচ্চ সারং মতং মে॥

প্রভুর অতীব মর্ম্মী-ভক্ত স্বরূপদামোদরের প্রাণের কথা ইহাতে কেমন সুন্দর ভাবে উদ্ঘাটিত হইয়াছে। আমরা অতীব আহ্লাদের সহিত সুবিখ্যাত ভক্ত রামচন্দ্র কবিরাজ মহাশয়ের একটী বন্দনা পদ এ স্থলে উদ্ধৃত করিলাম।

বন্দ নরহরি মতি, মধুমতী যার খ্যাতি, প্রাণসখী ব্রজেতে প্রধান।
শ্রীরাধিকার প্রাণসখী, একতনু ভিন্ন দেখি, রাগ মার্গ বিবিধ বিধান॥
এবে কৃষ্ণ দণ্ডধারী, প্রাণসখী নরহরি, শ্রীরাধিকা গদাধর পহুঁ।
নবীন কিশোর রূপ, তাহে প্রেম অপরূপ, চাঁদ মুখে হাসি লহু লহু॥
* * * * *
হেন সে প্রেমরসে, জগত করিল বসে, দীনহীনে প্রদান করিয়া।
মধুর রস করি আশ, নিত্য প্রেম-বিলাস, নরহরি অনুগা হইয়া॥
কহেন গৌরাঙ্গ রায়, মধুমতী প্রেমময়, প্রধান করিয়া তারে লিখি।
গদাধর মোর শক্তি, নরহরি হৃদি স্থিতি, প্রেমময় তনু তার সখি॥

শ্রীসরকার ঠাকুরকে রামচন্দ্র দাস * দর্শন করেন নাই। এজন্য তিনি একটী পদে স্বীয় মনোদুঃখ বর্ণনা করিয়াছেন,—

হাহা মোর কি ছার অদৃষ্ট।

যবে গৌর প্রকটিল, আমার জনম নৈল, তেই মুঞি অধম পাপিষ্ঠ॥ধ্রু॥

না হেরিনু গৌরচন্দ্র, না হেরিনু নিত্যানন্দ, না হেরিনু অদ্বৈত গোসাঞী।

ঠাকুর শ্রীসরকার, না হেরিনু পদ তার, না হেরিনু শ্রীবাস গদাই॥

মহাপ্রভু শ্রীধাম নবদ্বীপ লীলার ন্যায় শ্রীধাম নীলাচল লীলাতেও যে গদাধর, নরহরি প্রভৃতির সহিত বিলাস-সুখে মগ্ন থাকিতেন, তাহা আমরা গোবিন্দদাসের করচা হইতে জানিতে পারি।

মুকুন্দ মুরারি গুপ্ত আর গদাধর।
নরহরি বিদ্যানিধি শেখর শ্রীধর॥
অন্তরঙ্গ ভক্ত আরও দুই চারি জন।
যাহাদের সঙ্গে হয় গোপনে ভজন॥

এই নরহরি-তত্ত্ব এতই গুহ্য যে, আমার ন্যায় অতি সামান্য ব্যক্তির তাহা বুঝিবার ক্ষমতা থাকা অসম্ভব। ইঁহারা নিত্যসিদ্ধ ও মুক্তপুরুষ ছিলেন। সাধন ব্যতীত সেই সাধনের ধনকে আয়ত্ত করা কিছুতেই সম্ভবপর নহে। গৌরভক্তগণ আশীর্বাদ করুন, যেন আমরা শ্রীনরহরির কৃপালাভ করিবার শক্তি সঞ্চয় করিতে পারি। যেহেতু তাঁহার কৃপা ব্যতীত তাঁহার আরাধ্য দেবতার কৃপালাভ কি প্রকারে হইতে পারে?

ভাবনিধি শ্রীগৌরাঙ্গ, কখন বা শ্রীকৃষ্ণ বিরহে, আবার কখনও বা শ্রীরাধার বিরহে ব্যাকুল হইয়া ক্রন্দন করিতেন; আবার মিলনে আনন্দ প্রকাশ করিতেন। তখন তাহার রাত্র-দিন জ্ঞান থাকিত না। বিরলে অবস্থান করিতে ভাল বাসিতেন; এবং দুই চারিটি মর্ম্মী ভক্ত ব্যতীত কেহই নিকটে থাকিতে পাইত না। শ্রীনরহরি অবশ্য নিকটেই থাকিতেন; শ্রীগৌরাঙ্গের ব্যাকুল হৃদয় কি ভাবে বিভাবিত হইত, তাহা তিনি তাহার মুখের পানে চাহিয়া বুঝিতে চেষ্টা করিতেন।

ক্রমশঃ

শ্রীভোলানাথ ঘোষ বর্ম্মা।

* ইনি বংশীবদন ঠাকুরের পৌত্র।

গান। (১)

হরে কৃষ্ণ হরে, রাম রাম হরে, জপরে রসনা জপ অবিরাম।
নাম-মধুরে, রসনা রসরে, পূর্ণানন্দঘন পাবি দরশন ॥
হরে কৃষ্ণ রাম নামের মহিমা,
কেবর্ণিবে নামের নাহিরে তুলনা,
নামের তুলনা জগতে মেলেনা,
(নামে) প্রেমানন্দ ধামে হবেরে বিশ্রাম ॥
কলি-কবলিত জীব-উদ্ধারিতে,
সৎচিদানন্দ মূরতি দেখাতে,
জীবের হৃদয়ে স্বরূপ জাগাতে,
(শুধু) মহামন্ত্র এই হরেকৃষ্ণ নাম ॥
(হরে) কৃষ্ণনামের মালা কণ্ঠে ধর যদি,
ত্রিতাপজ্বালা যাবে জুড়াইবে হৃদি,
প্রেম-পাথারে ডুবেরবে নিরবধি,
(ভব) মহাদাবাগ্নি হবেরে নির্ব্বাণ ॥
(এই) নামের মহিমা করিতে প্রচার,
প্রেমময়ীর ভাব করিঅঙ্গীকার,
শ্যামাঙ্গ ঢাকিয়ে হেমাঙ্গে রাধার,
(উদয়) নদীয়া নগরে গৌর গুণধাম ॥

শ্রীশ্রীঈশ্বর-তত্ত্ব।

সেবা-তত্ত্ব—"প্রীণিতে প্রীণিতং জগৎ।"

এইরূপে ক্রমশঃ যিনি ভগবানের ভক্ত হইয়া দাঁড়ান, তিনি জগৎকে ভালবাসেন। তিনি জানেন জগৎ আর কিছুইনয়, তাঁর সেই প্রিয়তমই—

একাংশে "জগদ্রূপে পরিণত" হইয়াছেন। সুতরাং কাহাকে তিনি অনাদর করিবেন? তাঁর উপেক্ষার স্থান নাই। তাঁর প্রিয়তম যে বিশ্বরূপ, তাঁর ঔদাস্যের অবসর নাই। জগতের যাবতীয় কার্য্যই যে তাঁর প্রিয়তমের কার্য্য। জগতের সেবা করিলেই, তাঁর সেই প্রিয়তমেরই সেবা হইবে। "পর উপকার যেই সেই হরিসেবা।" (ভক্তমাল)। অথবা তাঁর প্রিয়তমের সেবা হইলেই জগৎ তুষ্ট, "প্রীণিতে প্রীণিতং জগৎ।" বাস্তবিকও হয় তাই। আপনি ভগবানের সেবা মহোৎসব করিয়া দেখুন, কেবল আপনি ও শ্রীবিগ্রহ এই দুই লইয়া হয়, কি সর্ব্ববর্ণ আহ্বান করিতে হয়? দেখিলেই বুঝিবেন তিনি ছাড়া জগৎ নন, জগৎ ছাড়া জগন্নাথ নন। কৃষ্ণ-প্রেমিকই বিশ্বপ্রেমিক। কৃষ্ণ-সেবকই বিশ্বসেবক আবার ভক্ত বিশ্ব-সেবকই কৃষ্ণ-সেবক, ভক্ত বিশ্ব-প্রেমিকই কৃষ্ণ-প্রেমিক।

পক্ষান্তরে, আপনি কৃষ্ণসেবাকরেন, অথচ অনাত্মীয়ে আপনার প্রীতি নাই-আপনার কৃষ্ণপ্রীতি এখনও পূর্ণহয় নাই। আবার আপনি অনাত্মীয়ে প্রীতিবান, কিন্তুমূলতত্ত্বে আস্থাহীন আপনার অনাত্মীয় প্রীতিতে স্বার্থ সিদ্ধির বাসনা লুক্কায়িত আছে। আপনার প্রীতি এখনও পরিপক্ক হয় নাই।

এবম্বিধ সেবা ভক্তগণের আকাঙ্ক্ষার বস্তু। সেবাসুখ ব্যতীত ভক্তগণ অপর কোন সুখই প্রার্থনা করেন না। এই সেবা সর্ব্বেন্দ্রিয়দ্বারা করিতে হয়। "হৃষীকেন হৃষীকেশসেবনং ভক্তিরুত্তমা।

দাস, সখা, পিতামাতা ও কান্তা এই চারিভাবে সেবা সম্পাদিত হয়। কান্তা-ভাবে সেবাকেই মধুরভাবের সেবা বলে; ইহার মধ্যে দাস্য, সখ্য ও বাৎসল্য সকল ভাবই বর্ত্তমান আছে। কান্তাভাবের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শ্রীমতী প্রিয়াজীর সেবা। তাই আমাদের শ্রীমন্‌মহাপ্রভু জীবকে সেই ভাবের সেবার কিঞ্চিৎ অনুভব করাইবার জন্য স্বয়ং কিশোরী ভাবে ভাবিত হইয়া সর্ব্বদা বিরহ বেদনা প্রকাশ করতেন ও 'হা কৃষ্ণ' 'হা প্রাণনাথ' বলিয়া অঝোর নয়নে ঝুরিতেন।

মহাপ্রভু শ্রীমদ্দাস রঘুনাথকে শ্রীশ্রীগোবর্দ্ধন শিলা ও গুঞ্জামালা দিয়া বলিয়া-ছিলেন—যথা শ্রীচরিতামৃতে—

"প্রভু কহে এই শিলা 'কৃষ্ণের' বিগ্রহ।
ইহার সেবা করতুমি করিয়া আগ্রহ॥
এই শিলার কর তুমি সাত্ত্বিক পূজন।
অচিরাতে পাবে তুমি কৃষ্ণপ্রেমধন॥
এক কুঁজা জল, আর তুলসী মঞ্জুরী।

সাত্ত্বিক সেবা এই শুদ্ধভাবে করি ॥
দুইদিগে দুই পত্র, মধ্যে কোমল মঞ্জুরী।
এই মত অষ্টমঞ্জুরী দিবে শ্রদ্ধাকরি ॥
একবিতস্তি দুই বস্ত্র পিড়ি একখানি।
স্বরূপ গোসাঞি দিলেন কুজা আনিবারে পানি ॥
এইমত রঘুনাথ করেন পূজন।
পূজাকালে দেখে শিলায় 'ব্রজেন্দ্রনন্দন' ॥
জল তুলসীর সেবায় তাঁর যত সুখোদয়।
ষোড়শোপচার পূজায় তত সুখনয় ॥
তবে স্বরূপ গোসাঞি তাঁরে কহিল বচন।
অষ্টকৌড়ির খাজা সন্দেশ কর সমর্পণ ॥,,

লীলা-তত্ত্ব—"অনায়াসেন স্বেচ্ছয়া হর্ষেণ যা চেষ্টা সা লীলা।"

সৃজন, পালন ও লয় এই ত্রিবিধ কার্য্যই ভগবানের লীলা—অনেকে জানেন। কাজে কাজেই সৃষ্টির উপযোগী দুষ্টের দমন—শিষ্টের পুরস্কার প্রভৃতি নানাবিধ-কার্য্য এবং লয়ের অনুকূল পীড়া, জরা, দৈবদুর্যোগ প্রভৃতি সমুদায় ব্যাপারকেও ভগবানের কার্য্য বা লীলা বলিতে হয়।

ঐরূপই সাধারণ জনগণের বিশ্বাস। কিন্তু উহা আংশিক দর্শনের পরিচায়ক। সমগ্র ভাবে দর্শন করিতে পারিলে সৃজন, পালন ও লয় দেখা যাইবে না। একঅখণ্ড এক অখণ্ডই আছেন। লয়ে তাঁর হ্রাস করে না, সৃজনে তাঁর বৃদ্ধি হয় না, আর পালনে তাঁর প্রয়োজনই নাই।

প্রথমতঃ আংশিক দর্শনের কথা ধরুন। মনে করুন আপনি একটি বিবাহ বাড়ীতে গিয়াছেন। দেখিলেন কেহ বাজনা বাজাইতেছে, কেহ বাজার করিয়া আনিতেছে. কেহ বাটনা বাটিতেছে, কেহ কুটনা কুটিতেছে, কেহ রন্ধন করিতেছে ইত্যাদি। দেখিয়া আপনি বাহিরে আসিলেন। আসিতেই একজন আপনাকে প্রশ্নকরিল আজ অমুকদের বাড়ী কিহে? আপনি বলিলেন ওদের বাড়ী বাজনা বাজিতেছে ইত্যাদি। ইহা আপনার আংশিক দৃষ্টির কথা।

কিন্তু যদি আপনি বলেন ওদের বাড়ী 'বিবাহ' তাহা হইলেই আপনার সমগ্রভাবে দর্শন হয়। অবশ্য বিবাহ বলিলেই তদন্তর্গত বহু বহু ক্ষুদ্র ব্যাপার বুঝাইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু সেগুলি গৌণ। মুখ্য—'বিবাহ'।

তারপর আমরা 'এক একই আছেন' এই কথাটি বুঝিবার চেষ্টা করিব।

মনে করুন আপনি একজন রাজসরকারের কর্ম্মচারী বা গভর্ণমেণ্ট সারভ্যাণ্ট, আপনি এখন যে পদে প্রতিষ্ঠিত পূর্ব্বেও সেই পদ ছিল আবার আপনার পরেও সেই পদ থাকিবে। অর্থাৎ গভর্ণমেণ্ট গভর্ণমেণ্টই ছিলেন, আছেন ও থাকিবেন। তাহার হ্রাস বা বৃদ্ধি নাই—সুতরাং পালনের আবশ্যকতাও নাই। একজন বিচারক অক্ষম হইলেন তাঁহার পদে আর একজন বিচারক হইলেন, সুতরাং গভর্ণমেণ্ট অক্ষুণ্ণ থাকিল। রেল কোম্পানী, ষ্টীমার কোম্পানী প্রভৃতি কোম্পানী সম্বন্ধেও তাই। লোক বদল হয় মাত্র, কিন্তু কোম্পানী ঠিকই থাকে। সেইরূপ এক একই থাকেন জন্ম মৃত্যু বা পালনের দ্বারা তাহার হ্রাস বা পুষ্টি হইতে পারে না। বুদ্‌বুদে কি সমুদ্রের বৃদ্ধি হয়, না বুদ্‌বুদ ধ্বংস হইলে সমুদ্রের ক্ষয় হয়?

তাহা হইলে সমগ্র ভাবে দর্শন করিতে পারিলে ভগবানের লীলা কি বলিতে পারা যায়? অসুর নাশ প্রভৃতি ত লয়ের অন্তর্গত সুতরাং এগুলি গৌণ। মুখ্য ব্যাপার কোন্‌টি? এইখানে একবার আমরা ভগবানের স্বরূপচিন্তা করিব। এই প্রবন্ধে অবয়ব প্রসঙ্গের শেষভাগে আমরা দেখাইয়াছি যে তিনি সুন্দর ও মূর্ত্তিমান আদিরস।

অতএব আদিরসের কার্য্যই তাঁহার মুখ্য লীলা। গৌণভাবে সকল কার্য্যই ভগবল্লীলা পদবী বাচ্য হইতে পারে কিন্তু মুখ্যতঃ পরম পুরুষের সহিত পরমা প্রকৃতির যে আদিরসপূর্ণ ক্রীড়া তাহাই ভগবল্লীলা। "নিরন্তর কামক্রীড়া যাঁহার চরিত" । (চরিতামৃত) শ্রুতিও বলিয়াছেন—

"তদ্‌ যথা প্রিয়য়া স্ত্রিয়া সম্পরিষক্তো ন বাহ্যং কিঞ্চন বেদ নান্তরমেব অয়ং পুরুষঃ প্রাজ্ঞেনাত্মনা সম্পরিষক্তো ন বাহ্যং কিঞ্চিনবেদ নান্তরংতদ্‌ বা অস্যৈ তদাপ্তকামমকামং রূপং শোকান্তরাম্‌॥

ইতিপূর্ব্বে আমরা পরমা প্রকৃতি সম্বন্ধে কিছু বলি নাই। সুতরাং পরমা প্রকৃতি কি তাহা জানিবার জন্য কৌতূহল হইতে পারে। সেই জন্য এখানে ঐ শব্দের বাচ্য সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আভাস প্রদান করিব।

পূর্ব্বে আমরা যে একের কথা বলিয়াছি সেই 'এক' কোন সময়ে ইচ্ছা করেন "একোঽহং বহুস্যাং প্রজায়েয়ম্‌" (শ্রুতি) আমি এক আছি বহু হইব। ঐ ইচ্ছাই সেই একের একত্ব বা অদ্বিতীয়ত্বকে ভঙ্গ করিয়া বহুত্বে পরিণত করে। একই বহু হন অথচ কি এক অচিন্ত্য, অতর্ক্য শক্তি প্রভাবে একও থাকেন। উর্ণনাভের উদাহরণে প্রথমে আমরা তাহা কিয়ৎ পরিমাণে

বুঝিয়াছি। এই বহুর মধ্যে আবার যাঁহারা সেই পরম পুরুষের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আনন্দবিধান করেন তাঁহারা পরমাপ্রকৃতি বা ভগবানের হ্লাদিনী শক্তি। তাঁহাদের মধ্যে যিনি প্রধানা যুগেশ্বরী তাঁহার নাম আরাধিকা বা রাধিকা।

একই বহু হন, অথচ একও থাকেন—ইহা বুঝাইবার জন্য পূজ্যপাদ চরিতামৃতকার বলিয়াছেন—

"মণি যথা অবিকৃত প্রসবেহেমভার।
জগদ্রূপ হয় ঈশ্বর—তবু অবিকার॥" (মধ্যলীলা)

ক্ষুদ্র হইলেও আমরা আর একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা ঐ কথাটি বুঝিবার চেষ্টা করিব। যেমন একজন পূর্ব্বপুরুষ হইতে পুত্র পৌত্রাদিক্রমে বহুজন জন্মলাভ করে অথচ সেই পূর্ব্বপিতামহও যদি বর্ত্তমান থাকেন—সেইরূপ। উর্ণনাভ দৃষ্টান্তেও দেখা গিয়াছে যে, জালখানি উর্ণনাভ হইতেই হয় অথচ উর্ণনাভও স্বতন্ত্র থাকে। সেইরূপ বিশ্বজাল রচিত হইলেও রচয়িতা স্বতন্ত্রভাবেও বর্ত্তমান আছেন। তাই প্রকৃতি পুরুষ, তাই রাধাকৃষ্ণ—"একাত্মানা বপি ভুবি পুরা দেহভেদংগতৌতৌ। আর, "পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে" (শ্রুতি)।

শ্রীসত্যচরণ চন্দ্র বি, এল

শ্রীশ্রীচৈতন্যাষ্টকের বঙ্গানুবাদ।

(মাতৃদর্শনার্থ শ্রীধাম নীলাচল হইতে গৌড়াগত শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্তব।)

১

তপ্ত চামীকর-পীত প্রভা সমন্বিত।
ইন্দ্রনীলমণি শ্যাম অবয়ব যুত॥
চতুর্থ-শ্রীকলিযুগে বুধগণ যাঁরে।
সংকীর্ত্তন মখে মুখ্য সমার্চ্চনা করে॥
চতুর্থ আশ্রমিবৃন্দ উপাস্য উত্তম।
কহে যাঁরে শ্রীভারতে ভীষ্মাদি সত্তম॥
পাষণ্ডি-বিজয় সেই চৈতন্য মূরতি।
করুন পরম কৃপা আমাদের প্রতি॥

(২)

শান্তিপুরে ঘরে ঘরে প্রচারি' কীর্ত্তন।
অতিদুঃখযোগ্য পাপী যে কৈল তারণ॥
উচ্চে ঘোষি' "জয়কৃষ্ণ পতিত পাবন"।
স্ব-বিরহে যেই কৈলা জননী-তোষণ॥
উদয়-উন্মুখ ভানু প্রভা যেই হরে।
হেম রক্তাম্বরে যাঁর কটিশোভা করে॥
পাষণ্ডি-বিজয় সেই চৈতন্য মূরতি।
করুন পরম কৃপা আমাদের প্রতি॥

(৩)

আস্বাদিতে কোন এক ভাব বাক্যাতীত।
অপ্রাকৃত সুমধুর রসের রচিত॥
স্নিগ্ধ অনুরাগময়ী ব্রজাঙ্গনা মাঝে।
অপার পীরীতি কারো হরি' নিজকাজে॥
তাঁর তপ্ত স্বর্ণকান্তি প্রকাশি' উপরে।
আবরিলা নিজদ্যুতি যে তস্কর বরে॥
পাষণ্ডি-বিজয় সেই চৈতন্য মূরতি।
করুন পরম কৃপা আমাদের প্রতি॥

(৪)

তামস দেবতা প্রিয় যত চরাচরে।
চিরদিন ভক্তি করি' না পায় যাঁহারে॥
দৈবী ভাবগত ভক্তগণ সন্নিধানে।
সদারাধ্য রূপে জয়যুক্ত ত্রিভুবনে॥
সহজ আনন্দরসে মধুর দর্শন।
কমলা-বল্লভ বিশ্ব-প্রেম-পরায়ণ॥
পাষণ্ডি-বিজয় সেই চৈতন্য মূরতি।
করুন পরম কৃপা আমাদের প্রতি॥

(৫)

পউণ্ড্রবাসীর যিনি সাধ্য ও সাধন।
পূজ্য হৈল নবদ্বীপ লভি যেই ধন॥
বৈদিক ব্রাহ্মণ কুল ভুবন সহিত।
হইয়াছে যাঁর আবির্ভাবে অলঙ্কৃত॥
স্বীকার করিয়া ভবে সন্ন্যাস আশ্রম।
পবিত্র করিলা তাহা যে কলি-পাবন॥
পাষণ্ডি-বিজয় সেই চৈতন্য মূরতি।
করুন পরম কৃপা আমাদের প্রতি॥

(৬)

পয়োধি হইতে বাষ্প করি' আকর্ষণ।
পয়োদ শীতল করে যথা ত্রিভুবন॥
রসাব্ধির বাষ্প তথা হরিনামামৃত।
আকর্ষি' বদনে, প্রাণে করি' সুসঞ্চিত॥
বরষি' নয়ন পথে প্রেম বারি ধারা।
শীতল করেন যিনি তপ্ত বসুন্ধরা॥
প্রেমের স্বরূপ বুঝাইতে বিশ্বজনে।
পরম উল্লাস যিনি বাসিতেন মনে॥
পাষণ্ডি-বিজয় সেই চৈতন্য মূরতি।
করুন পরম কৃপা আমাদের প্রতি॥

(৭)

পরকাশি' তনুনব কাঞ্চন বরণ।
কটিতে করঙ্ক শোভা করি' প্রকটন॥
তরুণ কুঞ্জর গতি গঞ্জিত গমন।
নিরন্তর নামামৃত পানে নিমগন॥
ঈশ্বর প্রসাদে স্বীয় রুচি যেই রূপ।
শিখাইলা প্রিয়গণে যেই প্রেমভূপ॥
পাষণ্ডি-বিজয় সেই চৈতন্য মূরতি।
করুন পরম কৃপা আমাদের প্রতি॥

(৮)

মৃদুমন্দ হাস্য জ্যোতি যাঁর অতুলন।
জগৎবাসীর শোক করে নিবারণ॥
সংভাষণ-উপক্রম যাঁর মনোহর।
কল্যাণ বিস্তার করে ভুবন ভিতর॥
দেবারাধ্য যাঁর পাদপদ্ম সমাশ্রয়।
কাহার না কৃষ্ণপ্রেম করে সমুদয়?
পাষণ্ডি-বিজয় সেই চৈতন্য মূরতি।
করুন পরম কৃপা আমাদের প্রতি॥

(৯)

শ্রীশচীসুতের এই কীর্ত্তিপদ্যচয়।
পবিত্রতাপূর্ণ নব পরিমল ময় ॥
প্রফুল্ল মানস যেই অধ্যয়ন করে।
সেই লক্ষ্মীবান নিজ পাদপদ্মে তারে ॥
প্রীতিদান করি' সর্ব্ব মঙ্গল আকর।
থাকুন স্বসুখে নির্বিরোধে নিরন্তর ॥

শ্রীসত্যচরণ চন্দ্র, বি, এল,

আমার সাধু-দর্শন। (৫)

আজ শ্রীগৌর-পূর্ণিমা-রজনী, বৈষ্ণব-পরিবার বলিয়া জনসমাজে আমাদের প্রচার। কাজেই এ তিথিকে আমরা পরমার্চ্চনীয় বলিয়াই পালন করিয়া থাকি। জ্ঞান হওয়া পর্য্যন্ত দেখিতে পাই এদিনে বাড়ীতে কেহই অন্ন গ্রহণ করেন না। আর সমর্থ হইলে অনেকে নিরম্বু উপবাসীও থাকেন। আমিও সমস্ত দিন উপবাসী ছিলাম—সন্ধ্যার পর প্রভুর ভোগ রাগ হইলে সামান্য কিছু জলযোগ করিয়া সদর ঘরের দরোজায় দাঁড়াইয়া ভাবিতেছি "আজ এমনদিনে বাড়ীতে একটু কীর্ত্তনানন্দ হইবে না?" এমন সময় দেখি বন্ধুবর নরেশ আসিয়া উপস্থিত; আমাকে দেখিয়া বলিল "চল ভাই আজ মহাপুরুষের নিকট যাইয়া তাঁহাকে তোমাদের বাড়ীতে লইয়া আসি।" আমি বলিলাম "ভাই সে সৌভাগ্য কি আমাদের হইবে, তিনি কি আর কষ্ট ক'রে এতদূর আসিবেন? বরং এস আমরাই একটু কীর্ত্তনানন্দ করি।" নরেশ বলিল "চল না, একবার চেষ্টা ক'রেই দেখাযাউক, না হয় এসে কীর্ত্তন করা যাবে; আর আজিকার এমন দিনে তাঁহাকে দর্শন করাটাও কি সৌভাগ্য নয়?" আর কোন কথা না বলিয়া দুইজনে মহাপুরুষের নিকট চলিলাম। গঙ্গার কিনারা দিয়াই মহাপুরুষের নিকট যাইবার রাস্তা, সেই রাস্তাতেই উভয়ে চলিলাম।

একে ভরা পূর্ণিমার রাত্রি, তাহাতে আবার গঙ্গাদেবীর সেই কুলু কুলু ধ্বনিতে মুখরিত পথ ঘাট আজ বড়ই শান্তিময় বোধ হইল। যাইয়া দেখি মহাপুরুষের নিকট অনেক ভক্ত, মণ্ডলী-বদ্ধ করিয়া বসিয়া কীর্ত্তন করিতেছেন।

—আহা! সে মধুর সংগীতধ্বনি আজও যেন আমার কর্ণে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। মহাপুরুষ নিজে প্রথমে গাহিতেছেন আর ভক্তমণ্ডলী সমস্বরে দোহারকি করিতেছেন; একটু বসিয়া শুনিলাম—বুঝিলাম মহাজনী পদ, আর মহাপ্রভুর জন্ম-লীলারই পদ। পাঠকগণ বোধহয় পদটী জানিতে চান্—পদটী বৈষ্ণব-কবি বাসু ঘোষের লিখিত। যথা:—

নদীয়া-আকাশে আসি উদিল গৌরাঙ্গ শশী
ভাসিল সকলে কুতূহলে।
লাজেতে গগন-শশী মাখিল বদনে মসি
কাল পেয়ে গ্রহণের ছলে॥
বামাগণ উচ্চৈঃস্বরে জয় জয় ধ্বনি করে
ঘরে ঘরে বাজে ঘণ্টা শাঁক।
দামামা দগড় কাঁসি সানাই ভেঁউড় বাঁশী
তুড়ী ভেড়ী আর জয়ঢাক॥
মিশ্র জগন্নাথ মন মহানন্দে নিমগন
শচীর সুখের সীমা নাই।
দেখিয়া নিমাইর মুখ ভুলিয়া প্রসব দুঃখ
অনিমিখে পুত্র মুখচাই॥
গ্রহণের অন্ধকারে কেহনা চিহ্নয়ে কারে
দেব নরে হৈল মিশামিশি।
নদীয়া-নাগরী সঙ্গে দেবনারী আসি রঙ্গে
হেরিছে গৌরাঙ্গ-রূপরাশি॥
পুত্রের বদন দেখি জগন্নাথ মহাসুখী
করে দান দরিদ্র সকলে।
ভুবন আনন্দ ময় গৌর-বিধু-সমুদয়
'বাসু'কহে জীব ভাগ্যফলে॥

এই পদকীর্ত্তন হইতেছিল। কিন্তু মধ্যে মধ্যে মহাপুরুষ এমন সুন্দর সুন্দর এক একটী অক্ষর (আখর) দিতেছিলেন যে, তাহা শুনিয়া যথার্থই আমার ন্যায় পাষণ্ডও কীর্ত্তনের আনন্দোৎসবে যোগদান না করিয়া পারে নাই। শুধু কি তাই, এক একবার মহাপুরুষের এমন কম্প হইতেছে যে, মনে হইতে

লাগিল বোধহয় সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ভগ্ন হইয়া গেল, আবার দেখি ঠিক হইয়া বসিয়া আছেন। এই ভাবে কখন কম্পায়মান, কখন স্থির, কখন ক্রন্দনপরায়ণ, কখনও বা ভীষণ বেগে মস্তক সঞ্চালন ইত্যাদি নানা প্রকার ভাব প্রকাশেরদ্বারা পাষণ্ডীগণকে আকর্ষণ করিতেছিলেন।

কীর্ত্তন কখন আরম্ভ হইয়াছে জানিনা কিন্তু যখন শেষ হইল তখন রাত্র পৌনে দশটা। কীর্ত্তনান্তে মহাপুরুষ নিজহাতে হালুয়া প্রসাদ ভক্তগণকে বিতরণ করিলেন—আমার সৌভাগ্য ক্রমে কিঞ্চিৎ পাইলাম। প্রসাদ পাইয়া বন্ধুবর নরেশ মহাপুরুষের নিকট আমাদের বাড়ীতে যাইবার প্রস্তাব করিলে মহাপুরুষ কোনরূপ আপত্তি না করিয়া আনন্দের সহিতই যাইতে স্বীকার করিলেন এবং ভক্তগণকেও বলিলেন—'তোমরা যদি কেহ যাইতে ইচ্ছা কর তবে চল।'

দু'চার জন ভিন্ন কেহই বড় আপত্তি করিল না, যখন দেখিলেন দলবেশ পুষ্ট, তখন বলিলেন শুধু মুখে কোথাও যাওয়া ঠিক নয়, চল সকলে মিলিয়া কীর্ত্তন করিতে করিতে যাই। আমরাও ত তাহাই চাই—আর অপত্তি করে কে? সঙ্গে দুইখানি খোল ৩।৪ জোড়া করতাল চলিল, মহাপুরুষ গান ধরিলেন ;—

"গৌর বরণ প্রেমিক রতন এসেছে ধরায়।
নগরবাসী দেখ্‌বি যদি ত্বরা ক'রে ছুটে আয়॥"

আহা! সে যে কি সুন্দর তার তুলনা হয় না। যত ভক্তগণ সকলেই যেন আজ আত্মহারা, আজ অনেক দিন হইতে মহাপুরুষ গঙ্গাতীরে আছেন বটে, কিন্তু এমনটি আর একদিনও হয় নাই—তারপর সেই প্রশান্ত বদন-মণ্ডল কীর্ত্তনের সময় কি অতুলনীয় ভাবে যে দৃষ্ট হইতে ছিল, তাহা যে সৌভাগ্যবান ভক্ত একবার দেখিয়াছেন তিনিই জানেন—সুধু কি তাই, মধ্যে মধ্যে আজানুলম্বিত বাহু উত্তোলন করিয়া নৃত্য, সে যে আরও মধুরতর। কীর্ত্তনের পরিশ্রমে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম মহাপুরুষের পরিসরকপালে মুক্তা বিন্দুর ন্যায় শোভা পাইতেছে। এমনি করিয়া ক্রমে আমাদের বাটীর সম্মুখে উপস্থিত—অমনি কোথা হইতে একজন হিন্দুস্থানী ভক্ত একগাছী ফুলের মালা আনিয়া মহাপুরুষের গলদেশে দিলেন, ভক্তগণও উচ্চকণ্ঠে "গৌরহরিবোল" বলিয়া উঠিলেন আর অন্তঃপুর হইতেও মঙ্গল সূচক শঙ্খধ্বনি—উলুধ্বনি সেই আনন্দকে শতগুণ বর্দ্ধিত করিয়া দিল। কিছু সময় কীর্ত্তন বেশ জোরেই চলিল।

কীর্ত্তনশেষ করিয়া মহাপুরুষ আমাদিগের ঠাকুরঘরে গেলেন। শ্রীবিগ্রহ দর্শন করিয়া কি জানি কিভাবে বিভোর হইলেন, আমরা শুধু দেখিতে লাগিলাম দুটী নয়ন হইতে অজস্রধারে বারি বর্ষণ হইতেছে। কিছুকাল এই ভাবে গেল তিনি স্থির হইয়া যেমন বাহিরে আসিয়া বসিলেন অমনি সকলেই যথাসাধ্য তাঁর সেবা করিতে লাগিল। যদিও তিনি তাহাতে সঙ্কুচিত হইতেছিলেন তথাপি কেইই ছাড়িল না। সামান্য সামান্য একটু সেবা পাইয়াও যেন পরস্পর আপনাকে ধন্য মনে করিতেছিল।

প্রায় একঘণ্টা পরে আমরা সকলেই মহাপুরুষের মুখপানে চাহিয়া আছি—আমাদের ইচ্ছা তিনি কিছু উপদেশ আমাদিগকে দেন। অন্তর্য্যামী যেন সে কথা বুঝিতে পারিয়াই ধীরে ধীরে বলিলেন ;—

"এমনি দিনে আমার গৌরসুন্দর নবদ্বীপধামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। কি বলিয়া যে তাঁহার সে দয়ার কথা কীর্ত্তন করিব সে ভাষা খুঁজিয়া পাই না। আহা! ভুবন মঙ্গল পরম কারুণিক শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু জীবের দুর্দ্দশা দেখিয়াই তাহা মোচন করিতে এই প্রপঞ্চ জগতে আগমন করিয়াছিলেন। তাঁহার আগমনে একদিকে যেমন জীবের দুর্দ্দশা ঘুচিল, অন্যদিকে তেমন জীব উন্নত-উজ্জ্বল প্রেমরসাস্বাদনের অধিকারী হইল। ব্রজগোপীভিন্ন অন্য কেহ এমন কি বৈকুণ্ঠের অধিশ্বরী লক্ষ্মী পর্য্যন্তও যে প্রেমধন পায় নাই, ব্রহ্মাদি দেবগণও যে প্রেম পাইবার জন্য লালায়িত, তাহা অতি দীন হীন কাঙ্গাল কলিজীবে পাইল। সত্য সত্যই বৈষ্ণব-কবি প্রেমানন্দ দাস বলিয়া গিয়াছেন :—

"এ মন! গৌরাঙ্গ বিনে নাহি আর।
হেন অবতার হবে কি হ'য়েছে হেন প্রেম পরচার॥
দুরমতি অতি পতিত পাষণ্ডী প্রাণে না মারিল কারে।
হরিনাম দিয়ে হৃদয় শোধিল যাচি গিয়া ঘরে ঘরে॥
ভববিরিঞ্চির বাঞ্ছিত যে প্রেম জগতে ফেলিল ঢালি।
কাঙ্গালে পাইয়ে খাইল নাচিয়ে বাজাইয়ে করতালি
হাসিয়ে কাঁদিয়ে প্রেমে গড়াগড়ি পুলকে ব্যাপিল অঙ্গ।
চণ্ডালে ব্রাহ্মণে করে কোলাকুলি কবে বা ছিল এ রঙ্গ॥
ডাকিয়ে হাঁকিয়ে খোল করতালে গাইয়ে ধাইয়ে ফিরে।
দেখিয়া শমন তরাস পাইয়া কপাট হানিল দ্বারে॥

এ তিন ভুবন আনন্দে ভরিল উঠিল মঙ্গল রোর।
কহে প্রেমানন্দ এমন গৌরাঙ্গে রতি না জন্মিল তোর ॥"

বেশী দিনের কথা নয় ৪৩৫ বৎসর পূর্ব্বে এমনি দিনে তিনি গোলকের সমস্ত সুখ ঐশ্বর্য্য ছাড়িয়া, আমাদের সুখে সুখী দুঃখে দুঃখী হইয়া, আমাদের মধ্যেই একজন হইয়া আসিয়াছিলেন। বাঙ্গালী জাতি আমরা, আমাদের এ সৌভাগ্য, এ গর্ব্ব বড় কম নয়। যাঁহাকে যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র সাধ্য-সাধনা করিয়াও পায় না, তিনি যে আমাদের মধ্যে আমাদেরই একজন হইয়া আমাদেরই পিতৃপুরুষের কুল উজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন। বন্ধুগণ! মহাপ্রভুর গুণ-গরিমা আমি কেন আমার মত সহস্র সহস্র ব্যক্তিও কণামাত্র বর্ণনা করিতে অক্ষম। তাই তো বৈষ্ণব কবি বড় গলায় বলিয়াছেন—

"(যদি) লাখে লাখে হয় মুখ,   তবে সে মনের সুখ,
প্রাণভরি গৌর-গুণ গাই।"

ভারতবর্ষ আমাদের অবতারের জন্য সুপ্রসিদ্ধ অর্থাৎ ভগবানের নানাভাবে নানাসময়ে নানা অবতার এই দেশেই হইয়াছে, আর শ্রীভগবান সকল অবতারেই তাঁর ঐশ্বর্য্যের প্রচার করিয়াছেন, এ অবতারেও যে তাহা না করিয়াছেন তাহা নহে; তবে সে ঐশ্বর্য্যের সঙ্গে সঙ্গেও যে কেমন এক অপূর্ব্ব ভাব মিশ্রিত। লোচন দাস ঠাকুর একস্থানে মহাপ্রভুর কথা বলিতে বলিতে বলিয়াছেন :—

"হেন অবতার কে দেখিয়াছে কোন যুগে।
কেবা কোন অবতারে পাপীর পাপ মাগে॥"

রসিকভক্ত বাসুঘোষ এই কথারই প্রতিধ্বনি করিয়া বলিয়াছেন—

"কে আর করিবে দয়া পতিত দেখিয়া।
পতিত দেখিয়া কেবা উঠিবে কান্দিয়া॥"

বন্ধুগণ! বলুন দেখি কোন অবতারে এমন গলিত কুষ্ঠ রোগীকে আলিঙ্গন করিয়া তাহাকে ভবরোগ ও দেহরোগ হইতে মুক্ত করিয়াছেন? কোন অবতারে সমস্ত সুখভোগ ত্যাগ করিয়া এমন দীন হীন কাঙ্গাল সাজিয়া দ্বারে দ্বারে হরিনাম ভিক্ষা করিয়া বেড়াইয়াছেন? এই ত তাঁর জীবেদয়ার কথা, প্রেমের কথা, ভক্তির কথা, যে দিক দিয়া ধরিবেন মহাপ্রভুর সহিত তুলনা দিবার আর

দ্বিতীয় কাহাকেও পাইবেন না। আমরা যাহাকে সকলের চেয়ে বেশী প্রীতির জিনিষ বলিয়া জানি সেই যুবতী স্ত্রী, বৃদ্ধামাতা, সমস্ত বৈভব, ভুবন বিখ্যাত যশ সকল ত্যাগ করিয়া "হাকৃষ্ণ হাকৃষ্ণ" বলিয়া পাগলের ন্যায় পথে পথে বেড়াইতে-ছেন, হঠাৎ পথিমধ্যে রাখাল বালকগণের মুখে হরিনাম শ্রবণ করিয়া তাহাদের কাছে গিয়া বলিতেছেন "আরে ও ব্রজের রাখালগণ, এ নাম কোথাই পেলি—কে শিখালে—এই যে আমি ম'রে ছিলাম, হরিনাম শুনে প্রাণ পেলাম।" প্রেম বিভোর গৌরসুন্দর আমার নীলাচলে গিয়াছেন, কোথায় কৃষ্ণ কোথায় কৃষ্ণ বলিয়া কাঁদিয়া বেড়াইতেছেন। যাহাকে দেখেন তাহাকেই সুধাইতেছেন, "কৃষ্ণ কোথা বলিতে পার, এই যে ছিলেন কোন পথে গেলেন তোমরা জান কি ?" ভক্তগণ বলুন দেখি, কোন অবতারে এমন করিয়া প্রেমের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিয়াছেন—

"কাঁহা মোর প্রাণনাথ মুরলীবদন।
কাঁহা মোর গুণনিধি সে চাঁদ বদন॥
কাঁহা মোর প্রাণবন্ধু নবঘন শ্যাম।
কাঁহা মোর প্রাণেশ্বর শত কোটী কাম॥"

মহাপ্রভু বক্তৃতা করিতেন না, উপদেশ দিতেন না তবে যাহা করিতেন তাহার বিন্দুমাত্র বলিলাম অর্থাৎ তিনি নিজে আচরণ করিয়া দেখাইতেন জীব! এমনি করিয়া কাঁদ, এমনি করিয়া হা কৃষ্ণ বলিয়া পাগল হইয়া বেড়াও জীবন জনম ধন্য হইবে। বন্ধুগণ! আমার এমন দয়াল প্রভুর শুভ আবির্ভাব তিথি আজ। আজ আর কোন কথা বা উপদেশ দিয়া সময় কাটাইতে ইচ্ছা হয় না, আসুন সকলে মিলিয়া সেই করুণাসিন্ধু শ্রীগৌরাঙ্গচাঁদের নাম কীর্ত্তনে মাতোয়ারা হই।"

এই বলিয়া মহাপুরুষ ভাব-বিগলিত কণ্ঠে গাহিলেন ;—

গৌরবরণ প্রেমিক রতন এসেছে ধরায়।
(প্রেম) কে নিবি কে নিবি বলি ডাকে উভরায়॥
(প্রেম-বিলায়ে যায় গো হরিনাম বিলায়ে যায়॥)

দুটি বাহু তুলে নাচে হরি বলে
রাধা ব'লে প'ড়ে ঢলে পাগলের প্রায়॥

আঁখি অরুণ বরণ করে সঘনে রোদন
নয়ন জলে ভাসে ভুবন অঙ্গ ধূলাতে লোটায় ॥
গৌর নেচে নেচে যায় ফিরে ফিরে চায়
রূপ নেহারি সব পাশরি কে না বিকায় গোরা পায় ॥
গৌর নটন দেখে যে ফিরে কি যেতে পারে সে
গৌর তোমার হ'লাম ব'লে সে চরণে বিকায় ॥
মদনের দর্পহারী গৌররূপ মাধুরী
রূপ নেহারী রতি পতি ছাড়ি বিকাইছে গোরাপায় ॥
রূপ দে'খলে মনে হয় কত কোটী চাঁদের উদয়
পদপানে চেয়ে দেখি চাঁদ পদ নখে শোভা পায় ॥
যারে দেখে নয়নে বলে করুণ বচনে
আর তোদের ভাবনা কেনে হরি বল উভরায় ॥
করি যোড়পাণি বলে গৌরগুণমণি
যদি প্রেমধনে হরিধনী হরি ব'লে ছুটে আয় ॥

এই গান বহুক্ষণ ধরিয়া হইল তার পরই "সবাই মিলে প্রাণ খুলে গৌরহরি হরিবল" এই পদ ধরিয়া উদ্দণ্ডনৃত্য ও কীর্ত্তনে রাত্র প্রভাত করিয়া মহাপুরুষ নিজ আশ্রমে ফিরিলেন, দু'চারজন ভিন্ন প্রায় সকলেই মহাপুরুষের সঙ্গে গঙ্গাতীরে চলিলেন, আমাকে বাধ্য হইয়া সেবাপূজার জন্য আশ্রমে থাকিতে হইল। আনন্দময় শ্রীগৌর-ভগবানের কৃপায় কোনও আয়োজন না করিয়াও পূর্ণিমার নিশি শ্রীহরি-কথা আলাপ-কীর্ত্তনে কাটিয়া গেল। এ আনন্দ, এ মহা-সম্মিলন জীবনে আর হইবে কি না জানি না। ধন্য ধন্য গৌরভক্তগণ, আর ধন্য আমরা, কেন-না যে যুগে করুণাসিন্ধু গৌর-প্রভুর আবির্ভাব সেই যুগেই আমরাও আসিয়া তাঁহার নাম কীর্ত্তনে আনন্দ পাইতেছি। হরিবোল হরি।—

বিজয়া দশমী

মাটির এ খেলাঘরে দিল মিষ্ট সিদ্ধি
আশায় আস্বাদি হ'ল প্রাণ শুষ্কে ভরা
নীরস কঠিন সুধু দারুণ কর্কশ
হু হু করে বায়ু যেন জ্বালা তাহে পুরা ॥

"আমি" ও "আমার" ঘেরা আমি ও আমাতে
করিলাম আলিঙ্গন চিরপ্রথা মত।
পরাণের আকুলতা তৃষা মিটিল না।
নাহি হ,ল তৃপ্ত প্রাণ চাহে যেন কত—
কি সব; না পাই করে অতৃপ্ত ক্রন্দন।
যেই সুখ, যেই তৃপ্তি, যে আনন্দ চায়,
"কণা ও রেণু"র মাঝে তার কিছু নাই।
কোথা সুখ, কোথা শান্তি, কোথায়! কোথায়॥
জন্ম হ'তে জন্মান্তরে করি হাহাকার,
সারা দেহে, সারা প্রাণে মাখি কাদা ধূলা
পড়ে আছি নাথ! আমি, তোমা হতে দূরে।
হে দয়িত! কত দিন রব আরো হ'য়ে আত্ম-ভোলা।
ঈপ্সিত! বল্লভ! দেব! সুন্দর মহান্
চমকি ছুটিল প্রাণ, ছিল যাহা ভুলি—
সে পথে; দেখিল চাহি সুধু "তুমি"-ময়।
কি আনন্দ। কিবা শান্তি!! হ'য়ে পদ-ধূলি।

শ্রীনিত্যানন্দ গোস্বামী

শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র পুরী

"ভক্তিরসে মাধবেন্দ্র আদি সূত্রধার।
শ্রীগৌরচন্দ্র কহিয়াছেন বার বার॥"—চৈঃ ভাঃ।

সে আজ অনেক দিনের কথা। তখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অবতীর্ণ হন নাই। দেশ তখন একরূপ বিষ্ণুভক্তিশূন্য। শ্রীচৈতন্যভাগবতকার তৎকালীন সমাজের এইরূপ একটী নিপুণ চিত্র তাঁহার অমর তুলিকায় অঙ্কিত করিয়াছেন,—

"ধর্ম্ম কর্ম্ম লোক সব এই মাত্র জানে।
মঙ্গল চণ্ডীর গীতে করে জাগরণে॥

দেবতা জানেন সবে ষষ্ঠী বিষহরি।
তাহারে সেবেন সবে মহাদম্ভ করি॥
ধন বংশ বাড়ুক করিয়া কাম্য মনে।
মদ্য মাংসে দানব পূজয়ে কোন জনে॥
যোগীপাল ভোগীপাল মহীপালের গীত।
ইহা শুনিবারে সর্ব্বলোক আনন্দিত॥
অতি বড় সুকৃতি যে স্নানের সময়।
গোবিন্দ পুণ্ডরীকাক্ষ নাম উচ্চারয়॥
বিষ্ণুমায়াবশে লোক কিছুই না জানে।
সকল জগত বদ্ধ মহা তমোগুণে॥"—অন্ত্যখণ্ড।

দেশের সেই দুর্দ্দিনে কিন্তু একটি সম্প্রদায় সমগ্র ভারতে বিষ্ণু-ভক্তি প্রচার করিবার ভার লইয়াছিলেন। আমরা অতীব গৌরবের সহিত বলিব, তাঁহারা শ্রীমাধ্বীসম্প্রদায়। এই শ্রীমাধ্বীসম্প্রদায়ভুক্ত পরমভগবদ্ভক্ত ব্যাসতীর্থের প্রধান শিষ্য শ্রীমল্লক্ষ্মীপতির নিকট হইতেই আমাদের নিত্যানন্দ প্রভু মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। যথা,—

"নিত্যানন্দ ন্যাসী প্রতি কহে বার বার।
মন্ত্র-দীক্ষা দিয়া কর আমায় উদ্ধার॥
নিত্যানন্দ প্রভুর এ মধুর বাক্যেতে।
নেত্র জলে ভাসে ন্যাসী নারে স্থির হৈতে॥
শ্রীবলদেবের আজ্ঞা লঙ্ঘিতে নারিল।
সেই দিন নিত্যানন্দে দীক্ষা-মন্ত্র দিল॥"

ভক্তিরত্নাকর, ৫ম তরঙ্গ।

শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রও এই লক্ষ্মীপতির শিষ্য। সুতরাং উভয়ে গুরু-ভ্রাতা হইতেছেন। কিন্তু,—

"নিত্যানন্দে বন্ধু জ্ঞান করে মাধবেন্দ্র।
মাধবেন্দ্রে গুরু বুদ্ধি করে নিত্যানন্দ॥"

শ্রীচৈতন্যভাগবতের আদিখণ্ডে মাধবেন্দ্র বলিতেছেন,—

"জানিনু কৃষ্ণের প্রেম আছে মোর প্রতি।
নিত্যানন্দ হেন বন্ধু পাইনু সম্প্রতি॥"

অন্যত্র,—

"মাধবেন্দ্র প্রতি নিত্যানন্দ মহাশয়।
গুরুবুদ্ধি ব্যতিরিক্ত আর না করয়॥"

তৎকালীন ভক্তি-গ্রন্থসমূহের এক মধুর অধ্যায় এই মাধবেন্দ্র পুরী কর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়াছে। তাঁহার অনন্যসাধারণ কৃষ্ণপ্রেম তৎকালীন জগতের এক দর্শনীয় বস্তু ছিল।

"মাধব পুরীর প্রেম অকথ্য কথন।
মেঘ দরশনে মূর্চ্ছা পায় সেই ক্ষণ॥
কৃষ্ণনাম শুনিলেই করেন হুঙ্কার।
ক্ষণেকে সহস্র হয় কৃষ্ণের বিকার॥"—চৈঃ ভাঃ।

তখনকার সেই বিষ্ণুভক্তিশূন্য সমাজে অবস্থান করা তাঁহার পক্ষে বিষবৎ বোধ হইত। সুতরাং লোকসমাজ ত্যাগ করিয়া তিনি বনে বনে ফিরিতে লাগিলেন এবং কয়েক জন প্রিয় শিষ্য সমভিব্যাহারে লইয়া কৃষ্ণ-প্রেম-সুখ-সিন্ধুনীরে ভাসমান থাকিতেন। 'রোমহর্ষ, অশ্রু, কম্প' এ সমস্ত সর্ব্বদাই তাঁহার পবিত্র শরীরে বিরাজিত থাকিতে দেখা যাইত। মাঝে মাঝে হুঙ্কার, গর্জ্জন ও মহাহাস্য করিতেন। গাত্র স্তম্ভিত হইতেছে, আর সর্ব্বাঙ্গ বহিয়া ঘর্ম্ম ঝরিয়া পড়িতেছে। বাহ্য মাত্র নাই, সর্ব্বদাই শ্রীহরির ধ্যানে চিত্ত নিরত। কি করিতেছেন, কোথায় যাইতেছেন, কিছুই স্থির নাই। পথে চলিয়া যাইতে যাইতে খানিক দাঁড়াইয়া নৃত্য করেন, আবার কখনও বা সুমধুর কণ্ঠে মধুর হরিধ্বনি করিতে থাকেন; কখনও বা তাঁহার পরমানন্দে এরূপ মূর্চ্ছা হয় যে, দুই তিন প্রহরেও বাহ্য ফিরিয়া আসে না; কখনও বা শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে এরূপ রোদন করিতে থাকেন যে, দেখিয়া মনে হয় যেন সাক্ষাৎ গঙ্গাদেবী নয়ন হইতে নির্গলিত হইতেছেন।

"কখন হাসেন অতি অট্ট অট্ট হাস।
পরানন্দ রসে ক্ষণে হয় দিগ বাস॥
এই মত কৃষ্ণ সুখে মাধবেন্দ্র সুখী।
সবে ভক্তি-শূন্য লোক দেখি বড় দুঃখী॥
তার হিত চিন্তিতে ভাবেন নিতি নিতি।
কৃষ্ণ প্রকট হয়েন এই তাঁর মতি॥

কৃষ্ণ-যাত্রা অহোরাত্রি কৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন।
ইহার উদ্দেশ নাহি জানে কোন জন॥"—চৈঃ ভাঃ অন্ত্যখণ্ড।

এইরূপে কিছুদিন গত হইলে একদা তাঁহার সহিত অদ্বৈত আচার্য্যের সাক্ষাৎ হয়। আচার্য্যও সকল সংসার বিষ্ণু-ভক্তি-শূন্য দেখিয়া অপার দুঃখে ভাবিত ছিলেন। তিনি শিষ্য মণ্ডলীর নিকট নিরন্তর গীতা ভাগবত পড়াইয়া, দৃঢ় চিত্তে ভক্তিযোগের ব্যাখ্যা করিতেন। এমনই সময়ে একদিন মাধবেন্দ্র পুরী আসিয়া তাঁহার গৃহে অতিথি হন, তিনি আগন্তুকের বৈষ্ণবোচিত লক্ষণ দেখিয়া, হৃষ্টচিত্তে শ্রীচরণে প্রণিপাত করিলেন। পুরী গোসাঞিও তাঁহাকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া—'সিঞ্চিলেন অঙ্গ তান প্রেমানন্দ জলে'। তাহার পর যে কৃষ্ণ কথার হিল্লোল উঠিল তাহাতে উভয়ে ভাসিয়া চলিলেন। যাঁহার প্রেম বর্ণনাতীত, মেঘ দর্শনে যিনি মূর্চ্ছিত হইতেন। কৃষ্ণনাম কর্ণে পশিলে যিনি হুঙ্কার করিয়া উঠিতেন, ক্ষণেকে যাঁহার শ্রীঅঙ্গে সহস্র সহস্র কৃষ্ণ-ভাবের-বিকার প্রকাশ পাইত সেই প্রেমিকাগ্রগণ্য মাধবেন্দ্র গোসাঞির সহিত মিলিত হইয়া অদ্বৈত প্রভু পরম পুলকিত চিত্তে তাঁহার নিকট উপদেশ গ্রহণ করিলেন। সুতরাং অদ্বৈত প্রভুও তাঁহার একজন মন্ত্র শিষ্য।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি লোক সমাজে তিনি সুখ না পাইয়া তীর্থে তীর্থে অথবা অরণ্যে পরিভ্রমণ করিতেন। কৃষ্ণ নামই তাঁহার সঙ্গী; শ্রীকৃষ্ণের গুণ গানেই তাঁহার সুখ। এইবার আমরা আমাদের নিত্যানন্দ প্রভুর সহিত তাঁহার মিলনের কথা বলিতেছি। আপনারা জানেন প্রভু আমাদের তাঁহার দ্বাদশবর্ষ বয়সে, জনৈক অবধূতের সহিত গৃহ ত্যাগ করেন। তিনি নানা তীর্থে পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন ইহাতে তাঁহার বিংশতিবর্ষ অতিবাহিত হইয়াছিল। এইরূপ সময়ে, একদা এই উদ্‌ভ্রান্ত প্রেমিকের সহিত মাধবেন্দ্রের সাক্ষাৎ হইল। নিতাই তাঁহাকে চিনিতেন না, দেখিলেন বহুশিষ্য পরিবেষ্টিত একটী প্রশান্ত মূর্ত্তি ভগবদ্ভক্ত সন্ন্যাসী পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছেন। তিনি আরও দেখিলেন সেই অপূর্ব্ব সন্ন্যাসীর কলেবর প্রেমময়, আর তাঁহার সঙ্গে যে সমস্ত অনুচর আছেন তাঁহারাও সকলে প্রেমময়। তাঁহাদের আহার কৃষ্ণ রস, অনবরত দেহে কৃষ্ণভাবেরই বিকাশ হইতেছে। অদ্বৈত আচার্য্য যাহার মন্ত্রশিষ্য সেই মাধবেন্দ্রের প্রেমের বড়াই আমরা আর অধিক কি করিব। মহাপ্রেমিক নিত্যানন্দ তাঁহাকে দেখিয়া প্রেমানন্দে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। এদিকে

শ্রীপাদ পুরী গোসাঞিরও সেই দশা ঘটিল। তাঁহাদের উভয়কে চেতনা শূন্য হইতে দেখিয়া ঈশ্বরপুরী আদি শিষ্যগণ আনন্দাতিশয্যে কান্দিতে লাগিলেন। কিছুকাল পরে চেতনা পাইয়া উভয়ে উভয়ের গলা ধরিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন, কখন প্রেমরসে বালুকায় গড়াগড়ি দিতেছেন, কভু বা কৃষ্ণ প্রেমের আবেশে হুঙ্কার করিয়া উঠিতেছেন। উভয়ের নয়ন হইতে প্রেমধারা প্রবাহিত হইয়া পৃথিবী সিক্ত হইতেছে। শ্রীঅঙ্গে কম্প অশ্রু ও পুলক-ভাব কত যে প্রকাশ পাইতেছে তাহার অন্ত নাই। এদৃশ্য দর্শনে সহজেই অনুমিত হয় যে শ্রীচৈতন্য চন্দ্র সর্ব্বদাই তাঁহাদের দেহে বিরাজ করিতেছেন।

উভয়েই মহা প্রেমিক; সুতরাং উভয়েই উভয়ের মিলনে মহানন্দ লাভ করিলেন। তিনি শ্রীপাদ নিত্যানন্দকে বক্ষে ধারণ করিলেন, অমনি প্রেমানন্দে তাঁহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল। এই যে এতদিন সংসারের দুরবস্থা দেখিয়া দুঃখিতান্তঃকরণে বনে বনে বিচরণ করিয়া বেড়াইতেছিলেন, আজ তাঁহার সে উদ্বেগের শান্তি হইল। নিত্যানন্দের প্রতি তাঁহার প্রীতি এতদূর বৃদ্ধ হইয়াছে যে, তাঁহাকে আর বক্ষ হইতে নামাইতে পারিতেছেন না।

কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া নিত্যানন্দ প্রভু বলিলেন—"আমি এতদিন যত তীর্থ দর্শন করিয়াছি তাহা আজ সফল হইল যেহেতু মাধবেন্দ্র পুরীর চরণ দর্শন করিতে পারিলাম।"

"নিত্যানন্দ বলে তীর্থ করিলাম যত।
সম্যক্ তাহার ফল পাইলাম তত॥
নয়নে দেখিনু মাধবেন্দ্রের চরণ।
এ প্রেম দেখিয়া ধন্য হইল জীবন॥"

আর মাধবেন্দ্র,—

"—নিত্যানন্দ করি কোলে।
উত্তর না স্ফুরে রুদ্ধ কণ্ঠ প্রেম-জলে॥"

কতক্ষণ পরে বলিলেন—

"—প্রেম না দেখিল কোথা।
সেই মোর সর্ব্বতীর্থ হেন প্রেম যথা॥
জানিল কৃষ্ণের কৃপা আছে আমার প্রতি।
নিত্যানন্দ হেন বন্ধু পাইনু সংহতি॥

যে সে স্থানে যদি নিত্যানন্দ সঙ্গ হয়।
সেই স্থান সর্ব্বতীর্থ বৈকুণ্ঠাদি ময় ॥
নিত্যানন্দ হেন ভক্ত শুনিলে শ্রবণে।
অবশ্য পাইবে কৃষ্ণচন্দ্র সেই জনে ॥
নিত্যানন্দে যাহার তিলেক দ্বেষ রহে।
ভক্ত হইলেও সে কৃষ্ণের প্রিয় নহে ॥—চৈঃ ভাঃ।

উভয়ের প্রেমে বদ্ধ হইয়া বহুদিবস উভয়ে একত্রে অবস্থান করেন। কৃষ্ণ প্রেমে মত্ত, দিবারাত্র কোথা দিয়া যাইতেছে জানেন না। কতক দিবস একত্রে অবস্থান করিয়া, মাধবেন্দ্র সরযুতে স্নান করিতে এবং নিত্যানন্দ সেতুবন্ধ দর্শনার্থে গমন করিলেন।

শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস শ্রীল বৃন্দাবনদাস মহাশয় ইহাদের মিলন কথা বর্ণনা করিয়া ফলশ্রুতি সম্বন্ধে বলিতেছেন,—

"নিত্যানন্দ মাধবেন্দ্র দুই দরশন।
যে শুনয়ে তারে মিলে কৃষ্ণ প্রেমধন ॥"

মাধবেন্দ্র পুরী প্রেম-ভক্তির যে বীজ রোপন করিয়া যান কালে তাহাই শ্রীচৈতন্যরূপী ফলবান মহাদ্রুমে পরিণত হয়। তাঁহার দুই স্কন্দ শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য ও শ্রীনিত্যানন্দ এবং বহু শাখা প্রশাখা উৎপন্ন হইয়া ভারতবর্ষ ছাইয়া ফেলিল। মাধবেন্দ্রের অন্যান্য শিষ্যগণ—

"পরমানন্দ পুরী আর কেশব ভারতী।
ব্রহ্মানন্দ পুরী আর ব্রহ্মানন্দ ভারতী ॥
বিষ্ণুপুরী কেশবপুরী পুরী কৃষ্ণানন্দ।
শ্রীনৃসিংহ তীর্থ আর পুরী সুখানন্দ ॥"

ইঁহারা সকলেই ভুবন পাবন শক্তি লাভ করিয়াছিলেন।

শ্রীচৈতন্য দীপিকা গ্রন্থে শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দরের ধ্যান মন্ত্রে এ সম্বন্ধে যেরূপ কথিত হইয়াছে ;—আমরা তাহার বঙ্গানুবাদটি নিম্নে দিলাম। বিস্তারিত জানিতে হইলে মূলগ্রন্থ দেখিবেন।—

"ধ্যান যথা, আশ্চর্য্য বৃক্ষের মূল স্বরূপ মুনি শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী এবং ত্রিলোক বিখ্যাত শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য যে বৃক্ষের প্ররোহ ও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু যাহার স্কন্ধ দেশ, রসময় শরীর শ্রীমদ্ভক্ত বক্রেশ্বর প্রভৃতি যাহার বিস্তৃত শাখা স্বরূপ, ভক্তিযোগ যাহার পুষ্প এবং প্রেমই যাহার অতি উত্তম ফল, বারংবার হরিনাম দ্বারা সকলের মনকে আর্দ্রীভূত করিয়া যিনি জগৎকে পবিত্র করিতেছেন। গ্রহণ ছলে পূর্ণিমাতে ব্রাহ্মণ গৃহে সাক্ষাৎ সেই ভগবান হরি এককালীন জগৎজনকে হরিনাম গ্রহণ করাইয়াছেন সেই গৌরাঙ্গ প্রভুকে আমি নিরন্তর ধ্যান করি।"

শ্রীমহাপ্রভুর গুরু পরম্পরা সম্বন্ধে উক্ত গ্রন্থকার নবদ্বীপ নিবাসী শ্রীপাদ মাধবাচার্য্যের বংশধর শ্রীযুক্ত শশীভূষণ গোস্বামী ভাগবতরত্ন মহাশয় তাঁহার উপাদেয় গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—

শ্রীমন্মধ্বমুনেঃ শিষ্যো পারম্পর্য্যানুসারতঃ।
মাধবেন্দ্রপুরী নাম তথেশ্বরপুরী স্বয়ম্॥
মাধবেন্দ্রপুরীশিষ্যৌ নিত্যানন্দাদ্বৈতচন্দ্রৌ।
ঈশ্বরশিষ্যতাং প্রাপ্তঃ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুঃ॥
দীক্ষিতা প্রভুনাতেন পত্নী বিষ্ণুপ্রিয়া স্বয়ম্।
সিদ্ধো মন্ত্রো যদি পতি স্তদা পত্নীং সদীক্ষয়েৎ॥
ইতি শাস্ত্রবলাদ্ধেতোঃ স্বভার্য্যা মুপদিষ্টবান্।
অথ তং যাদবাচার্য্যং সর্ব্বেষাং নঃ পরং গুরুম্॥
সানুজং দীক্ষয়ামাস কৃপয়া শক্তিরীশিতুঃ।
যাদবাচার্য্যশিষ্যোহভূৎ মাধবাচার্য্য আত্মবান্।
তস্য শিষ্য-প্রশিষ্যানুশিষ্যাবর্গমিহস্মৃতাঃ।
সংপ্রতিষ্ঠাপনায়াসৌ নৈজীং প্রতিকৃতিং ততঃ।
ভার্য্যামাজ্ঞায় ভগবান্ বভূবান্তর্হিতঃ প্রভুঃ॥

প্রথমতঃ পরম্পরাক্রমে শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য শিষ্য মাধবেন্দ্রপুরী ও ঈশ্বরপুরী। মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ও অদ্বৈত প্রভু এবং ঈশ্বরপুরীর শিষ্য শ্রীমন্মহাপ্রভু; তিনি আপনার ভার্য্যা শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে দীক্ষা প্রদান করেন, কারণ মন্ত্র যদি সিদ্ধ হয় তবে আপন পত্নীকেও দীক্ষা দিতে পারা যায়। এই তন্ত্রোক্ত শাস্ত্র বল হেতু তিনি পত্নীকে উপদেশ করিয়াছেন, অনন্তর আমাদিগের পরম গুরু শ্রীযাদবাচার্য্য ঈশ্বরের শক্তি শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়ার নিকটে দীক্ষিত হন।

সেই যাদবাচার্যের শিষ্য শ্রীমাধবাচার্য্য * তাঁহার শিষ্যানুশিষ্য ক্রমে আমাদিগের সম্প্রদায় সিদ্ধ প্রণালী ইতি।"

পূজ্যপাদ ভাগবতরত্ন মহাশয় দেখাইয়াছেন যে,—"মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য শ্রীনিত্যানন্দ" প্রকৃত কথা তাহা নহে। মাধবেন্দ্র নিত্যানন্দের গুরুভ্রাতা, তাহা আমরা এই প্রবন্ধের প্রথমেই দেখাইয়াছি।

মাধবেন্দ্রপুরী অনুরাগে শ্রীকৃষ্ণ ভজন করিতেন। সুতরাং কোন বিধি নিষেধের ধার ধারিতেন না। তিনি বলিয়াছেন,—

সন্ধ্যাবন্দন ভদ্রমস্তু ভবতে ভো স্নান তুভ্যং নমো,
হে দেবাঃ পিতরশ্চ তর্পণবিধৌ নাহং ক্ষমঃ ক্ষম্যতাম্।
যত্র ক্বাপি নিষদ্য যাদব কুলোত্তংসস্য কংসদ্বিষঃ,
স্মারংস্মারমঘং হরামি তদলম্ মন্যে কিমন্যেন মে।—পদ্যাবল্যাম্।

সন্ধ্যাবন্দনা! তুমি কুশলে থাক, ত্রিসন্ধ্যাস্নান! তোমাকে নমস্কার, পিতৃগণ! আমি তর্পণাদিতে অক্ষম আমাকে ক্ষমা করুন। আমি যে কোন স্থানে বসিয়া যদুকুলোত্তম কংস-রিপু শ্রীহরির নাম স্মরণ করিয়া সমস্ত ঋণ ভার হইতে অনায়াসে মুক্ত হইব; অমার অন্য অনুষ্ঠানের আবশ্যক কি?

বাস্তবিকই অনুরাগী ভক্তের আর লৌকিক বিধির আবশ্যক কি? শ্রীগৌরপ্রেমের জ্বলন্ত মাধুরী,—যাঁহার হৃদয় মন্দিরে অনুক্ষণ জাগরিত রহিয়াছে তিনি নিত্যমুক্ত। আমরা—অনুরাগী ভক্তের একটী পদ এখানে দিতেছি।—

"দণ্ডে দণ্ডে তিলে তিলে,　　গৌরাচাঁদ না দেখিলে,
মরমে মরিয়া যেন থাকি।
সাধ হয় নিরন্তর　　হেম কান্তি কলেবর,
হিয়ার মাঝারে সদা রাখি॥
পলকে না হেরি তায়,　　পাঁজর ধসিয়া যায়।
ধৈরজ ধরিতে নাহি পারি।

* যাদবাচার্য্যের খুল্লতাত পুত্র।

অনুরাগের তুলি দিয়ে, অন্তর বাহির হিয়ে।
না জানি তার কত ধার ধারি ॥
সুরধুনী নীরে গিয়ে, কুল দিব ভাসাইয়ে।
অনল জ্বালিয়া দিব লাজে।
গৌরাঙ্গ সম্মুখে করি, দেখিব নয়ন ভরি।
বাঁসু নাহি চায় আন কাজে।"

'দণ্ডে দণ্ডে তিলে তিলে' প্রাণনাথের চাঁদ মুখ না দেখিয়া যিনি মরমে মরিয়া যান, তাঁহার ভাগ্যের সীমা দেখি না। আমাদের শ্রীমাধবেন্দ্রও এইরূপ একজন উৎকৃষ্ট ভক্ত ছিলেন। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি মেঘ-দর্শনে তাঁহার শ্রীকৃষ্ণকে মনে পড়িত এবং প্রেমে অচেতন হইতেন। মাধবেন্দ্রের কথা হইলে প্রভু আনন্দে গদ গদ হইয়া বাহ্য হারাইতেন তিনি অর্থাৎ শ্রীগৌরাঙ্গ যখন শ্রীবৃন্দাবনে যান তখন কৃষ্ণদাস নামক একজন বিপ্র তাঁহার চরণ কমলে প্রণত হইয়া প্রেমানন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার এই অপূর্ব্ব প্রেমযোগ দর্শন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি এত কোথায় পাইলে?" ব্রাহ্মণ বলিলেন শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরী তীর্থভ্রমণের পথে মথুরায় আমার বাটীতে ভিক্ষা গ্রহণ করিয়া আমাকে শিষ্য করেন। আর তদবধি আমি ধন্য হইয়াছি।" দেখুন প্রেমিকের কি বিচিত্র ভাব—কি সম্মোহিনী শক্তি। তখন দুইজনে বাহুতে বাহু বাঁধিয়া আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন।

ক্রমশঃ

শ্রীভোলানাথ ঘোষবর্ম্মা।

শ্রীশ্রীনরহরি সরকার ঠাকুর

(২)

"কি লাগি ধূলায় ধূসর সোণার বরণ শ্রীগৌর দেহ।
অঙ্গের ভূষণ সকল তেজিল, জানি কাহার লেহ ॥
হরি হরি মলিন গৌরাঙ্গ চান্দে। ধ্রু।
উহু উহু করি, ফুকরি ফুকরি, উরেপানি হানি কান্দে ॥

তিতিয়া গেয়ল সব কলেবর, ছাড়ে দীঘ নিশ্বাস।
রাইয়ের পীরিতি, যেন হেম রীতি, কহে নরহরি দাস॥"

"শ্রীগৌরাঙ্গ বুকে কর হানিতেছেন, উহু উহু মলেম মলেম বলিতেছেন, দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িতেছেন, আর নয়ন জলে সমুদয় অঙ্গ ভিজিয়া যাইতেছে।

'নরহরি ভাবিতেছেন, কাহার জন্য এবং কেন প্রভু কাঁদিতেছেন? ঠিক যেন শ্রীমতী রাধা যেরূপ শ্রীকৃষ্ণকে লোভ করিয়া দুঃখ পাইয়াছিলেন, সেই রূপ। এযে রাধার প্রেম, ইহা নরহরি কিরূপে বুঝিলেন—তাহা বলিতেছি। শ্রীগৌরাঙ্গ দুই একটি কথা বলিতেছেন, তাহাতে তাঁহার মনের ভাব কিছু প্রকাশ পাইতেছে। শ্রীগৌরাঙ্গ কৃষ্ণ বলিয়া ভূমিতে পড়িতেছেন ও উঠিয়ে৷ ঊর্দ্ধমুখে চাহিয়া দুই হাত তুলিয়া বলিতেছেন, 'কৃষ্ণ! আমি স্বচ্ছন্দে ঘরে ছিলাম, আমাকে বাউরী (পাগলিনী) কে করিল! হে কৃষ্ণ তুমি আমাকে পাগল করিলে?' আবার বলিতেছেন 'কৃষ্ণের দোষ কি? বিধি এ সব তোর কার্য্য। বিধি! এরূপ ঘটনা কেন করিলি? বিধি! ধিক্ তোরে! আমি দুর্ব্বলা, কুলের মাঝারে থাকি, আমি কৃষ্ণকে কিরূপে পাব? তিনি দুর্লভ আমি অবলা নারী, আমাকে কৃষ্ণের লোভ কেন দিলি?' এই রূপে বিধাতার উপর দোষ দিতেছেন। নরহরি সঙ্গীগণের কানে কানে জিজ্ঞাসা করিতেছেন 'প্রভুর কি ভাব, তোমরা কিছু বুঝতে পারিতেছ?"

"কনক চম্পক গোরা চাঁদে। ভূমিতে পড়িয়া কেন কান্দে।
ক্ষেণে উঠি কহে হরি হরি। কে করিল আমারে বাউরি?'
আজানুলম্বিত বাহুতুলি। বিধিরে পাড়য়ে সদা গালি॥
কহে ধিক্ বিধির বিধানে। এমন যোটান করে কেনে॥'
কোন ভাবে কহে গোরা রায়। নরহরি সুধিয়া বেড়ায়॥"

শ্রীনরহরি তাঁহার প্রিয়তমের চরণে আপনার বলিতে যা কিছু ছিল আজ প্রেমের উন্মাদনায় সমস্তই দান করিয়া দিশাহারা হইয়া বলিতেছেন,—

"গৌরাঙ্গ চাঁদের রূপের পাথারে সাঁতারে না পাইথা॥
দীঘল দীঘল, নয়ন যুগল, বিষম কুসুম শরে।
রমণী কেমনে, ধৈরজ ধরিবে, মদন কাঁপয়ে ডরে॥
কহে নরহরি, গৌরাঙ্গ মাধুরী যাহার অন্তরে জাগে।
কুলশীল তার সকলি মজিল, গোরাচাঁদের অনুরাগে॥

শ্রীনরহরির একান্ত সাধ ছিল যে সমগ্র গৌরাঙ্গলীলা বাঙ্গালা ভাষায় রচিত হয়। তাই তিনি তাহার সুমধুর পদাবলী দ্বারা শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীগৌরাঙ্গলীলা বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন—

কিছু কিছু পদ লেখি, যদি ইহা কেহ দেখি, প্রকাশ করয় প্রভু-লীলা।
নরহরি পাবে সুখ, ঘুচিবে মনের দুঃখ, গ্রন্থগানে দরবিবে শিলা॥

কিন্তু তিনি বুঝিয়াছিলেন তাঁহার মনোমত গ্রন্থ রচিত হইতে এখনও বহু বিলম্ব আছে তাই পুনরায় বলিলেন—

গ্রন্থ লিখিবে যে, এখনও জন্মে নাই সে, জন্মিতে বিলম্ব আছে বহু।
ভাষায় রচনা হৈলে, বুঝিবে লোক সকলে, কবে বাঞ্ছা পুরাবেন পহুঁ॥

শ্রীল শিশির বাবু বলিতেছেন—শ্রীখণ্ডের গোস্বামিগণ জাতিতে বৈদ্য, তবু তাঁহাদের পদ অতি বড়। নরহরির গৌরপ্রেম, খণ্ডবাসীগণের সকল সম্পত্তির কারণ। নরহরি হইতেই আমরা শ্রীগৌরাঙ্গের পূর্ব্বরাগের পদ পাইয়াছি। নরহরি হইতে ত্রিলোচন দাসকে ও লোচনের চৈতন্য মঙ্গল পাইয়াছি। তাহা হইতেই শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু ও ঠাকুর মহাশয়। নরহরির বড় দুঃখ এই যে সাধারণ লোকে প্রভুকে চিনিল না। তাঁহার মনের সাধ এই যে, প্রভুর লীলা বাঙ্গালায় লেখা হয়, এবং আপামর সাধারণ সকলে উহা পড়িয়া উদ্ধার হয়। তাঁহার এই আকিঞ্চনে চৈতন্য ভাগবত ও চৈতন্য মঙ্গল সৃষ্ট হয়। কিন্তু দুই গ্রন্থে নরহরির সাধ মিটে নাই। তিনি ভবিষ্যৎবাণী রাখিয়া গিয়াছেন।

"প্রভুর লীলা লিখিবে যে,
বহুপরে জন্মিবে সে।"

অতএব সে কথা অনুসারে প্রভুর লীলা পরে লেখা হইবে। আমরা কেবল সেই লীলারূপ অট্টালিকার ইষ্টক সংগ্রহ করিয়া গেলাম। শ্রীনরহরি জয়যুক্ত হউন, তাহা হইতে সাধারণ লোকে শ্রীগৌরাঙ্গ জানিয়াছে।"

শ্রীল শিশির বাবু তাঁহার স্বাভাবিক বিনয়-গুণে স্বীয় কৃতকার্য্যতা স্বীকার করিলেন না বটে কিন্তু আমরা বুঝিতেছি সরকার ঠাকুরের আকাঙ্ক্ষা তিনিই পূর্ণ করিয়াছেন। শ্রীঅমিয় নিমাই চরিত-রূপ সুরম্য হর্ম্ম তাঁহার দ্বারাই রচিত হইয়াছে, তিনি কেবল ইষ্টক সংগ্রহ করিয়াই যান নাই। আমাদের ঘরের ঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দর সম্বন্ধে আমাদের যাহা কিছু অজ্ঞতা তাহা অমিয়-ভাণ্ডার

স্বরূপ অমিয় গ্রন্থরাজী হইতেই আরব্ধ হইয়াছে ইহা আজ আমরা অকপট ভাবে স্বীকার করিতে পাইয়া অতীব আনন্দলাভ করিতেছি।

আমরা গভীর পরিতাপের সহিত লিখিতে বাধ্য হইতেছি যে, এ হেন সরকার ঠাকুরের কোন প্রসঙ্গ, এমন কি নাম পর্য্যন্তও শ্রীলবৃন্দাবন দাসের শ্রীচৈতন্য ভাগবত গ্রন্থে লিখিত হয় নাই। প্রবাদ এইরূপ যে তিনি শুনিয়াছিলেন শ্রীসরকার ঠাকুর তাঁহার কাষ্ঠপাদুকা কোন বৈষ্ণবের দ্বারা বহন করাইয়াছেন। এইরূপ ঘটনা শ্রবণ করিয়া বৃন্দাবন দাস অত্যন্ত বিরক্ত হন। এমন কি সরকার ঠাকুর শ্রীচৈতন্য ভাগবত গ্রন্থ দেখিতে চাহিলে তিনি ঘৃণা করিয়া তাহা দেখিতেও দেন নাই। তবে মহাপ্রভুর পরিকর বর্ণনে পাছে প্রধান ভক্ত নরহরির নাম উল্লেখ না করিলে তাঁহার গ্রন্থ অসম্পূর্ণ হয় এই ভয়ে প্রকারান্তরে তাঁহার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। যথা ;—

"কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়।
কোন কোন ভাগ্যবানে চামর ঢুলায়॥"

পরম বৈষ্ণব সরকার ঠাকুর তাঁহার কাষ্ঠ পাদুকা কোন ভক্ত দ্বারা বহন করাইয়াছিলেন ইহা আমাদের বিশ্বাস হয় না। কোন বৈষ্ণব তাঁহার প্রতি ভক্তি প্রদর্শনার্থ তাঁহার অজ্ঞাতসারে স্বেচ্ছায় ঐ কার্য্য করিয়া থাকিবেন।

শ্রীবৃন্দাবন দাসের এই বিদ্বেষ ভাব বহুদিন পরে অন্তর্হিত হইয়াছিল। ইনি ইঁহার গ্রন্থে পূর্ব্বে লিখিয়াছিলেন যে এ অবতারে "শ্রীগৌরাঙ্গ নাগর" বলিয়া আর কেহ ভজনা করিবে না। কিন্তু তিনি নিজকে সামলাইতে পারেন নাই। স্রোতে পড়িয়া গিয়াছিলেন। তিনি একটী পদে প্রভুকে কেমন ধৃষ্টনাগর সাজাইয়াছেন। তাহা শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়ার মুখে বৃন্দাবন দাসের ভাষায় শ্রবণ করুন ;—

"অলসে অরুণ আঁখি, কহ গৌরাঙ্গ একি দেখি, রজনী বঞ্চিলে কোন স্থানে।
তোমার বদন সরসীরুহ মলিন যে হইয়াছে, সারা নিশি করি জাগরণে॥

তুয়াসঙ্গে কিসের পীরিতি।
এমন সোণার দেহ, পরশ করিল কেহ, না জানি সে কেমন রসবতী॥
নদীয়া নাগরী সনে, রসিক হৈয়াছ ও হে, অবহি পার ছাড়িবে।
সুরধুনী তীরে গিয়া, মার্জ্জন করহ হিয়া, তবে সে আসিতে দিব ঘরে॥
গৌরাঙ্গ করুণ ভাবী, কহে মৃদু মৃদু হাসি, কাহে প্রিয়ে কহ কটুভাষ।
রি নামে জাগি নিশি, অমিঞা সাগরে ভাসি, শুন গায় বৃন্দাবন দাস॥

শ্রীনরহরির প্রদর্শিত পথে নাগরিভাবে ভজনা করিতে গিয়া তিনি সরকার ঠাকুরের প্রতি তাঁহার বিদ্বেষ ভাব ভুলিলেন। ইতি পূর্ব্বে তিনি বহু সুমধুর পদ রচনা করিয়াছিলেন, তাহাতে সরকার ঠাকুরের নামোল্লেখ পর্য্যন্ত করেন নাই, কিন্তু আজ মনের সাধে লিখিলেন ;—

বিনোদ বন্ধনে, নাচে শচীনন্দনে, চৌদিকে রূপ পরকাশ।
বামে রহ পণ্ডিত, প্রিয়গদাধর, দক্ষিণে নরহরি দাস॥
গৌরাঙ্গ অঙ্গেতে, কনয়া কদম্বজনু, ঐছন পুলকের আভা॥
আনন্দে বিভোল, ঠাকুর নিত্যানন্দ, দেখিয়া গৌরাঙ্গের শোভা।
যাহার অনুভব, সেই সে সমুঝই, কহনে না যার পরকাশ।
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য ঠাকুর শ্রীনিত্যানন্দ, শুন গায় বৃন্দাবন দাস॥

মহাপ্রভু যখন সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া নীলাচলে গমন করেন তখন তাঁহার সহিত নিত্যানন্দ, জগদানন্দ, মুকুন্দ, দামোদর ও গোবিন্দ এই পাঁচ জন ছিলেন। অতি প্রিয় যে গদাধর, তাঁহাকেও সঙ্গে লন নাই, কারণ গদাধর অতি সুকুমার ও নবীন, তিনি কখনও সংসারিক দুঃখ ভোগ করেন নাই। গদাধর কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গকে না দেখিলে প্রাণে মরেন। কিছুদিন বাদে বিরহ জ্বালা আর সহ্য করিতে না পারিয়া নীলাচলাভিমুখে ছুটিলেন। শ্রীনরহরির অবস্থাও তদ্রূপ, তিনি গদাধরের সহিত এক প্রাণ একমন। গোরাচাঁদের শ্রীমুখ একতিল না দেখিলে তিনি মরেন গৌর শূন্য নদীয়া ভূমি তাঁহার নিকট বিষবৎ প্রতীয়মান হইতেছে। সুতরাং তিনিও গদাধরের সঙ্গ লইলেন। এ প্রেমে যে ঈর্ষাভাব থাকিতে পারে না, তাই দুই বন্ধু কেমন মনের আনন্দে একত্রে মিলিয়া প্রাণনাথের উদ্দেশে যাত্রা করিলেন।

নরহরিকে পরে কিন্তু গৃহে ফিরিয়া আসিতে হইয়াছিল। শ্রীগৌরাঙ্গের ইহ ইচ্ছা ছিলনা যে ভক্তগণ সকলেই দেশ ছাড়িয়া তাঁহার নিকট অবস্থান করেন তাঁহারা গৃহে থাকিয়া দিকে দিকে প্রেম প্রচার করুন, ইহাই যে তাঁহার কামনা শ্রীনরহরি ইহাতে যে কত ব্যাকুল হইয়াছিলেন তাহা আমরা বেশ অনুমান করিয়া লইতে পারি। তবে প্রতিবর্ষে তিনি ভক্তগণের সহিত মিলিত হইয়া তাঁহার শ্রীখণ্ডবাসীগণকে সমভিব্যাহারে লইয়া, মহাপ্রভুকে দর্শন করিতে গমন করিতেন। আর সেই সময় প্রভু কতনা আনন্দে প্রিয় ভক্তগণের সহিত মিলিত হইয়া নৃত্য করিতেন, সেই উদ্দণ্ড নৃত্য—বেড়া কীর্ত্তন প্রভৃতির মধ্যে আমরা আমাদের প্রিয় নরহরিকে দেখিতে পাই।

"খণ্ডের সম্প্রদায় করে অন্যত্র কীর্ত্তন।
নরহরি নাচে তাঁহা শ্রীরঘুনন্দন॥ চৈঃ চঃ।

শ্রীগৌর-মণ্ডল ভূমিতে তিনি একজন অতীব শক্তিশালী বৈষ্ণবরূপে বাস করিতেন। শ্রীনিবাস আচার্য্যপ্রভু ও শ্রীনরোত্তম দাস ঠাকুর মহাশয় প্রতি কার্য্যে তাঁহার মত লইতেন। বিশেষতঃ আচার্য্য প্রভু তাঁহার নিকট প্রায়ই আগমন করিতেন।

শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর মাতামহের বাড়ী ছিল যাজিগ্রামে। উহা শ্রীখণ্ড হইতে বেশী দূর ছিলনা। আচার্য্য প্রভুর সহিত সরকার ঠাকুরের প্রথম মিলনের কথা ভক্তি-রত্নাকর হইতে শ্রবণ করুন। "একদা—ঠাকুর নরহরি গোষ্ঠীর সহিতে। গঙ্গাস্নানে আইসেন যাজি গ্রামপথে॥ তথা শ্রীনিবাসে দেখি যে আনন্দ মনে। তাহা একমুখে বা বর্ণিবে কোন জনে॥ শ্রীনিবাস সরকার ঠাকুর দেখিয়া। হইলা অধৈর্য্য সুখে উথলয়ে হিয়া॥ অতি দীন প্রায় হৈয়া প্রণাম করিতে। ঠাকুর করিলা কোলে বিহ্বল স্নেহেতে॥ শ্রীনিবাস প্রতি কহে মধুর বচন। তোমারে দেখিয়া জুড়াইল নেত্রমন॥ বড়সাধ ছিল বাপু তোমারে দেখিতে। এত কহি পদ্মহস্ত বুলায় অঙ্গেতে॥ শ্রীনিবাস কর যোড় করি নিবেদয়। এই করো যেন মনোরথ পূর্ণ হয়॥ মুঞি অতি অজ্ঞ কিছু কহিতে না জানি। সর্ব্ব প্রকারেতে রক্ষা করিবা আপনি॥ ঐছে কত কহি নেত্রে ধারা নিরন্তর। ঠাকুর প্রবোধি আজ্ঞা কৈল যাহ ঘর॥"

শ্রীনিবাস নীলাচলে গিয়া প্রভুর দর্শন পান নাই। যেহেতু প্রভু তখন অদর্শন হইয়াছেন। গদাধর গোস্বামী প্রভুর জন্য কত বিলাপ করিলেন, এবং তাহার মিতা দাস গদাধর ও নরহরি সরকারের সহিত বহুদিন দেখা হয় নাই, তজ্জন্য প্রাণ উথাড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন। শ্রীনিবাস আর কি করিবেন, কয়েক দিবস বাদে বড় দুঃখে ফিরিয়া আসিলেন। পথে ভাবিতে ভাবিতে আসিতেছেন,—"পুনঃ কি পাইব শ্রীগোসাঞির দর্শন॥ ঐছে বহু আশঙ্কা সে চরণ ভাবিয়া। নির্ব্বিঘ্নে আইলা খণ্ডে ব্যাকুল হইয়া॥ শ্রীনিবাসে দেখিয়া ঠাকুর নরহরি। করিলা ক্রন্দন শ্রীনিবাস গলা ধরি॥ শ্রীনিবাসে যত্নে জিজ্ঞাসেন সমাচার। শ্রীনিবাস কহে নেত্রে বহে অশ্রুধার॥ প্রভুর বিয়োগ যৈছে প্রভু পরিচয়। বিস্তারি কহিতে নারে ব্যাকুল অন্তর॥ পণ্ডিত গোসাঞির কথা কহিতে কহিতে। মুর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন পৃথিবীতে॥ শ্রীনিবাস দশা দেখি

প্রভু নরহরি। অনেক যতনে স্থির কৈলা বক্ষে ধরি॥ শ্রীরঘুনন্দন আদি যত প্রভু-গণ। শ্রীনিবাসে দেখি স্থির নহে কোন জন॥ যে প্রকার হৈল, তাহা কহিতে না পারি। সবে স্থির কৈল শ্রীঠাকুর নরহরি॥"

শ্রীনিবাস বৃন্দাবন ধাম দর্শন করিতে যাইবার মানস করিয়াছেন, সুতরাং ঠাকুরের নিকট বিদায় লইতে আসিলেন,—"শ্রীঠাকুর নরহরি শ্রীরঘুনন্দন। শ্রীনিবাস দেখি কৈল গাঢ় আলিঙ্গন॥ পুছিলেন সকল বৃত্তান্ত ধীরে ধীরে। নিবেদিল শ্রীনিবাস ভাসি নেত্র নীরে॥ ঠাকুর শ্রীনরহরি শ্রীরঘুনন্দন। অনুমতি দিলেন যাইতে বৃন্দাবন॥ শ্রীনিবাসে ঠাকুর লইয়া পুনঃ কোলে। ছাড়িতে না পারিয়ে ভাসয়ে নেত্রজলে॥ পথের সন্ধান সব দিলেন কহিয়া। বিদায়ের কালেতে বিদীর্ণ হৈল হিয়া॥ শ্রীঠাকুর নরহরি শ্রীরঘুনন্দনে। দোঁহে প্রণমিয়া যাত্রা কৈল শুভক্ষণে॥"

প্রভুর অদর্শনের পর, ভক্তগণও একে একে তিরোহিত হইতেছেন। এখন ঠাকুরের অতি দুঃখে মৃতবৎ অবস্থায় দিন কাটিতেছে,—"মৃতপ্রায় আছেন ঠাকুর নরহরি॥ দিবারাত্রি মূর্চ্ছাপন্ন লোটায় ভূতলে। করয়ে প্রলাপ সদা ভাসে নেত্র জলে॥ শ্রীরঘুনন্দন আদি যত প্রিয়গণ। নিরন্তর গোরাগুণ করয়ে কীর্ত্তন। ঠাকুরের দশা দেখি কেবা ধৈর্য্য ধরে। আনের কা কথা দারু পাষাণ বিদরে॥"

ঠাকুরের এইরূপ অবস্থা শুনিয়া শ্রীনিবাস বড়ই ব্যাকুল হইয়া দেখিতে আসিলেন। শ্রীনিবাস দেখিতে আসিয়াছেন, একথা শ্রীরঘুনন্দন প্রভু ঠাকুরের নিকট গিয়া বলিলেন। "যদ্যপি ঠাকুরের দুঃখে দগ্ধ হিয়া। তথাপি হইলা হর্ষ একথা শুনিয়া॥ শ্রীরঘুনন্দনে কহে সুমধুর ভাসে। জুড়াক নয়ন আন দেখি শ্রীনিবাসে॥" ঐ ঠাকুরের বাক্য শুনিয়া শ্রীরঘুনন্দন বড়ই আনন্দিত হইলেন। অগ্রবর্ত্তী হইয়া, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রাঙ্গণ হইতে, শ্রীনিবাসকে বুকে করিয়া লইয়া আসিলেন। যথা,—"শুনি ঠাকুরের বাক্য উল্লসিত মনে। শ্রীনিবাসে মিলে গিয়া প্রভুর প্রাঙ্গণে॥ শ্রীরঘুনন্দন অতিগুণের নিধান। শ্রীনিবাসে পাইয়া পাইলা যেন প্রাণ॥ শ্রীনিবাস শ্রীরঘুনন্দনে প্রণমিতে। আলিঙ্গন করি না ছাড়য়ে কোল হৈতে॥ কিবা সে অদ্ভুত স্নেহে উপজয়ে হিয়া। নিবারিতে নারে নেত্র-ধারা আলিঙ্গিয়া॥ শ্রীনিবাস ভাসে দুই নয়নের জলে। দীন প্রায় রহে রঘুনন্দনের কোলে॥ শ্রীরঘুনন্দন নেত্র জলে সিক্ত করি। লৈয়া গেল যথা শ্রীঠাকুর নরহরি॥ বসিয়া আছেন তেঁহো পরম নির্ব্বাণে। শ্রীনিবাস অধৈর্য্য হইলা

সে দর্শনে॥ আহামরি সেনা রূপে পরাণ জুড়ায়। কনক চম্পক কি উপমা হয় তায়॥ সে হেন অপূর্ব্বরূপ হইল মলিন। অতি সুকোমল তনু ক্ষণে ক্ষণে ক্ষীণ॥ মুখের মাধুরী—সে চান্দের শোভা যৈছে। জল বিনা জলজ যেমন এবে তৈছে॥ যে নয়ন যুগলে আনন্দ বরিষয়। সে নয়নে সদা অশ্রুধারা অতিশয়॥ হেন নরহরি প্রভু পানে চায়া চায়া। প্রণময়ে ভূমে ভক্তিরসে মত্ত হৈয়া॥ শ্রীঠাকুর নরহরি দেখি স্নেহাবেশে। আইস বাপ বুলি কোলে কৈল শ্রীনিবাসে॥ পরম বাৎসল্যে হস্ত বুলায়েন গায়। দেখি সে অদ্ভুত রীত কেনা সুখ পায়॥ অতি সুমধুর বাক্যে জিজ্ঞাসয়ে যাহা। শ্রীনিবাস ক্রমে ক্রমে নিবেদয়ে তাহা॥ আদ্যোপান্ত সকল বৃত্তান্ত নিবেদিল। নরোত্তম ক্ষেত্রে গেলা তাহা জানাইল॥ শুনি এ সকল মনে উপজিল যাহা। আনের শকতি কি কহিতে পারে তাহা॥ পুনঃ শ্রীনিবাসে কহে সস্নেহ বচনে। নরোত্তম দেখি শীঘ্র সাধ বড় মনে॥ বুঝি নরোত্তম এথা আসিব ত্বরায়। বহু কার্য্য সিদ্ধি হবে তাহার দ্বারায়॥ তার সহ তুমি সঙ্কীর্ত্তনে মত্ত হবা। দারুণ বিচ্ছেদ জ্বালা হৈতে জুড়াইবা॥ চিরায়ু হইয়া কর ভক্তি উপার্জ্জন। ভক্তি-গ্রন্থ সর্ব্বত্র করহ বিতরণ॥ হইব স্বতন্ত্র লোক ছাড়িয়া স্বধর্ম্ম। না বুঝিব গুরু কৃষ্ণ বৈষ্ণবের মর্ম্ম॥ এ সব পাষণ্ড উদ্ধারিবা ভক্তি বলে। গাইব তোমার যশ বৈষ্ণব সকলে॥ তুমি কৃষ্ণ-চৈতন্যচন্দ্রের নিত্যদাস। প্রভু পূর্ণ করিব তোমার অভিলাষ॥ তোমার জননী যেঁই পরম বৈষ্ণবী। কথোদিন রহ যাজি গ্রামে তাঁরে সেবি॥ তাঁর মনোবৃত্তি যাহা করিতেই হয়। ইথে কিছু তোমার নহিব অপচয়॥ বিবাহ করহ বাপ এই মোর মনে। এত কহি কহে পুনঃ শ্রীরঘু-নন্দনে॥ বিবাহ করিতে কহি কৈছে মনে লয়। শুনি কহে মো সবার মনে এই হয়॥ ঠাকুর কহয়ে ইথে না করহ লাজ। শুনি শ্রীনিবাস পাইলেন বড় লাজ॥ শ্রীঠাকুর নরহরি সর্ব্বতত্ত্ব জানে। ঘুচাইলা লজ্জাদি কহিয়া কত তানে॥"

ইহার পর কিছুদিন অতীত হইয়াছে। শ্রীগৌর-মণ্ডল ভূমিতে, শ্রীগৌর ভক্তগণ, শ্রীগৌর শশীর বিরহে, একে একে অন্তর্হিত হইতেছেন। নবদ্বীপের শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী বুড়া হইয়াছিলেন, তিনি দেহ রক্ষা করিলেন। তাহার পর দাস গদাধরের পালা। তিনিও দেহ ত্যাগ করিয়া গেলেন। সরকার ঠাকুর এতদিন অতিকষ্টে জীবন ধারণ করিতেছিলেন, কিন্তু আর পারিলেন না। যথা—শ্রীরঘুনন্দন শ্রীনিবাসকে বলিতেছেন,—"কার্ত্তিকে শ্রীগদাধর দাস সঙ্গোপনে।

প্রভু নরহরি শীর্ণ হইলা ক্ষণে ক্ষণে ॥ কে বুঝিতে পারে তাঁর অন্তরের ব্যথা। সে দিবস হৈতে কারু সনে নাই কথা ॥ নিরন্তর সিক্ত দুই নেত্রের ধারাতে। তাহা কি বলিব তুমি দেখিলা সাক্ষাতে ॥ মার্গশীর্ষ মাসে কৃষ্ণা একাদশী দিনে। অকস্মাৎ অদর্শন হৈলা এই খানে ॥" [৯ তরঙ্গ] অন্যত্র,—"দিনে দিনে অবনী হইছে অন্ধকার ॥ প্রভু নরহরি প্রিয়গণের সহিতে। ছাড়িয়া গেলেন মোরে দুঃখ ভুঞ্জাইতে ॥ কি সুখ পাইয়ে দেহে আছয়ে জীবন। ঐছে কত কহি কান্দে শ্রীরঘুনন্দন ॥ প্রভু নরহরির করুণা সোঙরিয়া। কান্দে শ্রীনিবাস ভূমিতলে লোটাইয়া ॥ কে ধরে ধৈরজ এ দোঁহার কান্দনাতে। উঠিল ক্রন্দন রোল শ্রীখণ্ড গ্রামেতে ॥ সে কান্দনে কান্দয়ে বনের পশুপাখী। যে দেখিল সে সময়ে সেই তার সাক্ষী ॥"

অনেকক্ষণ রোদনের পর উভয়ের হৃদয় ভার অনেকটা লঘু হইয়া আসিল। তখন দুইজনে স্থির হইয়া ঠাকুরের তিরোধান তিথির আরাধনা করিবার পরামর্শ স্থির করিতে বসিলেন। প্রভু রঘুনন্দন, এজন্য বহু সামগ্রী ভাণ্ডারে সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি সরকার ঠাকুরের পূর্ব্বে দাস গদাধর দেহ রক্ষা করিয়াছেন। কণ্টকনগর (কাটোয়ায়) তাঁহার জন্য মহা মহোৎসবের আয়োজন হইয়াছে, ভক্তগণ যথা কালে, সেই উৎসব-কার্য্য সমাধা করিয়া, শ্রীরঘুনন্দনের আহ্বানে, খণ্ড গ্রামে আসিয়া উপনীত হইলেন।

এই অতুল ও দুর্লভ সঙ্কীর্ত্তন বর্ণনা করিবার সাধ্য আমাদের নাই। চারিদিক হইতে নিয়ত কত লোক আসিয়া সমবেত হইতেছে, কে তাহা নির্ণয় করিবে? একাদশীর দিন হইতেই প্রধানত উৎসব আরম্ভ হইয়াছিল। সেই দিন প্রাতঃকালে শ্রীরঘুনন্দন আসিয়া প্রভু-পরিকরগণের নিকট আত্মনিবেদন করিলেন, এবং গৌরাঙ্গ-প্রাঙ্গণে গমন করিয়া অশেষ বিশেষে তাহার সজ্জা করিতে লাগিলেন। তখনকার সেই প্রাঙ্গণের শোভা দেখিয়া সকলেরই চক্ষু জুড়াইল।

তখন শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুর বড়ই স্নেহ করিয়া শ্রীনিবাসকে তাঁহাদের সম্মুখে লইয়া দাঁড়াইলেন। আর মহান্তগণও তাঁহাকে বড়ই স্নেহ করিতেন,—আচার্য্যের মুখে শ্রীমদ্ভাগবত কথামৃত শুনিতে চাহিলেন। আচার্য্য ইহাতে অবশ্য অত্যন্ত কুণ্ঠিত হইলেন। কিন্তু ভক্তগণের আজ্ঞা লঙ্ঘন করিবার শক্তি তাঁহার কই? তিনি সেই নির্দ্দিষ্ট আসনে বসিয়া, অতি সুললিত কণ্ঠে, নিপুনতার সহিত, শ্রী গ্রন্থ পাঠ করিয়া শুনাইলেন। আর সেই নিখিল-জন-চিত্তাকর্ষী অপূর্ব্ব পাঠ শ্রবণ করিয়া সকলেই মহামোহিত হইয়া গেলেন।

এই দিনের সঙ্কীর্ত্তনে, অন্যান্য মহান্তের ন্যায়, শ্রীবীরভদ্র প্রভুও নৃত্য করিয়াছিলেন এবং তাঁহার কৃপায় এক অন্ধ চক্ষু দান পাইয়াছিল। শ্রীযদুনন্দন ও শ্রীলোচন, পুষ্প মাল্য ও সুগন্ধি চন্দন লইয়া, ভাগবতগণকে পরাইয়াছিলেন। তাহার পর সেই মধুর কীর্ত্তনের কথা—তাহা বর্ণনা করিতে আমি সম্পূর্ণ অক্ষম। ভক্তিরত্নাকর বলেন; সেই অদ্ভুত কীর্ত্তনে, দেবতাগণ পর্য্যন্ত আসিয়া যোগদান করিয়াছিলেন এবং সপরিকরে প্রভু, তাঁহাদের আকুল আহ্বানে স্থির থাকিতে পারেন নাই। এইরূপে সেই সুখের নিশি অতিবাহিত হইল। তখন শ্রীরঘুনন্দন বিনীত ভাবে,সেই সমবেত ভক্তবৃন্দকে, অদ্যকার (দ্বাদশীর) পারণ সম্বন্ধে আজ্ঞা জানিতে চাহিলেন। ইহাতে ভক্তগণ কহিলেন যে তাঁহারা একত্রে বসিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের প্রসাদ সেবন করিবেন। শ্রীরঘুনন্দনও সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর ভাবে ভোগের আয়োজন করিয়া, ভক্তগণকে প্রসাদ ভুঞ্জাইলেন।

ভক্তগণ প্রসাদ খাইতেছেন আর আনন্দে হরি হরি ধ্বনি করিতেছেন। শ্রীরঘুনন্দন কিয়ৎক্ষণ সুখে দাঁড়াইয়া সে দৃশ্য দেখিলেন। পরে ভোগ মন্দিরে গিয়া পৃথক একখানি ভোগ লইলেন। শ্রীঠাকুর নির্জ্জনে যে আসনে বসিতেন, তথায় ভোগ রাখিয়া অতি দীন ভাবে ধ্যান করিতে লাগিলেন। ধ্যানান্তে দ্বার রুদ্ধ করিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে আচমন দিবার সময় হইয়াছে জানিয়া, "দ্বার ঘুচাইয়া দেখে প্রভু নরহরি। আসনে বসিয়া আছে দিব্যরূপ ধরি।" এই দৃশ্য দেখিয়া রঘুনন্দন আত্মবিস্মৃত হইতেই ঠাকুর অন্তর্হিত হইলেন। রঘুনন্দন অতি দুঃখে কান্দিতে কান্দিতে ভূমিতে পড়িয়া, আসনের নিকট প্রণাম করিলেন। পরে আচমন দিয়া ভক্তগণের নিকট ফিরিয়া গেলেন; দেখেন তাঁহারা খাদ্য সামগ্রীর প্রশংসা করিতেছেন আর চাহিয়া চাহিয়া খাইতেছেন। তাঁহারা রঘুনন্দনকে বলিলেন আপনি শ্রীনিবাস প্রভৃতিকে লইয়া ভোজনে বসুন। স্থানে স্থানে কত লোক বসিয়া ভোজন করিতেছেন। সকলেই বলিতেছেন এমন উৎসব আমরা কখনও দেখি নাই। এই যে মহামহোৎসব হইল ইহা সকলেই আপন আপন দেশে থাকিয়া শুনিয়াছিলেন।

পর দিবস শ্রীপতি শ্রীনিধি প্রভৃতি ভক্তগণ সকলে যাইতে চাহিলেন কিন্তু শ্রীরঘুনন্দনের বিশেষ অনুরোধে তাঁহারা সেই দিবস যাইতে পারিলেন না। বিপ্র বাণীনাথ বলিলেন কল্য প্রাতে কিন্তু আমাদিগকে যাইতে দিতে হইবে। "শুনি শ্রীরঘুনন্দন হাসিয়া মন্দ মন্দ। কহে কালি যে হইবে ইথে কি নির্ব্বন্ধ॥

পারণেতে কৈলা কালি পূপাদি ভক্ষণ। পুন আর জলবিন্দু নহিল গ্রহণ॥ অন্ন প্রতি বাসায় রন্ধন শীঘ্র হবে। স্নানাদি করিলে শীঘ্র সুখ পাই তবে॥"

অতঃপর ভক্তগণ আরও ২।৪ দিবস শ্রীখণ্ডে অবস্থান করিয়া শ্রীরঘুনন্দনের নিকট বিদায় লইয়া দেশে গিয়াছিলেন।

"অগ্রহায়ণে কৃষ্ণা একাদশী সর্ব্বোপরি।
যাতে অদর্শন শ্রীঠাকুর নরহরি॥"

অর্থাৎ ঠাকুর নরহরি ১৪৬২ শকে (ইং ১৫৪০ খৃঃ) অগ্রহায়ণ মাসের কৃষ্ণা একাদশী তিথিতে তিরোহিত হন। শ্রীপাট শ্রীখণ্ডে শ্রীগৌর-নরহরির বিলাস-ভূমি বড়ডাঙ্গা নামক পরম রমণীয় ও প্রসিদ্ধ স্থানে প্রতিবর্ষে এই দিবস তাঁহার অদর্শন জনিত আজ মহোৎসব হইয়া থাকে।

শ্রীখণ্ডে স্থাপিত ছয় বিগ্রহের মধ্যে শ্রীগৌরাঙ্গ ও নিত্যানন্দ মূর্ত্তি তিনি স্থাপনা করেন। সংস্কৃত সাহিত্যে তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল এবং তাঁহার রচিত "ভক্তি-চন্দ্রিকা পটল", "ভজনামৃত" "নামামৃত-সমুদ্র", "ভক্তামৃত অষ্টক" প্রভৃতি গ্রন্থগুলি গৌর-ভক্তগণ অতি উপাদেয় বোধে পাঠ করিয়া থাকেন।

যিনি গৌর নাম ব্যতীত অন্য নাম মুখে আনিতে পারিতেন না—যাঁহার শ্রুতি গোরাচাঁদের গুণ গান ব্যতীত অন্য প্রসঙ্গ শুনিলে সুখ পাইত না; অদ্বৈত বিলাস গ্রন্থকার যাঁহার সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—

"জয় জয় নরহরি শ্রীখণ্ড নিবাসী। যার প্রাণ সর্ব্বস্ব শ্রীগৌর গুণরাশি॥" যাঁহার মধুমতী নামের সার্থকতার জন্য সপার্ষদ শ্রীনিত্যানন্দন প্রভু মধু পান করিতে চাহিলে যিনি সপরিকর শ্রীগৌর নিত্যানন্দকে প্রেম মধু পান করাইয়া উন্মত্ত করিয়া তুলেন—যিনি শ্রীগৌরাঙ্গের অতুলনীয় রূপের পাথারে, গা ঢালিয়া দিয়া, সখী ভাবে আলিঙ্গন সুখে মত্ত হইয়া, প্রেম-বিহ্বল কণ্ঠে গাহিতেন,— "পরশে যে সুখ তাহা কি আর কহিব, সে যে বাণী অনুভব দূর"—সেই নরহরির গৌর প্রেমের কথা আমরা কিরূপে বর্ণনা করিব। সুতরাং এই স্থানে আমরা তাঁহার সম্বন্ধে কয়েকটী বন্দনা পদ, উপাদেয় বোধে উদ্ধৃত করিয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধের উপসংহার করিতে ইচ্ছা করিতেছি।

১

ভূখণ্ড মণ্ডল মাঝে, তাহাতে শ্রীখণ্ড সাজে, মধুমতী যাহে পরকাশ।
ঠাকুর গৌরাঙ্গ সনে, বিলসয়ে রাত্র দিনে, নামধরে নরহরি দাস॥

শ্রীরাধিকা সহচরী, রূপে গুণে আগোরি, মধুর মাধুরী অনুপাম।
অবনীতে অবতরী, পুরুষ আকৃতি ধরি, পূর্ণ কৈল চৈতন্যের কাম॥
মধুমতী মধু-দানে, ভাসাইলা ত্রিভুবনে, মত্ত কৈলা গৌরাঙ্গ নাগর।
মাতিল সে নিত্যানন্দ, আর সব ভক্তবৃন্দ, বেদবিধি পড়িল ফাঁফর॥
যোগ পথ করি নাশ, ভকতির পরকাশ, করিল মুকুন্দ সহোদর।
পাপিয়া শেখর রায়, বিকাইল রাঙ্গাপায়, শ্রীরঘুনন্দন প্রাণেশ্বর॥

২

রঘুনন্দনের পিতা, মুকুন্দ যাহার ভ্রাতা, নাম তার নরহরি দাস।
রাঢ়ে বঙ্গে সুপ্রচার, পদবী সে সরকার, শ্রীখণ্ড গ্রামেতে বসবাস॥
গৌরাঙ্গ জন্মের আগে, বিবিধ রাগিনী রাগে, ব্রজরস করিলেন গান।
হেন নরহরি সঙ্গ, পাইয়া প্রভু গৌরাঙ্গ, বড় সুখে জুড়াইলা প্রাণ॥
পহুঁর দক্ষিণে থাকি, চামর ঢুলায় সখী, মধুমতী রূপে নরহরি।
পাপিয়া শেখর কয়, তার পদে মতিরয়, এই ভিক্ষা দাও গৌর হরি॥

৩

গৌড়দেশে রাঢ়ভূমে, শ্রীখণ্ড নামেতে গ্রামে, মধুমতী প্রকাশ যাহার।
শ্রীমুকুন্দ দাস সঙ্গে, শ্রীরঘুনন্দন রঙ্গে, ভক্তিগ্রন্থ জগতে লওয়ার॥
শুনি মধুমতী নাম, আসিয়াছি তৃষিত হইয়া।
এত শুনি নরহরি, নিকটেতে জল হেরি, সেই জল ভাজনে ভরিয়া॥
আনিয়া ধরিল আগে, অমৃস্নিগ্ধ মিষ্ট লাগে, গণ সহ খায় নিত্যানন্দ।
যত জল ভরি আনে, মধু হয় ততক্ষণে, পুনঃ পুনঃ খাইতে আনন্দ॥
মধুমতী মধু-দান, সপার্ষদে করি পান, উনমত অবধুত রায়।
হাসে কাঁদে নাচে গায়, ভূমে গড়াগড়ি যায়, উদ্ধব দাস রস গায়॥

৪

শ্রীনরহরি সুচতুর কুলরাজ।
মাধব তনয়ক, নিয়ড়ে বিরাজিত, ভঙ্গী সুসদৃশ অদৃশ জগমাঝ॥
গৌর বদন বিধু, মধুর হাস যুত, তহি যুগল নয়ন সপি বহু রঙ্গ।
নাসা তনু সৌরভে, সুকর্ণ বচনামৃত, শ্রবণে চাহ নহু ভঙ্গ॥

পরম রুচির নিশি বেশ শিথিল ঘন নিরখত হিয়মধি অধিক উল্লাস।
প্রেমক গতি অতি চিত্র ন অনুভব, মানি পূরব ব্রজ বিপিন বিলাস॥
ধৈরজ ধরইতে করত যতন কত, রহত ন ধৈরজ অথির অবিরাম।
মৃদুতর দেহ লেহ ভরে গর গর নিরুপম চরিত নিছনি ঘনশ্যাম।

শ্রীভোলানাথ ঘোষবর্ম্মা

শ্যামের বাঁশী

(লেখক—শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্র নাথ ঘোষ।)

কবে কোন কুঞ্জবনে বেজেছিল বাঁশী ?
কে শুনেছে তার রব, কে ক'রেছে অনুভব,
কিরূপে জাগিল তবে স্মৃতিপথে আসি —
স্বরূপ প্রকাশি ?
কবে কোন কুঞ্জবনে বেজেছিল বাঁশী ?

* * * * *

কত যুগ যুগান্তর হইয়াছে গত।
বাঁশীর সে স্বর ধারা, প্রবাহিছে শত ধারা,
চিরস্রোতা নন্দনের মন্দাকিনী মত॥
সুদূর অতীতে কে যে, সে সুর গিয়াছে ভেঁজে,
কি মহান শক্তি তার র'য়েছে জাগ্রত—
সারাবিশ্বে ভাসি ?
কবে কোন কুঞ্জবনে বেজেছিল বাঁশী ?

* * * *

তাঁর স্পষ্ট মনোভাব অন্তরের কথা।
প্রেমের তুফান তুলে, দেখা দেয় মনকূলে
ভুলাইয়া বিশ্বপ্রাণ আনি তন্ময়তা॥

সে আনন্দ আত্মহারা, বুঝিবেনা বুকে কারা,
সে যে দীপ্তি শতরবি ঘুচে মলিনতা—
তমরাশি নাশি।
করে কোন কুঞ্জবনে বেজেছিল বাঁশী ?

* * * *

ভাবের সমষ্টি ল'য়ে আকৃতি তাঁহার।
যুগের দর্পণে রাখা, শান্ত অমরতা মাখা,
সাধকের জপমালা মন-মনিহার॥
ছুটে আসে নাহি বাধা, সে বাঁশীর সুর সাধা,
অনন্তের পথ জুড়ে তাঁর অধিকার—
আছে সে বিকাশি ?
কবে কোন কুঞ্জবনে বেজেছিল বাঁশী ?

* * * *

যে বাঁশীর সুরে এত মহিমা বিস্তার।
সে কি শুধু সুর মেখে, শুধু ডাক গেছে ডেকে,
তা'হ'লে কালের কোলে লয় হ'ত তাঁর॥
সে সুধা এতটা এসে, মরমের প্রান্তে ব'সে,
চালিত না মনগলা প্রেম অমরার।
দেবতাবে ভালবাসা, শ্যামের মুখের ভাষা,
সুরেসুরে গেয়ে গেছে গান মহিমার॥
শ্যামের মহান্ প্রাণ চিন্ময়ের অধিষ্ঠান
বিশ্বপ্রাণে প্রকাশিছে সুরে সুরে তার—
প্রেমানন্দে ভাসি ?
কবে কোন কুঞ্জবনে বেজেছিল বাঁশী !

শ্রীগৌরাঙ্গের প্রথম ভাবোদয়

আজ গয়াধামে শ্রীবিষ্ণু-পাদপদ্মের নিকট ভয়ানক জনসঙ্ঘ হইয়াছে, ভিন্ন ভিন্ন বেশধারী নানালোকে নানাপ্রকার আলোচনা করিতেছে—সে আলোচনার

মুখ্য কারণ অনুসন্ধানে জানা গেল, কাঁচাসোণার মত লাবণ্য বিশিষ্ট একটী যুবক পাদপদ্মের নিকট বসিয়া অঝোর নয়নে ঝুরিতেছে—মানুষের নয়নে যে এত জল ঝরিতে পারে তাহা দর্শকগণ কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারিতেছেন না। কিন্তু প্রত্যক্ষ বিষয় বিশ্বাস না করিয়াও উপায় নাই। সকলেই যুবকটীর পরিচয় জানিতে উৎসুক। সেই যুবকের যাঁহারা সঙ্গী ছিলেন তাঁহারা পরিচয় দিয়াছিলেন যে, ইনি নবদ্বীপ নিবাসী শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের পুত্র। নাম শ্রীগৌরাঙ্গ। কেহ কেহ নিমাই পণ্ডিত বলিয়াও ইহাকে ডাকে। দর্শকগণ আত্মহারা হইয়া যুবকটীর ভাব দেখিতেছেন। হঠাৎ কোথা হইতে এক সন্ন্যাসী আসিয়া তাহাকে বাহু পশারিয়া কোলে টানিয়া লইলেন, এবার কিন্তু যুবকের ভাব পূর্ব্বাপেক্ষাও সজীব হইয়া পড়িল, অর্থাৎ নয়নধারা শতগুণে বাড়িয়া গেল। কিছুকাল পরে সন্ন্যাসী তাঁহার কাণে কাণে কি বলিলেন অমনি যুবক মুর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। বিপুল জনসঙ্ঘ তখন "হরিবোল" ধ্বনি করিয়া উঠিল। সন্ন্যাসী যুবককে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন—ক্রমে যুবক সুস্থ হইয়া উঠিলে নানাপ্রকার কথোপকথন উপস্থিত দর্শকগণ করিতে লাগিল। কিছুকাল স্থির থাকিয়া যুবক উঠিয়া চলিলে জনসঙ্ঘও তাহার পিছু পিছু চলিতে লাগিল। পাঠকগণ বোধহয় বুঝিতে পারিতেছেন যে, ঐ যুবকই শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দর। আর ঐ যে সন্ন্যাসী যুবককে ধরিয়া ছিলেন উনিই আমাদের প্রভুর মন্ত্রদাতা শ্রীপাদ ঈশ্বর পুরী। যাহা হউক যখন ঈশ্বর পুরীর নিকট হইতে দীক্ষালাভ করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ ফিরিতেছিলেন তখন তাঁহার যে ভাব হৃদয়ে উদয় হইয়াছিল তাহা লক্ষ্য করিয়াই "শ্রীগৌরাঙ্গের প্রথম ভাবোদয়" নাম দিয়া আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় 'সৎসঙ্গ সভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত প্রভাস চন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় গানটী লিখিয়াছেন আমাদের পাঠকগণকে গানটীর রসাস্বাদনের জন্য সাদরে আহ্বান করিয়া গানটি নিম্নে দেওয়া হইল।

হৃদি উপবনে অতীব যতনে
মহীরুহ এক ক'রেছি রোপণ।
রত্নোপম তাহে রাখিব লুকায়ে,
ভক্তিবারি সদা করিব সেচন।
সংসারের পথে পরিশ্রান্ত হলে
লইব আশ্রয় সে বিটপী মূলে
দিবস রজনী ক্ষুধা তৃষ্ণা ভুলে,
আপন বিভবে রহিব মগন।

হরিনাম সুধা সে গাছে ফলাব,
যে যেথায় আছে সবারে বিলাব,
ভব ক্ষুধা আর কারো না রাখিব,
ভবে এসে এবার করেছি এ পণ।
প্রেমেতে মাতায়ে বলিব সবারে,
আয় রে কলি-জীব! (তোরা) প্রেম নিয়ে যাবে,
(প্রেমে) ছোট বড় নাই, আয় রে সবাই!
হৃদয়ে সবারে করিব ধারণ।

শ্রীপ্রভাস চন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

শ্রীগৌরাঙ্গ-সেবকের প্রতি

গৌরাঙ্গ-সেবক নামটী বড়ই মধুর। যাঁহার ভাগ্যে গৌরাঙ্গ-সেবা ঘটিয়া থাকে তিনি সামান্য জীব নহেন। গৌরাঙ্গ যে কি বস্তু তাহা তিনি অবশ্যই উপলব্ধি করিয়া গৌরাঙ্গের প্রেমে মাতোয়ারা হইয়া সেই সচ্চিদানন্দ প্রেমময়ের সেবাসুখ আস্বাদন করিতে থাকেন। গৌরাঙ্গ-সেবক হইবার চেষ্টা জীব মাত্রেরই হওয়া আবশ্যক, নচেৎ জন্মই বৃথা। এই কথার সার অর্থ যে, ভগবৎ সেবা জীবের মুখ্য ক্রিয়া। সেই ক্রিয়া বিরহিত হইয়া আবর্জ্জনাময় অপ্রাকৃত জড়রসে মত্ত থাকিয়া কর্ম্ম ও জ্ঞানবাদীদিগের পথানুসরণ করিলে জীবের মঙ্গল নাই। ভক্তি পথই জীবের একমাত্র অবলম্বনীয় এবং কলিকালে সেই ভক্তি গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু দয়া করিয়া দিয়া গিয়াছেন। সেই দয়াময় গৌরের আচার ও প্রচার প্রত্যেক জীবের আদর্শ বস্তু এবং প্রত্যেক জীব প্রতি মুহূর্ত্তেই তদ্দ্বারা চালিত হইয়া অবশেষে উহাই জীবনের একমাত্র অনুকরণীয় জানিয়া অন্য সকল অসচ্চেষ্টা হইতে আপনাকে নিতান্ত সাবধানে স্থাপন পূর্ব্বক আপনার কল্যাণ সাধন করিবে। গৌরাঙ্গে কোনরূপ অপরাধ না হয় তদ্বিষয়ে অধিকতর সতর্ক থাকিবে। গৌর-শিক্ষা ব্যতীত কোন শিক্ষাকে মনে স্থান দিয়া আদর করিবে না। জড়গন্ধ হইতে দূরে থাকিয়া বিশুদ্ধ ভাবে নির্ম্মল চিত্তে অনন্য ভক্তি ব্যতীত অন্য কোনরূপ কপটতা, কুটিনাটী, প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি ভক্তি বিরোধী চেষ্টা মনে যাহাতে স্থান না পায় তজ্জন্য গৌরাঙ্গের পদতলে সর্ব্বদাই

শরণ লইবে। ইহাতেই জীবের নির্ম্মল স্বভাব সরল ভাবে উদয় করাইবে। তখন কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মৎসরতা ক্রমে ক্রমে অপসারিত হইবে এবং জীব বিশুদ্ধ ভক্তি পথ ধরিবেন। ক্রমে ক্রমে যে যে কারণে ভক্তি ভঙ্গ হয় তাহা দেখিতে পাইবে। মহাজনগণ বলিয়াছেন :—

অত্যাহার প্রয়াস প্রজল্প জন সঙ্গ।
নিয়ম আগ্রহ লৌল্যে হয় ভক্তি ভঙ্গ ॥

এই সকল দোষ তখন দূর হইবে। তখন বাক্য, মন, ক্রোধ, জিহ্বা, উদর উপস্থ প্রভৃতি বেগ সকলই যে উদ্বেগ তাহা জানিয়া তাহা বিশেষরূপে দমন করিবে।

গৌর-প্রেমে চারিদিকের অন্ধকার দূর হইলে যুগল সেবায় লোভ হইবে। গৌরাঙ্গ লোকশিক্ষার জন্য যেরূপে রাধাকৃষ্ণ সেবা করিয়াছিলেন তাহাই গৌর ভক্তের গৌর সেবা। সেই সেবা পাইতে হইলে জীবের পক্ষে দুইটী মার্গ নির্দ্ধারিত আছে। একটী বিধিমার্গ, অপরটী রাগমার্গ। সাধারণতঃ জীবের বিধিমার্গ গ্রহণ করা বিধেয় এবং উহাই রাগমার্গে ক্রমে পরিণত হয়। কিন্তু যদি জীব অবিলম্বে আপনাকে গৌরাঙ্গের পদে একনিষ্ঠ হইয়া ষড়ঙ্গ শরণাগতির দ্বারা উন্নত করিতে পারেন তাহা হইলে রাগমার্গ আপনা হইতে পরিস্কার হইয়া জীবের হৃদয়ে স্থান লাভ করে এবং তখনই সেই জীবের অশেষ কল্যাণ সাধন হয়। তাহাতেই গৌরাঙ্গ-সেবক নাম তখন তাহার পক্ষে সার্থক হয়। তিনি গৌরকৃষ্ণ একবস্তু দেখিতে পান। সেই অবস্থায় সর্ব্বদাই তাহার মনে হয় :—

ভক্তি অনুকূল যাহা তাহাই স্বীকার।
ভক্তি প্রতিকূল সব করি পরিহার ॥
কৃষ্ণ বই রক্ষাকর্ত্তা আর কেহ নাই।
কৃষ্ণ সে পালন মোরে করিবেন ভাই ॥
আমি আমার যতকিছু কৃষ্ণে নিবেদন।
নিষ্কপট দৈন্যে করি জীবন যাপন ॥

এমতে যখন তাহার স্বরূপ-ভ্রম ও তত্ত্ব-ভ্রম বিদূরিত হয়, চিদ্বস্তু ও জড়বস্তুর পার্থক্য ভগবানের কৃপায় বুঝিতে পারে, ভগবানের রূপ, গুণ, লীলা প্রভৃতি চিন্ময় বস্তু সকল সর্ব্বদাই তাঁহার সম্মুখে থাকে, তখন জড়ীয় কদাচার ও ব্যভিচার যাহা সর্ব্বদাই সাধারণ জড়চক্ষে দেখা যায় তাহা কতদূর অন্যায় ও পরিহার্য্য

তাহা ভাল রকম উপলব্ধি করেন। মুখে তখন রাধাকৃষ্ণ নাম ও গৌর নাম প্রস্ফুটিত হয়। দশবিধ অপরাধ শূন্য হইয়া হরিনাম করিতে করিতে সচ্চিদানন্দ অনুভব করিতে থাকে। এইরূপ যখন অবস্থা তখনই না জীব গৌরাঙ্গ-সেবক অভিমানে গৌর পদতলে লুটাইয়া পড়িবে ও শ্রীরাধাকৃষ্ণ যুগল সেবায় রত থাকিয়া তাহাই ভজনা করিতে করিতে গৌরাঙ্গ-সেবক নাম সার্থক করিবে? তাই বলি—

নিতাই কৃপায় ভাই মাগি এই ভিক্ষা।
বল কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ কর কৃষ্ণ শিক্ষা॥
অপরাধ শূন্য হ'য়ে লও কৃষ্ণ নাম।
কৃষ্ণ মাতা কৃষ্ণ পিতা কৃষ্ণ ধনপ্রাণ॥
কৃষ্ণের সংসার কর ছাড়ি অনাচার।
জীবে দয়া শুদ্ধ ভক্তি সর্ব্বধর্ম্ম সার॥

গৌরাঙ্গ ভজিতে হইলে ও গৌরাঙ্গ-সেবক নামের সম্মান রক্ষা করিতে হইলে আপনাকে সর্ব্বদাই সতর্ক করিতে হয়। নিজ ভাষা অপেক্ষা মহাজন ভাষা অবশ্যই আদরণীয়। তজ্জন্য এস্থানে গৌরাঙ্গ ভজন সম্বন্ধে মহাজন উক্তি উদ্ধৃত করিলাম।

গোরা ভজ গোরা ভজ গোরা ভজ ভাই।
গোরা বিনা এ জগতে গুরু আর নাই॥
যদি ভজিবে গোরা সরল কর নিজ মন।
কুটী নাটী ছাড়ি ভজ গোরার চরণ॥
মনের কথা গোরা জানে ফাঁকি কেমনে দিবে।
সরল হ'লে গোরার শিক্ষা বুঝিয়া লইবে॥
আনের মন রাখিতে গিয়া আপনাকে দিবে ফাঁকি।
মনের কথা জানে গোরা কেমনে হৃদয় ঢাকি॥
গোরা বলে আমার মত করহ চরিত।
আমার আজ্ঞা পালন কর চাহ যদি হিত॥
গোরার আমি গোরার আমি মুখে বলিলে নাহি চলে।
গোরার আচার গোরার বিচার লইলে ফল ফলে॥
লোক দেখান গোরা ভজা তিলক মাত্র ধরি।
গোপনেতে অত্যাচার গোরা ধরে চুরি।

অধঃপতন হবে ভাই কৈলে কুটী নাটী।
নাম অপরাধে তোমার ভজন হবে মাটি॥
নাম লঞা যে করে পাপ হয় অপরাধ।
এর মত ভক্তি আর আছে কিবা বাধ॥
নাম করিতে কষ্ট নাই নাম সহজ ধন।
ওষ্ঠ স্পন্দ মাত্রে হয় নামের কীর্ত্তন॥
তুণ্ডবন্ধে চিত্তভ্রংশে শ্রবণ তবু হয়।
সর্ব্বপাপ ক্ষয়ে জীবের মুখ্য ফলোদয়॥
বহু জন্ম অর্চ্চনেতে এই ফল ধরে।
কৃষ্ণ নাম নিরন্তর তুণ্ডে নৃত্য করে॥
কর্ম্ম জ্ঞান যোগাদির সেই শক্তি নহে।
বিধি ভঙ্গ দোষ ফলহীন শাস্ত্রে কহে।
সে সব ছাড় ভাই নাম কর সার।
অতি অল্পদিনে তবে জিনিবে সংসার॥

তাই বলি অপরাধ শূন্য হইয়া শুদ্ধ বৈষ্ণবতাই গৌরাঙ্গের শিক্ষা। বৈষ্ণব-সম্মিলনীর মুখপত্র গৌরাঙ্গ সেবক এবং যথার্থ গৌরাঙ্গ-সেবকগণই প্রকৃত বৈষ্ণব সম্মিলনীর যোগ্য পাত্র। এই বৈষ্ণবসম্মিলনীতে ভেজাল যাহাতে কোনমতে প্রবেশ না করে তদ্বিষয়ে প্রত্যেক গৌরাঙ্গ-সেবককে ভাল করিয়া দেখিতে হইবে। সঙ্গই সকল অর্থের ও অনর্থের মূল। পরমার্থের দিক হইতে দেখিতেগেলেও দেখিবে যে কুসঙ্গত্যাগ সর্ব্বদাই বিধেয়। শ্রদ্ধাবিশিষ্ট শুদ্ধ ভক্ত-সঙ্গ যদি না হয় তাহাহইলে সেই সঙ্গ তৎক্ষণাৎ বর্জ্জনীয়। প্রবঞ্চকগণ সর্ব্বদাই আপনাদের বৈষ্ণব বলিয়া পরিচয় দিয়া ছলধর্ম্ম অপধর্ম্ম, উপধর্ম্ম ও অধর্ম্মের প্রশ্রয় দিয়া থাকেন। তাহাদিগের সঙ্গ গৌরাঙ্গ-সেবকগণের পক্ষে অত্যন্ত কষ্টকর। নেড়া নেড়ীগণ গৌরাঙ্গের নামে কলঙ্ক আনয়ন করিয়াছে, তাহারা গৌরাঙ্গ সেবকগণ হইতে ভিন্ন এবং তাহারে গৌরাঙ্গসেবক বলিয়া পরিচয় দিয়া জগতকে ও আমাদিগকে বঞ্চনা করে। প্রকৃত গৌরাঙ্গ-সেবকগণের সেই সকল লোকের কোনরূপ সংশ্রব রাখা উচিত নহে। গৌরাঙ্গ-সেবকের পরিচালকগণ তাঁহাদিগের শঠতা পূর্ণ স্বার্থময় রচনা অতিঅবশ্য গৌরাঙ্গসেবকে অনুপযুক্ত বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিবেন। যদি না করেন তাহাহইলে ভাললোকে বুঝিবে যে, তাঁহারা যখন ঐরূপ সংসর্গে থাকেন তখন অবশ্যই তাঁহাদের ভিতরেও গোল আছে।

REGISTRED N.O C. 262.

ভক্তি

ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় মাসিক পত্রিকা।

(শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-ভক্ত-সম্মিলনীর মুখপত্র)

(কলিকাতা ভাগবত ধর্ম্ম-মণ্ডল কর্ত্তৃক পরিদর্শিত।)

১৯শ বর্ষ, ৪র্থ ৫ম সংখ্যা, অগ্রহায়ণ, পৌষ ১৩২৭।

সম্পাদক
শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য গীতরত্ন।

—o—

"ভক্তি-কার্য্যালয়"
ঝোড়হাট "ভক্তি-নিকেতন", পোঃ আন্দুল-মৌড়ী, জেলা হাওড়া।

—o—

ডাকঘরের নূতন নিয়ম।

গত ১৯২০ সালের ১লা সেপ্টেম্বর হইতে ভারতীয় ডাকঘরসমূহে অনুরেজিষ্টারী ভিঃ পিঃ ডাকে কোন পার্শেল, প্যাকেট অথবা চিঠিপত্র গৃহীত হইবে না বলিয়া আদেশ জারি হইয়াছে। যাহা কিছু ভিঃ পিঃ ডাকে পাঠাইতে হইবে তাহাই রেজিষ্টারী করিতে হইবে। ভক্তির বার্ষিক মূল্য ১৷৹ দেড় টাকা সকলেই জানেন। গ্রাহকদিগের নিকট মূল্য আদায়ের জন্ত এতাবৎকাল আমরা অনুরেজিষ্টারী ভিঃ পিঃ ডাকে একথানি করিয়া ভক্তি পাঠাইয়া এক টাকা নয় আনা আদায় করিতাম। বর্ত্তমানে নূতন নিয়মানুসারে ভিঃ পিঃতে মূল্য আদায় করিতে হইলে গ্রাহকদিগের নিকট হইতে ১৷/৹ এক টাকা নয় আনা স্থলে ১৷৶৹ এক টাকা এগার আনা লইতে হইবে কিন্তু আমরা সেই দেড় টাকাই পাইব, অধিকন্তু গ্রাহকগণের তিন আনা বেশী লাগিবে। এখন হইতে গ্রাহকগণ যদি নিজ নিজ দেয় মূল্য মণিঅর্ডারে পাঠাইয়া দেন তাহা হইলে তাঁহাদিগের /৹ এক আনা খরচেই হইতে পারে।

এই নোটিস পাইবার পর দুই সপ্তাহ মধ্যে টাকা বা কোনরূপ পত্রাদি না পাইলে ভিঃ পিঃ তে গ্রহণ করিতে গ্রাহকগণের কোনও আপত্তি নাই বুঝিয়া আমরা ১৷৶৹ এক টাকা এগার আনা ধার্য্য করিয়া একে একে সকলের নিকটই ভিঃ পিঃ করিব। আশা করি, গ্রহণ করিয়া আপনাদের চির-আশ্রিত ভক্তি-ভাণ্ডারকে রক্ষা করিবেন।

বিনীত—
ভক্তি-সম্পাদক।

বার্ষিক মূল্য সর্ব্বত্র সডাক অগ্রিম ১৷৹ টাকা।
ঝোড়হাট "ভক্তি-নিকেতন" হইতে সম্পাদক কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

"ভক্তি" ১৯শ বর্ষ, ৪র্থ, ৫ম সংখ্যা, অগ্রহায়ণ ও পৌষ ১৩২৭ সাল।

শ্রীচৈতন্যাষ্টকের ত্রিপদী

(১)

অঙ্গনীলমণিবর্ণ প্রভাতার জিনি' স্বর্ণ
যাঁর হয়, বুধগণ যাঁরে।
চতুর্থ শ্রীকলিযুগে পূজে সংকীর্ত্তন-যাগে
সাক্ষাৎ সম্বন্ধে প্রেমভরে॥
ভীষ্মাদি বিদ্বানগণ কহে যাঁরে সর্ব্বোত্তম
চতুর্থ আশ্রমারাধ্য ধন।
চৈতন্য মূরতি ধারী পাষণ্ডি-বিজয়ী হরি!
কর প্রভু! কৃপা বরিষণ॥

(২)

শান্তিপুরে ঘরেঘরে কীর্ত্তন প্রচার ক'রে
যে করিলা পাতকী-তারণ।
পুত্র অদর্শনশোকে যে তুষিলা জননীকে
'জয় কৃষ্ণ' করিয়া ঘোষণ॥
উদয়-উন্মুখ রবি যেই হরে তার ছবি
কটিদেশে ঈদৃশবসন।
চৈতন্য মূরতি ধারী পাষণ্ডি-বিজয়ী হরি!
কর প্রভু! কৃপা বরিষণ॥

(৩)

সুমধুর বাক্যাতীত কোন এক অপ্রাকৃত
ভাবামৃত আস্বাদ করিতে।
স্নিগ্ধ অনুরাগবতী কোন গোপিকার প্রীতি
হরি' হরি স্বকার্য্য সাধিতে॥
আবরি' আপন বর্ণ তাঁর কান্তি জিনি' স্বর্ণ
যে তস্কর ক'রে প্রকটন।

চৈতন্য মূরতি ধারী পাষণ্ডি-বিজয়ী হরি!
কর প্রভু! কৃপাবরিষণ॥

(৪)

তামস দেবতাচয় প্রিয় যত বিশ্বময়
যাঁহারে না পায় প্রীতি করি'।
দৈবী ভাবাপন্ন যত ভক্তবৃন্দ আরাধিত
জয়যুক্ত ত্রিভুবন ভরি'॥
যেই লক্ষীবান গোরা শুদ্ধভক্ত চিতচোরা
সদানন্দে মধুর-দর্শন॥
চৈতন্য মূরতি ধারী পাষণ্ডি-বিজয়ী হরি!
কর প্রভু! কৃপা বরিষণ॥

(৫)

যাঁর আবির্ভাবজন্য নবদ্বীপ হৈল ধন্য
ব্রজের প্রকাশভেদ বলে।
পৌণ্ড্রবাসীগণ গতি স্ব-সমাজ সহক্ষিতি
অলঙ্কৃত যাঁর জন্ম ফলে॥
সন্ন্যাস আশ্রমসার করি তাহা অঙ্গীকার
পবিত্রিলা যে কলি-পাবন।
চৈতন্য মূরতি ধারী পাষণ্ডি-বিজয়ী হরি!
কর প্রভু! কৃপাবরিষণ॥

(৬)

পয়োধি হইতে বারি পয়োদ সঞ্চয় করি'
যথাকরে শীতল ভুবন।
রসাব্ধির রস তথা হরিনামামৃতকথা
পান করি' বদনে তেমন॥
নয়নের পথদিয়া সেই রস উথাড়িয়া
তপ্তধরা করেন শীতল।
কলিহত জীবগণে বুঝাইতে প্রেমধনে
মহানন্দে হ'তেন বিহ্বল॥
হরিনাম প্রেমদাতা জগতের হিতকর্ত্তা
সুহৃত্তর কলি-বিনাশন।

চৈতন্য মুরতি ধারী পাষণ্ডি-বিজয়ী হরি!
কর প্রভু! কৃপা বরিষণ॥

(৭)

সোণার বরণকায় পরকাশি' গোরারায়
কটিতে করঙ্ক মনোহর।
জিনিয়া কুঞ্জরবর গতি অতি প্রীতিকর
নামগানে মগ্ননিরন্তর॥
ঈশ্বর প্রসাদ শুচি তাতে স্বীয় যেইরুচি
শিখালেন যত প্রিয়গণ।
চৈতন্য মুরতি ধারী পাষণ্ডি-বিজয়ী হরি!
কর প্রভু! কৃপারবিষণ॥

(৮)

মৃদুমন্দ হাস্য যাঁর শোকনাশে এ ধরার
হাস্যনয় অমৃতের ধারা।
বচন উদ্যোগ যাঁর শুভ করে সুবিস্তার
কল্যাণেতে পূর্ণ হয় ধরা॥
যে চরণ সমাশ্রয় কার না করে উদয়
কৃষ্ণপ্রেম শান্তি-নিকেতন।
চৈতন্য মুরতি ধারী পাষণ্ড বিজয়ী হরি!
কর প্রভু! কৃপাবরিষণ॥

(৯)

নব পরিমলময় এই কীর্ত্তি পদ্মচয়
পবিত্রতাপূর্ণ শুভাকর।
যে জন প্রফুল্ল মন করিবেক অধ্যয়ন
লক্ষীবান গৌরাঙ্গ সুন্দর॥
নিজ পাদপদ্মে তারে প্রীতিদান করি' পরে
আনন্দেতে পূর্ণ করে প্রাণ।
হে ভক্ত রসিকবৃন্দ! হেন গোরা পদদ্বন্দ্ব
সদা ভাব' পাবে পরিত্রাণ॥

শ্রীসত্যচরণ চন্দ্র বি, এল।

পবিত্র জীবন

পবিত্র জীবন কথাটী শুনিতে বলিতে ও ভাবিতে যেন এক অপার্থিব ভাব আসিয়া প্রাণ পুলকিত করে, অথচ আমরা বিশেষ করিয়া জানিনা বা বুঝি না যে পবিত্র জীবন কি? অকপট, অলোভী, অক্রোধী ও অভিমান শূন্য ভগবদ্ভক্ত জীবনই পবিত্র জীবন বলিয়া শাস্ত্র ও সাধু মুখে কথিত হয়। এই পবিত্র জীবন লাভ করিতে হইলে সৎসঙ্গ, সৎ আলোচনা ও সৎ বিষয়েব ভাবনা করাই প্রধান ও একান্ত কর্ত্তব্য। সৎসঙ্গ ও সৎ আলোচনা দ্বারা চিত্ত মার্জ্জিত না হইলে পুর্ব্বোক্ত সৎগুণ যে লাভ হয় না তাহা সুনিশ্চিত। আমরা মানুষ তাই যাহাতে সর্ব্বদা সুখী হইতে পারি যাহাতে শারীরিক, মানসিক ও পারিবারিক সুস্থতায় থাকিতে পারি, তাহার জন্যই স্বতঃ পরতঃ যত্ন করিতেছি। ভাল মন্দ বিচার করিয়া সকল প্রকারে শান্তি লাভে ইহ পরকাল সুখময় করিতে হইলে যাহা আবশ্যক তাহা পবিত্র জীবন লাভ করিয়া ধর্ম্মানুষ্ঠান করিলেই বোঝা যায়। ধর্ম্ম ব্যতীত যে সকল প্রকারে সুখ লাভের আর দ্বিতীয় পন্থা নাই তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই বুঝিতে পারেন। আব ধর্ম্মকে বাদ দিলে যে মানুষের মনুষ্যত্বই উড়িয়া যায় তাহাও শাস্ত্রে পুনঃ পুনঃ কীর্ত্তন করিয়াছেন, যথা—

> আহার নিদ্রা ভয় মৈথুনঞ্চ সামান্য মেতৎ পশুভির্নরাণাং
>
> ধর্ম্মোহিতেষামধিকো বিশেষঃ ধর্ম্মেণ হীনাঃ পশুভি সমানাঃ।

আহার, নিদ্রা, ভয় ও স্ত্রীপুরুষ মিলন সকল প্রাণিতেই বর্ত্তমান, উহার জন্য মানুষ শ্রেষ্ঠ নহে, একমাত্র ধর্ম্মই মনুষ্যত্বেব পরিচায়ক, ধর্ম্মহীন লোক পশুর তুল্য। আবার ধর্ম্ম একটী ক্রিয়া বিশেষ নহে উহা সৎকর্ম্ম জনিত গুণ বিশেষ অর্থাৎ যে গুণ থাকিলে ভগবৎ সত্বা ধারণ করা যায় ঐ গুণের নাম ধর্ম্ম, এই ধর্ম্মই সকল সুখের একমাত্র নিদান স্বরূপ।

আমরা চাই শান্তি, চাই সুখ, চাই নিরাপদ ভাব। শ্রীভগবানের অসীম দয়া বলে যাহাতে সেই চির শান্তি, চির সুখ, ও চির সম্পদ পাইতে পারি তেমন জীবন, তেমন শরীর, তেমন ইন্দ্রিয়, এমন কি তেমন বুদ্ধি বিদ্যাও অনেকে পাইয়াছি, অথচ শান্তি নাই, সুখ বলে কাহাকে তাহাও বোধ হয় জানি না, ইহার কারণ কি? কারণ কেবল সদুপদেষ্টার ও সদালোচনার অভাব। আর কারণ নিজেদের অলসতা ও ইচ্ছা করিয়া অসদালাপ ও অসৎ সঙ্গ করা। আমরা অনেকেই জানিনা যে আহার নিদ্রাদি কয়েকটি সাধারণ

কর্ম্ম ভিন্ন আর মানুষের কিছু কর্ত্তব্য আছে, অথচ নিরন্তর প্রত্যক্ষ করিতেছি যে, ঐ আহার নিদ্রাদি আমারও যেমন আছে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পশু পক্ষীরও তেমন আছে। বহু শাস্ত্রে পরিপক্ক জ্ঞানশীল বহু বহু মহাত্মা মানবজীবনকে কি জন্য যে এত প্রশংসা, এত আদর ও এত শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছেন তাহা ভাবি না, ভাবিবার সুযোগও হয় না, তাই অনেকের মুখে স্পষ্টই শুনিতে পাই যে "এক প্রকারে দিন চলিয়া গেলেই হইল" হায়! হায়! বড়ই দুঃখ হয় যে এমন একটা প্রার্থনীয় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মনুষ্য জীবন সাধারণ পশুর সহিত তুলনায়ও যেন তুচ্ছ; কারণ আহার নিদ্রাদি সাধারণ কর্ম্ম গুলিতে পশুরা স্বাধীন, আমরা সেবিষয়েও নানাপ্রকারে পরাধীন, কারণ তাহাদের আহার নিদ্রার জন্য তাহারা নিরন্তর ভাবে না বা কোন প্রকার আড়ম্বরের অপেক্ষা করে না, যাহা পায় তাহাতেই পরমানন্দে দিনপাত করে, আমরা যে কোন রকমে দিনপাত করিতেও দিবারাত্র খাটিয়া খাটিয়া, ভাবিয়া ভাবিয়া ব্যাকুল হই; সুতরাং ভাবিতে হইবে আমরা শ্রেষ্ঠ কিসে?

পাঠক পাঠিকাগণ! সত্য সত্যই কি আমরা পশু পক্ষীরও হেয়? সত্য সত্যই কি আমাদের জীবন পশু পক্ষী অপেক্ষাও দুঃখের? আর সত্য সত্যই কি আমাদের জীবনের কার্য্য কোন রকমে দিনপাত করা? না! তাহা নয়, আমরা শান্তি, সুখ ও সুস্থতা অবলম্বনে যাহাতে পরমানন্দ পাইতে পারি তাহাই আমাদের চির প্রার্থনীয়। সর্ব্বদা কিসে সুখে থাকিতে পারি, কিসে আমাদের প্রাণ হইতে হতাশা, দুরাশা ও দুশ্চিন্তা বিদূরিত হয় তাহার জন্য সর্ব্ব শাস্ত্র সারভূত শ্রীভাগবত বলিতেছেন—

> তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষমাণঃ
> ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকং।
> হৃদ্ বাগ্ বপুর্ভির্বিদধন্নমস্তে
> জীবেত যোমুক্তিপদে স দায়ভাক্॥

হে ভগবন! যে ব্যক্তি সুখ ও দুঃখকে আপন সঞ্চিত কর্ম্মের পরিণাম বুঝিয়া ঐ কর্ম্ম ফলরূপ সুখ দুঃখ ভোগ করিতে করিতে কায়মনোবাক্যে নমস্কার করিয়া কবে তোমার কৃপা হইবে এই প্রত্যাশা করিয়া জীবনধারণ করে, তোমার ভাবের অমৃতরস পাইয়া জীবন্মুক্তি ধনে ধনী হইবার সেই ব্যক্তিই প্রকৃত অধিকারী।

প্রিয় পাঠক পাঠিকাগণ! শাস্ত্রালোচনা করিয়া ভাবরত্নাকর ভাগবত শাস্ত্র

হইতে এই অমৃত বাণীর অনুসরণ করুন, অভিমান শূন্য হইয়া যখন যাহা লাভ হয় তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিয়া কোন বিষয়ে কামনা না করিয়া কেবল ঈশ্বর কৃপাই কামনা করিয়া অকপট ভাবে পরমেশ্বরে মন প্রাণ সমর্পণ পূর্ব্বক অক্রোধ পরমা নন্দ স্বভাবে চলিয়া যান, সংসার সুখের হইবে, প্রত্যেক কার্য্যে লীলাময়ের অপূর্ব্ব লীলার অনুভব পাইবেন, মনুষ্য জীবনের শ্রেষ্ঠতা যে ধর্ম্ম লইয়া সেই পরমধর্ম্ম ভগবদ্‌ভাব লাভ হইবে, কোন অশান্তি, কোন বিক্ষেপ ও কোন ভাবনা থাকিবে না। ভাবনা রহিত হইয়া সর্ব্বদা অক্রোধ, পরমানন্দ ও অভিমান শূন্য হইয়া থাকাই পবিত্র জীবন। পবিত্র জীবন লাভ না হইলে প্রকৃত মানুষ হওয়া যায় না, আর প্রকৃত মানুষ না হইলেও পরমেশ্বরের প্রেমের মাধুর্য্য আস্বাদন করা হয় না। যাহার পবিত্র জীবন লাভ হইয়াছে সেই ব্যক্তিই—

কায়েনবাচা মনসেন্দ্রিয়ৈর্বা বুদ্ধ্যাত্মনাবানুসৃতস্বভাবাৎ
করোতি যদ্‌ যৎ সকলং পরস্মৈ নারায়ণায়েতি সমর্পয়েৎ তৎ॥

শরীর, বাক্য, মন, ইন্দ্রিয়, এবং স্বভাব বশত যাহা যাহা করে সকলই নারায়ণকে অর্পণ করে। অর্থাৎ পবিত্র জীবন লাভ হইলে যখন যাহা যাহা করে সকলই ভগবৎ ইচ্ছায় হইতেছে ভাবিয়া, সকলই শ্রীভগবানে সমর্পন করে, কোন কার্য্যেই আপন কর্তৃত্ব রাখেনা। যাহারা কর্ত্তৃত্বাভিমান শূন্য হইয়া সংসারে ভগবদ্‌ভাবে থাকে তাহারাই পবিত্র, তাহারাই যথার্থ মানুষ, তাহারাই আদর্শ পুরুষ। পবিত্র জীবন প্রাপ্ত নরনারীর ব্যবহার অতি সুখময়, তাহারা সুখেতেও বিহ্বল হয় না আর দুঃখেতেও অতিশয় ম্রিয়মান থাকে না, সর্ব্বদাই ভগবদ্ভাবে থাকার জন্য যখন যাহা হয় তাহাতেই পরিতৃপ্তি লাভ করে, তাহাদের প্রাণে সঙ্কীর্ণতা আর স্থান পায় না বিশ্বপ্রেমের উদয় হওয়ায় সামান্য প্রাণি হইতে যাহা কিছু দেখে সমস্তেই প্রেমময়ের অস্তিত্ব অনুভব করিতে পারে। এই পবিত্র জীবন প্রাপ্ত নরনারী দেবতুল্য এইভাবে দেবদেবী হইয়া চির শান্তি ও ইহ পরকাল সুখময় করিতে হইলে সৎসঙ্গ, সদ্‌গ্রন্থ পাঠ ও সাধন তত্ত্বাদির বিষয় আলোচনা একান্ত প্রয়োজন। বন্ধুগণ! কপটতা পরিহার পূর্ব্বক সেই আনন্দময় শ্রীভগবানের শরণাপন্ন হউন সকল জ্বালা, সকল অভাব দূর হইয়া যাইবে, হৃদয়ে পরমানন্দ পাইবেন, পবিত্র জীবন লাভ হইবে।

৺দীনবন্ধু কাব্যতীর্থ বেদান্তরত্ন

'ব্যথিতা'

রঞ্জিত রজত রথি
নিরত সন্ধ্যায়,
প্রাসাদ হইতে প'ড়ে
সরসীর গায়।
আলো ত নিকটে
কুমুদ না হাসে,
অব্যক্ত মরম ব্যথা
ভাষা না প্রকাশে।
সুনীল অম্বর হ'তে
কণকের হাসি—
সোহাগ চুম্বনে ঝরে
বাঁধনের বাঁশি।
ভেসে যায় আবেগেতে
যত বাঁধা তার,
নিমিশে ঝরিয়া পড়ে
হৃদয়ের ভার।

হে নাথ, কত যে বন্ধু
এই মত মোর,
আছে ঘেরি নিশিদিন
সাজি আপনার।
সার্থঢাকা ভালবাসা
প্রেম কোথা হেথা?
মরুভূমে মরিচিকা
প্রহেলিকা যথা!
তাদের সে প্রেমালাপ
তাদের সে হাসি—
আর নাহি লাগে ভাল,
দেখ দেব আসি।
আছো তুমি; কোথায় যে
জানিতে না চাই;
তব নামে সদা যদি
মগ্ন হয়ে যাই।

শ্রীঅনাথ নাথ মুখোপাধ্যায়

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবতার

"যদদ্বৈতং ব্রহ্মোপনিষদি তদপ্যস্যতনুভা
য আত্মান্তর্য্যামী পুরুষ ইতি সোঽস্যাংশ বিভবঃ।
ষড়ৈশ্বর্য্যৈঃ পূর্ণোঃ য ইহ ভগবান্ স স্বয়মযং
ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাজ্জগতি পরতত্বং পরমিহ॥"

বড়ই সুখের, বড়ই আনন্দের, বড়ই মঙ্গলের সংবাদ যে, কলি-পাবনাবতার পরম করুণাময় পূর্ণব্রহ্ম শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দরের সর্ব্বপাপ-তাপহারী হৃদ্‌কর্ণানন্দ-বর্দ্ধক সুমধুর নামের ধ্বনি ধীরে ধীরে আবার চারিদিকে ধ্বনিত হইয়া বঙ্গবাসীর শুধু বঙ্গবাসীর কেন, সমগ্র জগৎবাসীর সৌভাগ্য কীর্ত্তন করিতেছে। যে

গৌরভক্তি এতদিন প্রায় ভেকধারী বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যেই সংগোপনে রক্ষিত ছিল, দয়াময় গৌরভগবানের কৃপা কটাক্ষপাতে তাহা এক্ষণে দেশের কৃতবিদ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষিত উপাধী ধাবী বিদ্বদ্গুলী দ্বারা সাদরে অভ্যর্থিত ও প্রার্থিত হইতেছে দেখিয়া যথার্থই মনে হয় বৈষ্ণব সমাজের অস্তমিত গৌরব রবি আবার যেন নব রাগে রঞ্জিত হইয়া—উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে

"পৃথিবীর মধ্যে আছে যত দেশ গ্রাম।
সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম॥"

শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই মহা বাক্যের সফলতা প্রকাশ করিতেছে।

শ্রীগৌরাঙ্গনাম প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার অপূর্ব্ব জীবনী, প্রেম প্রচার, লীলা বিলাস প্রভৃতিও নানা প্রসঙ্গে ক্রমে প্রবন্ধে, পুস্তকে, বক্তৃতায়, কবিতায়, সঙ্গীতে, সঙ্কীর্ত্তনে, এমন কি পরস্পর আলাপ আলোচনায়ও বেশ প্রচার হইতেছে, ইহা বঙ্গবাসী আমাদের পরম সৌভাগ্যের কথা সন্দেহ নাই। এই বিরাট আলোচনার মধ্যে আমি মূ হইয়াও কিছু গৌর গুণ গাহিবার বাসনা লইয়া সহৃদয় পাঠকগণের সমীপে উপস্থিত। যদিও আমার হৃদয় বীণার ছিন্ন তন্ত্রী সে মহা মহিমাময় গৌর গুণ গানে সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত তথাপি ভুবন পাবন কৃপাসিন্ধু গৌর-ভক্তগণের কৃপাশক্তি ভরসা করিয়াই লেখনী ধারণ করিলাম, বলিতে পারিনা কতদূর কৃতকার্য্য হইতে পারি। সকলে কৃপাশীর্ব্বাদ করুণ ইহাই প্রার্থনা।

প্রবন্ধ লিখিয়া লেখক শ্রেণীর মধ্যে গণ্য হইবার বাসনা হৃদয়েতে নাই, তবে যে এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ এ কেবল কতিপয় বন্ধু বান্ধবের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ এবং লীলাময়ের লীলা কথা আলোচনা দ্বারা সেই শ্রীশ্রীগৌর বিধুর-শ্রীপাদ-পদ্ম নখ-চন্দ্রের কীরণ-কণাভাস প্রাপ্তি ও তদীয় ভক্তগণের কৃপাশীর্ব্বাদ লাভের আশা। সর্ব্বশ্রেণীর পাঠকগণের নিকটই আমার বিনীত নিবেদন, তাঁহারা যেন আমার ভাষার দোষ গুণ বিচার না করিয়া কেবল প্রতিপাদ্য বিষয়ের গুরুত্ব অনুভব করিয়া তদ্ভাবই গ্রহণ করেন। আমি সর্ব্ব বৈষ্ণব চরণে দণ্ডবৎ করিয়া আমার বক্তব্য বিষয় আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম।—

"বাঞ্ছা কল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ।"

প্রথমেই আমি যাঁহাকে পূর্ণ ব্রহ্ম বলিয়া অভিহিত করিলাম তাঁহার সম্বন্ধে সকল পাঠকগণই যে একমত তাহা নহে, কেহ তাঁহাকে পূর্ণাবতার কেহ অংশা-

।তার কেহ বা মাত্র ভগবদ্ভক্ত বলিয়াই তাঁহাকে বলিয়া থাকেন। অবশ্য প্রত্যেক অবতার সম্বন্ধেই এরূপ ভিন্ন ভিন্ন মত দেখা যায়, যখন যখনই ভগবান অবতীর্ণ হইয়াছেন, তখন তখনই বিপক্ষবাদীর এরূপ ভিন্ন ভিন্ন ধারণা হইয়াছে প্রমাণ—যথেষ্ট। আমার আলোচ্য-তত্ত্ব শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু সম্বন্ধে আমার নিজ মত কিছু বলিবনা কেবল শাস্ত্রীয় প্রমাণ ও মহাজনগণের বক্তব্যরূপ নজির উপস্থিত করিব, পাঠকগণ বেশ বিচার করিয়া রায় প্রকাশ করিবেন। কেবল মাত্র প্রত্যক্ষ বা অনুমান প্রমাণ দ্বারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবতারত্ব প্রতিপাদন সিদ্ধান্ত-সমাধান পক্ষে যথেষ্ট বলিয়া আমার মনে হয় না। কারণ আমি যে চোখে যেটী প্রত্যক্ষ করিব বা অনুমান করিব, আপনি হয়ত তাহার বিপরিত ভাব হৃদয়ে পোষণ করিতেছেন কাজেই আমার মতের সহিত আপনার মতের মিল হইবে না। এরূপ ক্ষেত্রে আপ্ত বাক্য বা শাস্ত্র প্রমাণ অর্থাৎ ত্রিকালদর্শী প্রাচীন ঋষিগণের প্রণীত শাস্ত্র প্রমাণ চাই। আর সে প্রমাণ আপনিও যেমন মানিবেন আমিও তেমনই মানিতে বাধ্য, কেননা শাস্ত্র বলিয়াছেন ;—

যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠ স্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোক স্তদনুবর্ত্ততে ॥

অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যাহা যাহা আচরণ করেন ইতর ব্যক্তিও সেই সেই কর্ম্মই করে, শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা যাহা প্রমাণ মনে করেন অন্যলোক তাহারই অনুসরণ করে।

যাহা হউক এক্ষণে বক্তব্য এই যে, যিনি শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দরকে অবতার বলিয়া স্বীকার করিবেন তাহার সম্বন্ধেতো গোল মিটিয়াই গেল, যিনি স্বীকার করিবেন না তাঁহাকে অবশ্যই শাস্ত্রীয় প্রমাণ দ্বারা দেখাইতে হইবে। এ সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় প্রমাণেরও যে অভাব আছে তাহা নয়, কারণ বিশুদ্ধচেতা ত্রিকালদর্শী আর্য্য ঋষিগণের যোগসিদ্ধ জ্ঞানদর্পণে সত্য অবশ্যই প্রতিফলিত হইত। আর মূর্খ, নাস্তিক, তর্কনিষ্ঠ ব্যক্তিগণের জন্য তাঁহারা ঐ সত্য সযত্নে রক্ষা করিয়া গিয়াছেন, আমরা যখন তর্ক করিতে উপস্থিত তখন সেই সকল প্রমাণ আমাদের অবশ্যই অবলম্বনীয়।

আমাদের আলোচ্য শ্রীগৌরাঙ্গ যে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীরাধাভাব-কান্তি-বিলাসরূপী আবির্ভাব বিশেষ প্রাচীন শাস্ত্রাদিতে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়, আমরা কিছু কিছু প্রমাণ পরে উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতে চেষ্টা করিব।

সুধী পণ্ডিতগণ একবাক্যে বলিয়া থাকেন যে, "শ্রীগৌরাঙ্গদেব ছন্ন অবতার,

কাজেই তদ্বিবরণ তাঁহারই ইচ্ছায় একটু প্রচ্ছন্ন ভাবেই শাস্ত্রে ব্যক্ত হইয়াছে।" কিন্তু তথাপি একটু নিবিষ্ট চিত্তে অনুধাবন করিলে ঐ সকল প্রমাণ হইতেই তাঁহার অবতারত্ব প্রমাণ সূচক আভাষ ইঙ্গিত, সংবাদ এবং কোথাও কোথাও বা স্পষ্ট প্রমাণ পরিদৃষ্ট হয়।

পঞ্চমবেদ স্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবতে পরম ভাগবত প্রহ্লাদ কর্ত্তৃক শ্রীনৃসিংহ দেবের স্তবে উক্ত হইয়াছে—

"ইত্থং নৃতির্য্যগৃষিদেবঝসাবতারৈ-
র্লোকান্ বিভাবয়সি হংসি জগৎ প্রতীপান্।
ধর্ম্মং মহাপুরুষ পাসি যুগানু বৃত্তং
ছন্নকলৌ যদভবস্ত্রিযুগোঽথ সত্বম্॥"

অর্থাৎ হে মহাপুরুষ! আপনি মনুষ্য, ঋষি, দেব এবং মৎস্যাদি নানা প্রকার অবতার দ্বারা লোক সকলকে পালন, উৎপীড়ক দুষ্টগণকে দলন এবং যুগানুরূপ ধর্ম্ম সংস্থাপন প্রভৃতি কর্ম্ম করেন, কলিতে আপনার আবির্ভাব প্রচ্ছন্ন ভাবেই হইবে এই জন্যই আপনাকে ত্রিযুগ বলা হয়।

প্রাচীন শ্রীগৌরাঙ্গ চরিত লেখক আচার্য্যগণ বহু শাস্ত্রীয় প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া গিয়াছেন তন্মধ্যে কয়েকটী মাত্র আমরা উদ্ধৃত করিব। প্রমাণগুলির ব্যখ্যা-বিবৃতি, বিচার-বিতর্ক, খণ্ডন সমর্থন, পূর্ব্বপক্ষ-সিদ্ধান্ত-পক্ষ সমস্ত মীমাংসার ভারই শ্রীগৌরাঙ্গ অবতার বাদের সপক্ষ ও বিপক্ষ উভয় দলের পণ্ডিত-গণের উপর ন্যস্ত রহিল।

সর্ব্বপ্রথমে শ্রীভগবান যে জীবের মধ্যে অবতার হইয়া আসিয়া থাকেন, শ্রীভগবানের নিজ মুখের বাক্য হইতেই আমরা তাহার প্রমাণ পাই। গীতায় তিনি অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন—

"যদা যদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥
পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

অর্থাৎ হে ভারত! যখন যখনই ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের বৃদ্ধি দেখি তখন তখনই আমি অবতীর্ণ হইয়া সাধুগণের পরিত্রাণ ও অসাধুগণের বিনাশ করিয়া ধর্ম্মরক্ষা করি।

এখানে হয়তো কেহ বলিবেন যে, গৌরাঙ্গ অবতারের পূর্ব্বে এমন কি

ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের বৃদ্ধি হইয়াছিল যে তিনি অবতীর্ণ হইলেন ? ইহার উত্তরে আমরা আমাদের নিজের কথা না বলিয়া "শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে শ্রীল-কবিকর্ণপুর সে সময়ের অবস্থা যাহা বর্ণনা করিয়াছেন তাহাই উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। শ্রীল কবিকর্ণপুর বলিয়াছেন শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্ব্বে—

"ষষ্ঠে কর্ম্মণি কেবলং কৃতধিয়ঃ সূত্রৈক চিহ্নাদ্বিজাঃ
সংজ্ঞামাত্র বিশেষতো ভুজভুবো বৈশ্যাস্তু বৌদ্ধাইব।
শূদ্রাঃ পণ্ডিত মানিনো গুরুতয়া ধর্ম্মোপদেশোৎসুকা
বর্ণানাং গতিরীদৃগেব কলিনা হা হন্ত সম্পাদিতা॥

অপিচ—

বিবাহ যোগ্যত্বাদিহ কতিচিদাদ্যা শ্রমযুজো
গৃহস্থাঃ স্ত্রীপুত্রোদর ভরণ মাত্র ব্যসনিনঃ॥
অহোবানপ্রস্থা শ্রবণ পথমাত্র প্রণয়িনঃ
পরিব্রজ্যাবেশৈঃ পরমুপহরন্তে পরিচয়॥

(চৈঃ চঃ নাটক ২য় পরিঃ ৩।৪ শ্লোক)

অর্থাৎ ব্রহ্মণগণ ষষ্ঠকর্ম্মে অর্থাৎ যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপন, দান ও প্রতিগ্রহ এই ছয়টী কর্ম্মের শেষটী অর্থাৎ প্রতিগ্রহে তৎপর, আর ব্রাহ্মণের চিহ্ন একমাত্র যজ্ঞোপবিত, ক্ষত্রিয়গণ ধরাভার হরণ করিতে অসমর্থ পরন্তু আমি ক্ষত্রিয় এরূপ অভিমান পূর্ণ হৃদয়, বৈশ্যগণ বৌদ্ধেরন্যায় আচরণ বিশিষ্ট আর শূদ্র সকল পণ্ডিতাভিমানী হইয়া জগতে ধর্ম্মোপদেষ্টা সাজিয়া বেড়াইবার একমাত্র কারণ ঘোর কলির প্রবেশ। আরও—কেহ পরিণয়ে অক্ষম হইয়া ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণ করিতেছে, গৃহস্থ কেবল স্ত্রীপুত্র পরিজনের ভরণ পোষণেরত বাণপ্রস্থ কেবল নাম মাত্র শ্রুতহয় আর সন্ন্যাসীগণ কেবল ভেক ধারণ করিয়া লোকের নিকট আত্মপরিচয় প্রদানে ব্যস্ত—যখন দেশের এই অবস্থা তখন শ্রীমন্মহাপ্রভু আসিয়াছিলেন।

শ্রীগৌরাঙ্গলীলা লেখক ব্যাসাবতার শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর শ্রীচৈতন্য ভাগবতে তখনকার অবস্থা বর্ণন করিয়াছেন—

* * *

ব্যর্থকাল যায় মাত্র ব্যবহার রসে॥
কৃষ্ণনাম ভক্তিশূন্য সকল সংসার।
প্রথম কলিতে হৈল ভবিষ্য আচার॥

'ধর্ম্মকর্ম্ম' লোক সবে এইমাত্র জানে।
মঙ্গলচণ্ডীর গীতে করে জাগরণে ॥
দম্ভকরি বিষহরি পূজে কোনজনে।
পুত্তলি করয়ে কেহ দিয়া বহুধনে ॥
ধন নষ্টকরে পুত্র কন্যার বিভায়ে।
এই মত জগতের ব্যর্থ কালযায় ॥

* * *

না বাখানে যুগধর্ম্ম কৃষ্ণের কীর্ত্তন।
দোষ বহিগুণ কারো না করে কথন ॥
যেবা সব বিরক্ত তপস্বী অভিমানী।
তাঁ'সবার মুখে-হ না'হিক হরিধ্বনি ॥

* * *

সকল সংসার মত্ত ব্যবহার রসে।
কৃষ্ণপূজা কৃষ্ণভক্তি কারো নাহি বাসে ॥
বাশুলি পূজয়ে কেহো নানা উপহারে।
মদ্য মাংস দিয়া কেহো যক্ষ পূজা করে ॥

তান্ত্রিক বীরাচারের প্রবল ব্যাত্যায় যখন জনসাধারণ উদ্‌ব্যস্ত হইয়াছিল, কি গৃহী, কিসন্ন্যাসী, কি সম্ভ্রান্ত কি সাধারণ সকলেই যখন সেই বীরাচারের ভীষণ আক্রমণে নিষ্ঠুরভাবে নিগৃহীত হইতেছিল, বাঙ্গলার স্বাধীনতা বিলুপ্ত হওয়ায় যখন মুসলমান নৃপতিবৃন্দের নানা প্রাকর প্রভাবে জনসাধারণ ভ্রষ্টাচারী হইয়াছিলেন, কুতর্ককুশল পণ্ডিতগণের কঠোর তর্কের আঘাতে বেদ ও বৈদিক ঈশ্বর পর্য্যন্ত যখন ছিন্ন ভিন্ন হইতেছিলেন ঠিক সেই সময় সর্ব্ব মঙ্গলালয় করুণাসিন্ধু প্রেমময় শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর প্রকাশ হন—

"সেনই সময়ে সর্ব্ব জগত জীবন।
অবতীর্ণ হইলেন শ্রীশচীনন্দন ॥"

কবি পুনরায় বলিয়াছেন—

"কলির তাড়নে বদ্ধ জীবগণে
সতত বিরস মতি।
নিরখি সে ভাব নদীয়া মন্দিরে
অবতীর্ণ বিশ্বপতি ॥"

*　　*　　*

"জীবের দুর্দ্দশা　　শোচনীয় অতি
ভাবিয়া গৌরাঙ্গরায়।
ধরি হেম জিনি　　মধুর মূরতি
অবতীর্ণ নদীয়ায়॥"

বৈষ্ণব কবি নয়নানন্দ বলিয়াছেন—

"কলিঘোর তিমিরে　　গরাসল জগজন
ধরম করম বহুঁ দূর।
অসাধনে চিন্তামণি　　বিধি মিলাওল আনি
গোরা বড় দয়াব ঠাকুব॥"
ইত্যাদি

বৈষ্ণব কবিগণেব এই ভাবের অনেক কথা আছ আমরা প্রবন্ধ বাহুল্য ভয়ে এবং পাছে কেহ মনে করেন যে, বৈষ্ণবগণতো মহাপ্রভুর বিষয় বলিবেনই সে কারণ আমরা শ্রীমদ্ভাগবতাদি প্রাচীন গ্রন্থ ও অন্যান্য পুরাণ তন্ত্রাদি হইতে এমন কি সংহিতা ও উপনিষদ প্রভৃতি হইতেও প্রমাণ দেখাইবাব চেষ্টা করিব। সর্ব্ব প্রথম শ্রীমদ্ভাগবত কি বলিতেছেন দেখুন।

নিমি রাজা করভাজনকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"কস্মিন্ কালে স ভগবান্ কিং বর্ণঃ কিদৃশো নৃভিঃ।
নাম্না বা কেন বিধিনা পূজ্যতে তদিহোচ্যতাম্॥
ভাঃ ১১।৫।১৯

অর্থাৎ সেই ভগবান কোন যুগে কিরূপ বর্ণ ও কিরূপ আকার ধারণ করেন এবং লোকেই বা তাঁহাকে কি নামে ও কি বিধানে পূজা করিয়া থাকে তাহা বলুন। নিমিরাজেব এতাদৃশ প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া কবভাজন বলিলেন ;—

"কৃতং ত্রেতা দ্বাপরঞ্চ কলিরিত্যেষু কেশবঃ।
নানা বর্ণাভিধাকারো নানৈব বিধিনেজ্যতে॥

মহারাজ। ভগবান্ কেশব সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চারিযুগে নানা বর্ণ, নানা নাম ও নানা আকার ধারণ করিয়া থাকেন আর বিবেকীগণও নানা-বিধ বৈদিক ও তান্ত্রিক বিধানে তাঁহার পূজা করিয়া থাকেন,

কৃতে শুক্লশ্চতুর্বাহুর্জটিলো বল্কলাম্বরঃ।
কৃষ্ণাজিনোপবীতাক্ষান্ বিভ্রদ্দণ্ডং কমণ্ডলুম্॥

ত্রেতায়াং রক্তবর্ণোহসৌ চতুর্ব্বাহুস্ত্রিমেখলঃ।
হিরণ্যকেশস্ত্রয্যাত্মা স্রুক্ স্রুবাদ্যুপলক্ষণঃ॥
দ্বাপরে ভগবান্ শ্যামঃ পীতবাসা নিজায়ুধঃ।
শ্রীবৎসাদিভিরঙ্কৈশ্চ লক্ষণৈ রূপলক্ষিতঃ॥

অর্থাৎ—সত্যযুগে শুক্লবর্ণ, চতুর্ব্বাহু জটাজুটধারী ও বল্কল বসন হইয়া কৃষ্ণাজিন (কৃষ্ণসার মৃগ চর্ম্ম) যজ্ঞোপবীত, অক্ষমালা, দণ্ড ও কমণ্ডলু ধারণ করিয়া ব্রহ্মচারী বেশে অবতীর্ণ হইয়া ছিলেন। আর ত্রেতাযুগে রক্তবর্ণ, চতুর্ব্বাহু ত্রিগুণ মেখলা ধারী, তাম্রবর্ণ কেশ, বেদময় এবং স্রুক স্রুবাদি যজ্ঞ সামগ্রী সমূহ ধারণ করিয়া যোগীবেশে যজ্ঞ মূর্ত্তিতে অবতীর্ণ হইয়া ছিলেন আর দ্বাপরে ভগবান কৃষ্ণবর্ণ পীতাম্বর বংশী প্রভৃতি রূপে পরিণত শঙ্খ চক্রাদি নিজ আয়ুধধারী এবং শ্রীবৎসাদি চিহ্ন চিহ্নিত ও দ্বাত্রিংশৎ লক্ষণে শোভিত হইয়া শ্রীনন্দনন্দনরূপে অবতীর্ণ হইয়া ছিলেন। তারপর কলিতে কি হইবেন তাহা উল্লেখ করিয়া যদুকুলাচার্য্য গর্গ মুনি শ্রীকৃষ্ণের নাম করণ সময় শ্রীনন্দ মহারাজকে বলিয়াছিলেন—

"আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ো হ্যস্য গৃহ্ণতোঽনুযুগং তনুঃ।
শুক্লোরক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ॥

ভাঃ ১০।৮।১৩

অর্থাৎ হে নন্দ। তোমার এই পুত্র সত্যাদি প্রতি যুগেই ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করিয়া থাকে অর্থাৎ পরিপূর্ণ ধর্ম্মময় সত্যযুগে শুক্লবর্ণ, যজ্ঞ প্রধান ত্রেতা যুগে রক্তবর্ণ এবং এই দ্বাপর যুগে কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিয়াছেন। আরও এক কথা—তোমার এই পুত্রই কলিযুগে পীতবর্ণ অর্থাৎ গৌর রূপ ধারণ করিয়া কলিজীবকে উদ্ধার করিবেন। কলিকালে কি প্রকারে তাহার পূজাদি করা হইবে তাহাও বলিতেছি—

"কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্র পার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥"

ভাঃ ১১।৫।৩১

অর্থাৎ কলিযুগে বিবেকিগণ অঙ্গ (১) উপাঙ্গ (২) অস্ত্র (৩) ও পার্ষদাদির (৪) সহিত কান্তিতে যিনি অকৃষ্ণ অর্থাৎ গৌর অথবা যিনি সর্ব্বদা

১ অদ্বৈতাচার্য্য ও নিত্যানন্দ (২) শ্রীবাস পণ্ডিত প্রভৃতি (৩) ভববন্ধন ছেদনের উপায় হরিনাম (৪) গদাধর পণ্ডিত প্রভৃতি ভক্তগণ।

কৃষ্ণ কীর্ত্তন করেন কিম্বা যাঁহার নামের মধ্যে কৃষ্ণ এই দুইটী বর্ণ যোগ আছে এমন যে শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য নামক পুরুষ তাঁহাকে সঙ্কীর্ত্তন রূপ প্রধান প্রধান উপ করণ দ্বারা পূজা করিয়া থাকেন।

উক্ত শ্লোকে "অকৃষ্ণ" এই শব্দ দ্বারা কৃষ্ণ বর্ণ নহে একথা বলিলে শুক্ল বা রক্ত বর্ণ ও বুঝাইতে পারে, কিন্তু "কৃতে শুক্লশ্চতুর্ব্বাহু" ইত্যাদি শ্লোকে সত্যযুগে শুক্লবর্ণ, "ত্রেতায়াং রক্তবর্ণোঽসৌ" ইত্যাদি শ্লোকে ত্রেতাযুগে রক্তবর্ণ, এবং "দ্বাপরে ভগবান শ্যাম" ইত্যাদি শ্লোকে দ্বাপরে কৃষ্ণ বর্ণই বলা হইল। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, কেবল পীত বর্ণই বাকী কাজেই অকৃষ্ণ বলিতে এখানে পীত বর্ণই বুঝিতে হইবে।

প্রতিকল্পে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি অনেকবার হইয়া থাকে সুতরাং গর্গমুণির "আসন বর্ণাস্ত্রয়" ইত্যাদি শ্লোকের তাৎপর্য্য এই বুঝিতে হইবে যে, পূর্ব্ব-পূর্ব্ব সত্যযুগে শুক্লবর্ণ, ত্রেতায় রক্তবর্ণ এবং কলিতে পীতবর্ণ হইয়া ছিলেন এবং ভবিষ্যৎ তিন যুগেও ঐরূপ হইবেন আর বর্ত্তমান দ্বাপরে যেমন কৃষ্ণবর্ণ হইয়াছেন পূর্ব্ব-পূর্ব্ব দ্বাপরেও সেইরূপ ছিলেন এবং ভবিষ্যৎ দ্বাপরেও ঐরূপ হইবেন। এরূপ অর্থ না ধরিলে সত্যযুগে করভাজনের উক্তিতে "যজন্তি" (পূজা করিয়া থাকেন) এইরূপ বর্ত্তমান কালের প্রয়োগ না হইয়া ভবিষ্যৎ প্রয়োগ থাকিত। এইবারে আমরা পুরাণ হইতে কয়েকটি প্রমাণ উদ্ধৃত করিব। কূর্ম্মপুরাণে শ্রীভগবান নিজমুখে বলিয়াছেন—

"কলিনা দহ্যমানানামুদ্ধরায় তনুভৃতাম্।
কলেঃ প্রথম সন্ধ্যায়াং ভবিষ্যামি দ্বিজাতিষু॥"

অর্থাৎ—কলি নিপীড়িত মানবগণের উদ্ধারার্থে আমি কলির প্রথম সন্ধ্যায় ব্রাহ্মণ কুলে জন্মগ্রহণ করিব। আবার নৃসিংহপুরাণে ভগবদুক্তি যথা—

"অহমেব দ্বিজশ্রেষ্ঠ লীলা প্রচ্ছন্ন বিগ্রহঃ।
ভগবদ্ভক্ত রূপেণ লোকং রক্ষামি সর্ব্বদা॥"

অর্থাৎ—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! আমিই লীলা-দ্বারা প্রচ্ছন্ন ভাবে কৃষ্ণদেহ গোপন পূর্ব্বক ভগবদ্ভক্ত রূপে সর্ব্বদা লোক সকলকে রক্ষা করিব। বামণ পুরাণে নারদকে শ্রীভগবান বলিয়াছেন—

"কলি ঘোর তমসাচ্ছন্নান্ সর্ব্বানাচার বর্জ্জিতান্।
শচীগর্ভেচ সম্ভূয় তারয়িষ্যামী নারদ॥"

অর্থাৎ—হে নারদ! আমি শচীগর্ভে সম্ভূত হইয়া কলিকালে ঘোর

মোহাচ্ছন্ন ও আচার বর্জ্জিত জীবগণকে উদ্ধার করিব। উপপুরাণেও ভগবদ্ভক্তি আছে -

"অহমেব কচিৎ ব্রহ্মণ্ সন্ন্যাসাশ্রম মাশ্রিতঃ।
হরিভক্তিং গ্রাহয়ামি কলৌপাপহতান্ নরান্॥"

অর্থাৎ—হে ব্রহ্মণ! আমিই কলিতে কোনও স্থানে অবতীর্ণ হইয়া সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ পূর্ব্বক পাপিষ্ঠ লোক সকলকে হরিভক্তি গ্রহণ করাইব। গরুড় পুরাণে যথা—

"শুদ্ধ গৌর সুদীর্ঘাঙ্গো গঙ্গাতীর সমুদ্ভবঃ।
দয়ালু কীর্ত্তনগ্রাহী ভবিষ্যামি কলৌযুগে॥"

অর্থাৎ আমি কলিযুগে বিশুদ্ধ গৌরবর্ণ, দীর্ঘদেহ ও দয়ালু হইয়া গঙ্গাতীরে অবতীর্ণ হইব এবং সকল লোককে শ্রীসঙ্কীর্ত্তন শিক্ষা দিব। পুনশ্চ ভবিষ্য পুরাণে—

"আনন্দাশ্রু কলা রোম হর্ষ পূর্ণং তপোধন।
সর্ব্বেমামেব দ্রক্ষন্তি কলৌ সন্ন্যাসি রূপিণম্॥"

অর্থাৎ হে তপোধন! কলিতে সকলে আমাকে আনন্দাশ্রু কলায় ও পুলকে পরিপূর্ণ সন্ন্যাসীরূপে দর্শন করিবে। শিবপুরাণে দেবগণকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—

"দিবিজা ভুবিজায়ধ্বং জায়ধ্বং ভক্তরূপিণঃ।
কলৌ সংকীর্ত্তনারম্ভী ভবিষ্যামি শচীসুতঃ॥"

হে দেবগণ! তোমরা সকলে ভক্তরূপে ভূতলে অবতীর্ণ হও আমিও সংকীর্ত্তন ধর্ম্ম প্রচারের জন্য কলিতে শচীসুত হইয়া জন্মগ্রহণ করিব। পদ্ম পুরাণে উল্লেখ আছে—

"কলেঃ প্রথম সন্ধ্যায়াং গৌরাঙ্গোহসৌ মহীতলে।
ভাগীরথী তটে ভূম্নি ভবিষ্যতি সনাতনঃ॥"

অর্থাৎ সেই সনাতন বিষ্ণু কলির প্রথম সন্ধ্যায় ভাগীরথী তীরবর্ত্তী প্রদেশে গৌরবর্ণ দেহে আবির্ভূত হইবেন। স্কন্দ পুরাণে যথা—

"অন্তঃ কৃষ্ণো বহির্গৌরঃ সাঙ্গো পাঙ্গাস্ত্র পার্ষদঃ।
শচীগর্ভে সমাপ্নুয়াৎ মায়া-মানুষ- কর্ম্মকৃৎ॥"

"শ্বেতঃ সত্যযুগে বর্ণঃ রক্ত স্ত্রেতা যুগে পুনঃ।
দ্বাপরে কৃষ্ণ বর্ণোহহং পীতঃ কলিযুগে স্মৃতঃ॥

অগ্নিপুরাণে—

"শান্তাত্মা লম্ব কণ্ঠশ্চ গৌরাঙ্গশ্চ সুরাবৃতঃ"

কৃষ্ণযামলে—

"পুণ্যক্ষেত্রে নবদ্বীপে ভবিষ্যামি শচীসুতঃ।"

বিশ্বসারতন্ত্রে—

"গঙ্গায়াং দক্ষিণেভাগে নবদ্বীপে মনোহরে।
কলিপাপ বিনাশায় শচীগর্ভে সনাতনঃ॥
জনিষ্যতে প্রিয়ে মিশ্র পুরন্দর গৃহে স্বয়ম্
ফাল্গুনে পৌর্ণমাস্যাঞ্চ নিশায়াং গৌর-বিগ্রহঃ॥"

পুনশ্চ কপিলতন্ত্রে—

"জম্বুদ্বীপে কলৌঘোরে মায়াপুরে দ্বিজালয়ে।
জনিত্বা পার্ষদৈঃ সার্দ্ধং কীর্ত্তনং কারয়িষ্যতি॥"

পুনশ্চ মুক্ত-সঙ্কলিনীতন্ত্রে—

"কুরুক্ষেত্রং কৃতেতীর্থং ত্রেতায়াং পুষ্করং স্মৃতম্।
দ্বাপরে নৈমিষারণ্যং নবখণ্ডং কলৌকিল।
যথা দ্বিজমণি গৌরঃ সাক্ষাদেব ভবিষ্যতি॥"

অনন্তসংহিতায়—

"রাধিকা বল্লভঃ কৃষ্ণো ভক্তানাং প্রিয় কাম্যয়া.
শ্রীমদ্‌গৌরাঙ্গ রূপেন নবদ্বীপে বিরাজতে॥
গোপীভাব প্রদানার্থং ভগবান্ নন্দ-নন্দনঃ।
ভক্তবেশ ধরঃ শান্তো দ্বিভূজো গৌর-বিগ্রহঃ॥"

মুণ্ডকোপনিষদে—

"যদাপশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং
কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্ম-যোনিম্।
তদা বিদ্বান্ পুণ্য পাপে বিধূয়
নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি॥"

শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে—

"মহান্ প্রভুর্বৈ পুরুষঃ সত্ত্বস্যৈষ প্রবর্ত্তকঃ।"

গোপালোপনিষদে—

"নমো বেদান্ত বেদ্যায় কৃষ্ণায় পরমাত্মনে।
সর্ব্ব চৈতন্য রূপায় চৈতন্যায় নমোনমঃ॥"

মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণ-সহস্রনামে যথা—

"সুবর্ণ বর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী।"

এই ভাবের বহু প্রমাণ পাওয়া যায়, বোধহয় এইগুলি দিলেই যথেষ্ট হইবে। হয় ত বিপক্ষবাদী বলিবেন এগুলি প্রক্ষিপ্ত। আমাদের সন্দেহ হয়, যাঁহারা প্রক্ষিপ্ত বলিয়া প্রমাণগুলিকে উড়াইয়া দিতে চাহেন তাঁহারা নিজেরাই প্র-ক্ষিপ্ত কিনা। উপরে যে সকল প্রামাণিক গ্রন্থ উপনিষদ, তন্ত্র, বেদ, পুরাণাদি হইতে প্রমাণ দেখান হইল কেবল ঔদাস্য উপেক্ষায় বা তিনটী মাত্র মৌখীক বর্ণব্যায়ে "প্রক্ষিপ্ত" বলিয়া উড়াইয়া দিলে চলিবে না।

বিপক্ষবাদীর প্রমাণ আমরা দেখিতে চাই, তাঁহারা কি প্রমাণের বলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবতারত্ব স্বীকার করিবেন না তাহা প্রকাশ করিলে ভাল হয়। নতুবা কেবল "এই সেদিনের বাঙ্গালী নিমাইচাঁদ মিশ্র কখনও অবতার হইতে পারে না" এরূপ একগুঁয়ে ভাব দেখাইলে চলিবে না। শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুতে উপরোক্ত প্রমাণগুলি ঠিক খাটিয়া গিয়াছে বলিয়া যে ঐগুলি প্রক্ষিপ্ত বলিতে হইবে তাহার কোন কারণ নাই, "যে হিন্দুসমাজ ষষ্ঠী, মাকাল প্রভৃতি তেত্রিশ কোটী দেবতাকে ভজনা করিয়া আসিতেছে, সেই—ভগবদবতার-বিশ্বাসী শিক্ষিত হিন্দুসমাজ কখনও এমন সুন্দর প্রমাণ দ্বারা সুসংস্থাপিত ঠাকুরকে অবতার বলিয়া গ্রহণ করিবে না এ কথা কখনও বিশ্বাস হয় না।

উপেক্ষা-নিদ্রায় নিদ্রিত থাকিয়া আমরা যদি এমন সোণার ঠাকুরকে না চিনি—তাহা হইলে নিতান্তই আমাদের দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে। আর এক কথা—স্বতঃসিদ্ধ ভাবেই হউক আর আনুমানিক প্রমাণ প্রভাবেই হউক যদি শ্রীগৌরাঙ্গের অবতার প্রকৃত বলিয়া বোধ হয়, তাহা হইলে তো প্রমাণ বচনগুলিও প্রকৃত বলিয়া মানিতে কোন বাধা থাকিবে না? আর যদি অবতারকেই মিথ্যা বলিয়া মনে হয় তাহা হইলে প্রমাণগুলি যে প্রক্ষিপ্ত তাহা মনে হওয়া ত স্বাভাবিক। কিন্তু অবতারত্বে বিশ্বাস হইলে প্রমাণ গুলি বিশ্বাস করিব নতুবা নয় এ যেন ঠিক "সাঁতার শিখিয়া তবে জলে নামিব বা রোগ মুক্ত হইয়া ঔষধ সেবন করিব" এই প্রতিজ্ঞার মত অদ্ভুত।

কোন মহাত্মা বলিয়া ছিলেন—"পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের বহু সুকৃতি থাকিলে

বিশ্বাস আসে," যদি সে সৌভাগ্য কাহারও না থাকে তাহাকে শাস্ত্রীয় প্রমাণ, মহাজনগণের বাক্য ও তাৎকালিক অবস্থা বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে যে, নিজ মতের সহিত তাহার মিল আছে কি না, অথবা বিপক্ষবাদীর মতের পরিপোষক প্রমাণাদি দ্বারা নিজ মত খণ্ডিত হইয়া যায় কি না।

ভাই তার্কিক! শ্রীগৌরাঙ্গ অবতারে পূর্ণ বিশ্বাস-প্রতিপাদক যে সকল প্রমাণ উপরে দেখান হইল তুমি তাহার বিরুদ্ধে প্রমাণ উত্থাপন করিয়া নিজমত স্থাপনের চেষ্টা কর, যদি তাহাতে কৃতকার্য্য না হও তবে অবশ্যই তোমাকে অবনত মস্তকে স্বীকার করিতে হইবে যে, উক্ত বচনগুলি প্রকৃত এবং শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুও স্বয়ং ভগবান। ভাই তার্কিক, আজ যে প্রমাণ তুমি মানিতে চাওনা, অবিশ্বাসীর বিশ্বাস স্থাপন পক্ষে তর্কস্থলে উহাই যে অবতারত্ব প্রতিপাদক। আপ্তবাক্য বা শাস্ত্রীয় প্রমাণ তোমার কাছে উপেক্ষণীয় হইতে পারে না, কেননা তুমি যে ভগবানের অসংখ্য অবতার বিশ্বাসী হিন্দু, তোমারই পূর্ব্ব পুরুষ বলিয়া গিয়াছেন—"অবতারোহ্যসংখ্যেয়া।"

যদিও তর্কেদ্বারা প্রতিপাদ্য বিষয়ের নির্ণয় হয় না বলিয়া শাস্ত্রকারগণ বলিয়া থাকেন তথাপি এই বিজ্ঞান-বহুলযুগে—যুক্তি তর্কেরযুগে "অতএব" 'যদি" "অথবা" "কিন্তু" "পরন্তু" প্রভৃতির যুগে কোন বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপনের পূর্ব্বে তাহার স্পষ্ট ও প্রকৃষ্টরূপে আলোচনা হওয়া ভাল। তুমি তোমার তর্কবরণোপযোগী শাস্ত্র সিন্ধু লইয়া তোমার বুদ্ধিরূপ দণ্ড দ্বারা মন্থন করিয়া দেখ কোনরূপ সুধা উঠে কিনা, কিন্তু এটা ঠিক মনে রাখিও যে, উৎকৃষ্ট মিষ্টান্ন তুমি অন্ধকারে বসিয়াই খাও আর আলোকে বসিয়াই খাও মিষ্ট লাগিবেই; প্রমাণ—পরীক্ষা, বিচার, বিতর্ক প্রভৃতি যদিও ভক্তির বাধক বলিয়া শাস্ত্রকারগণ কীর্ত্তন করিয়াছেন তথাপি এই "কিন্তু"র যুগে উহা অপরিহার্য্য ভক্তকেও এ যুগে ভক্তিরজ্জু শক্ত করিয়া ধরিয়া প্রতিবাদির সহিত তর্ক করিতে হয়।

ক্রমশঃ

শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র পুরী

(২)

প্রভু অনেক সময় মাধবেন্দ্রের আখ্যান ভক্তগণকে শুনাইতেন। একদা মাধবেন্দ্র শ্রীগোবর্দ্ধন পর্ব্বত পরিক্রমণ এবং গোবিন্দকুণ্ডে স্নান করিয়া এক বৃক্ষ-মুলে ভগবৎ প্রেমে বিভোর হইয়া বসিয়া আছেন। আহারের চেষ্টা মাত্র নাই। কিন্তু ভক্তের ভগবান ভক্তের নিমিত্ত সদাই ব্যস্ত। তিনি স্বীয় "অহমাহং" শ্লোকের সাক্ষ্য দিতে অতি সত্বর এক অভিনব এবং অতি সুন্দর গোপ বালকের মূর্ত্তি পরিগ্রহ পূর্ব্বক, এক ভাণ্ড দুগ্ধ লইয়া তথায় আগমন করিলেন। আর মধুর হাস্য করিয়া পুরী গোসাঞিকে বলিলেন,—"তুমি কি চিন্তা করিতেছ, ভিক্ষা এবং আহার করনা কেন? নাও এই দুগ্ধ পান কর।" এই প্রিয়-দর্শন বালকটীকে দেখিয়া এবং ততোধিক তাহার মধুর বাক্য শুনিয়া তাঁহার ক্ষুধা তৃষ্ণা দূরে গেল। তিনি বিস্ময়োৎফুল্ল লোচনে, শিশির-সুস্নিগ্ধ নব প্রভাতের তরুণ অরুণ আলোকবৎ বালকটীর পানে তাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎস, তুমি কে? তোমার নিবাস কোথা? আমি যে উপবাস করি একথা তুমি কিরূপে জ্ঞাত হইলে?" বালক তখন সুধা-স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলিতেছেন, —"আমি জাতিতে গোয়ালা, এই স্থানে আমি বাস করি। আমার গ্রামে কেহ উপবাসী থাকিতে পারে না। সকলেই স্বীয় স্বীয় আহার্য্য আহরণ করিয়া লয়। আর যে তাহা পারেনা আমি তাহার গৃহে খাদ্য দ্রব্য বহন করিয়া দিয়া আসি।" (অযাচক জনে আমি দিয়ে ত আহার। চৈঃ চঃ মধ্যলীলা।) আবার কপট করিয়া বলিতেছেন।—"স্ত্রীলোকেরা জল লইতে আসিয়াছিল। তাহারা তোমাকে উপবাসী দেখিয়া আমাদ্বারা দুগ্ধ পাঠাইয়া দিল। আমাকে গাভী দোহন করিতে হইবে সুতরাং চলিলাম। তুমি এই দুগ্ধ পান কর, আমি ভাণ্ড লইতে আবার আসিব।" বলিতে বলিতে বালকরূপী শ্রীভগবান দূরে অন্তর্হিত হইয়া গেলেন। মাধবেন্দ্র ইহাতে অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন। দুগ্ধ পান করিয়া সোৎসুকনেত্রে বালকের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু বালক আর আসিলেন না। অনন্তর তিনি বসিয়া বসিয়া নাম জপ করিতে লাগিলেন। আমরা জানি লীলাশুক মহাশয়কেও শ্রীভগবান এইরূপে বালকবেশে দর্শন দিয়া দুগ্ধ পান করাইয়া ছিলেন। অহো! মাধবেন্দ্রপুরীর কি সৌভাগ্য!

"বসি নাম লয় পুরী নিদ্রা নাহি হয়।
শেষ রাত্রে তন্দ্রা হৈল বাহ্যবৃত্তি লয়॥"

তিনি নিদ্রিত হইয়া স্বপ্ন দেখিতেছেন সেই বালক একটা কুঞ্জ-মধ্য হইতে বহির্গত হইয়া তাঁহাকে বলিতেছেন—'আমার সহিত আইস'—এই বলিয়া তাঁহার হস্ত ধারণ করিয়া একটী কুঞ্জের মধ্যে লইয়া গেলেন আর বলিতে লাগিলেন—"দেখ আমি এই কুঞ্জেতেই থাকি, শীতাতপ, বারিধারা ও দাবাগ্নিতে আমি কাতর হই, গ্রামের লোকের সাহায্যে আমাকে এই কুঞ্জ হইতে বাহির করিয়া এই পর্ব্বতের উপর একটা মঠ স্থাপন করিয়া তুমি আমার সেবা প্রকাশ কর। বহুদিন আমি স্নান করিনাই, তুমি শীতল জলে আমাকে স্নান করাইও। দেখ, বহুদিন হইতে আমি তোমার প্রতীক্ষা করিতেছি যে কবে আমার প্রিয় মাধব আসিয়া আমার সেবা-করিবে, তোমার প্রেমে বশীভূত হইয়া আমি তোমার সেবা অঙ্গীকার করিতেছি—আর তখন জগদ্বাসী আমাকে দর্শন করিয়া উদ্ধার হইতে পারিবে, আমি সেই বৃন্দারণ্য বিহারী নন্দনন্দন, বজ্র * আমাকে স্থাপন করিয়াছিল। পূর্ব্বে আমি পর্ব্বতের উপরেই ছিলাম কিন্তু আমার সেবক ম্লেচ্ছভয়ে আমাকে এই কুঞ্জের মধ্যে লুকাইয়া রাখিয়া পলাইয়া গিয়াছে, আর সেই হইতে আমি এই স্থানেই আছি। তুমি আসিয়াছ, ভাল হইয়াছে, আমাকে সাবধানে এই কুঞ্জ হইতে বাহির কর।" এই বলিয়া বালক অন্তর্হিত হইলেন। তখন মাধবেন্দ্র পুরীর নিদ্রা ভঙ্গ হইয়াছে, তিনি দুঃখিত হইয়া ভাবিতেছেন—"হায়! আমি কৃষ্ণকে দেখিয়াও চিনিতে পারিলাম না।" আর প্রেমাবেশে ভূমিতে পড়িয়া রোদন করিতে লাগিলেন। তাঁহার নয়ন যুগল হইতে প্রবল বেগে বারিধারা বিগলিত হইতে লাগিল।

তখন ভোর হইয়াছে। তিনি চেষ্টা করিয়া স্বীয় ভাব সংবরণ করিলেন, যেহেতু প্রভুর আজ্ঞা পালন করিতে হইবে। পরে স্নান করিয়া আসিয়া গ্রামবাসিগণকে বলিলেন—"দেখ তোমাদের ঈশ্বর সেই গোবর্দ্ধনধারী শ্রীহরি, কুঞ্জের মধ্যে আছেন, চল সকলে মিলিয়া তাঁহাকে বাহির করিয়া আনি। কিন্তু কুঞ্জমধ্যে প্রবিষ্ট হইবার পথ নাই—চারিদিকে নিবিড় বন। লোক সকলে আনন্দিত মনে কুঠার কোদালি প্রভৃতি লইয়া আসিল, আর তদ্দ্বারা পথ প্রস্তুত করিয়া

* ইনি শ্রীকৃষ্ণের প্রপৌত্র। প্রদ্যুম্ন-তনয় অনিরুদ্ধের ঔরসে এবং রুক্মীর পৌত্রী সুভদ্রার গর্ভে ইঁহার জন্মহয়। যদুবংশ ধ্বংস হইলে পর অর্জ্জুন ইঁহাকে ইন্দ্রপ্রস্থে লইয়া যান এবং তথাকার রাজ পদে প্রতিষ্ঠিত করেন। ইহার পুত্রের নাম প্রতিবাহু। (লেখক)

তাঁহারা কুঞ্জ মধ্যে প্রবেশ করিলেন, দেখেন প্রকৃতই তাঁহাদের—সেই গোবর্দ্ধন ধারী শ্রীহরি—মাটী—তৃণ প্রভৃতির দ্বারা আচ্ছাদিত হইয়া অবস্থান করিতেছেন; সকলে আনন্দ ও বিস্ময়ে অভিভূত। কাহারও মুখদিয়া কথা বাহির হইতেছে না, তখন আচ্ছাদন দূরীভূত করিয়া, বলবান লোকগণের সাহায্যে, ঠাকুরকে পর্ব্বতোপরি লইয়া যাওয়া হইল। প্রকাণ্ড ঠাকুর, তাঁহাকে তদুপযুক্ত এক প্রকাণ্ড সিংহাসনের উপর বসাইয়া, পৃষ্ঠে—এক বড় পাথর অবলম্বন দেওয়া হইল নয় শত নূতন ঘট আসিল, গ্রাম্য ব্রাহ্মণেরা সেই নূতন ঘটদ্বারা গোবিন্দ কুণ্ড হইতে জল আনিলেন। নানা রকম বাদ্য বাজিতেছে, স্ত্রীলোকেরা গান গাহিতেছে, আবার কেহ বা নৃত্য করিতেছে। এইরূপে মহা মহোৎসব হইল। দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, পুষ্প বস্ত্র প্রভৃতি—যে কত আসিয়াছিল তাহার ইয়ত্তা ছিল না। অভিষেক কার্য্য আরম্ভ হইল। মাধবপুরী নিজ হস্তে ঠাকুরের অভিষেক করিলেন। প্রথমে গাত্র ধৌত করিয়া অঙ্গ-ময়লা দূর করা হইল; বহু তৈল দ্বারা শ্রীঅঙ্গ চিক্কন করা হইল। পঞ্চগব্য ও পঞ্চামৃত স্নান করাইয়া তাঁহার অঙ্গে শতঘট জল ঢালা হইল। পুনরায় তৈল মাখাইয়া গন্ধোদকে স্নান সমাপ্ত হইল। সূক্ষ্ম বস্ত্র দ্বারা শ্রীঅঙ্গ মার্জ্জন করিয়া বস্ত্র, চন্দন, তুলসী, পুষ্পমাল্য প্রভৃতি পরাইয়া দিলেন। পুরী গোস্বামী প্রাণের সহিত ভক্তি করিয়, দধি দুগ্ধ, সন্দেশ—প্রভৃতি যাহা কিছু আসিয়াছিল তদ্বারা—ঠাকুরের আরতি করিলেন এবং দণ্ডবৎ হইয়া নিজকে সমর্পণ করিয়া দিলেন। গ্রামের লোক—তাঁহাদের যত—তণ্ডুল, দাল ও গোধূম চূর্ণ ছিল সমস্তই আনিয়া পর্ব্বত পূর্ণ করিয়াছিল। কুমারের ঘরে যত মৃৎপাত্র ছিল সমস্তই আসিল। প্রাতঃকালে গ্রাম হইতে দশজন ব্রাহ্মণ আসিয়া রন্ধন চড়াইয়া দিলেন। এই রন্ধন যে কত রকমের এবং তাহার পরিমাণ যে কত—আমরা তাহার বর্ণনা করিতে অক্ষম। এই রাশি রাশি—অন্ন ব্যঞ্জন। নববস্ত্রের উপর পলাশের পত্র রাখিয়া তদুপরি স্থাপিত লইল। অন্নের পাশে রক্ষিত রুটীর রাশি রহিয়াছে দেখিয়া বোধ হইল যেন পর্ব্বতের পার্শ্বে উপপর্ব্বত স্থাপিত হইয়াছে। আর,—

"তার পাশে দধি দুগ্ধ মাঠা শিখরিনী।
পায়স মথনী সর পাশে ধরি আনি॥
হেন মতে অন্নকূট করিল সাজন।
পুরী গোসাঞি গোপালেরে কৈল সমর্পণ॥

অনেক ঘট ভরি দিল সুশীতল জল।
বহুদিনের ক্ষুধা গোপাল খাইল সকল॥
যদ্যপি গোপাল সব অন্ন ব্যঞ্জন খাইল।
তাঁর হস্ত স্পর্শে অন্ন পুনঃ তৈছে হৈল॥
ইহা অনুভব কৈল মাধব গোসাঞি।
তাঁর ঠাই গোপালের লুকান কিছু নাঞি॥"

চৈঃ চঃ

তখন পুরী গোস্বামীর আদেশে ব্রাহ্মণগণ গ্রামবাসী আবালবৃদ্ধবনিতা-গণকে প্রসাদ ভুঞ্জাইলেন। পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম সমূহ হইতে যাহারা গোপাল দর্শনে আসিয়াছিল তাহারাও প্রসাদ খাইয়া গেল। পুরীর অপূর্ব্ব প্রভাবে সকলেই চমৎকৃত হইল। আর তাঁহার সঙ্গ গুণে সকলেই বৈষ্ণব হইল। পুরী গোস্বামী সমস্ত দিনই উপবাসী ছিলেন, রাত্রে ঠাকুরকে শয়ন করাইয়া কিছু দুগ্ধ পান করিলেন। মহোৎসব কার্য্য এই একদিনে সম্পূর্ণ হইল না। প্রত্যহই চলিতে লাগিল। পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম সমূহ হইতে এক এক দিন এক এক গ্রামের লোক আসিয়া মহোৎসব করিয়া যাইতে লাগিল। ইহা ব্যতীত নানা দূরদেশের লোক, গোপাল প্রকট হইয়াছেন শুনিয়া নানাদ্রব্য লইয়া আসিতে লাগিলেন। গোপাল যে ব্রজবাসিগণের প্রাণ, সেই গোপালের আবির্ভাবে তাঁহারা যেন নবজীবন লাভ করিল। গোপালেরও ব্রজবাসিগণের প্রতি কত স্নেহ তাহা কি বলিবার? এক কথায় উভয়ে উভয়ের ভালবাসার বন্ধু।

মথুরায় বড় বড় ধনীর বাস। তাঁহারা ভক্তি করিয়া নানা দ্রব্য ঠাকুরকে দিয়া যাইতেছেন। 'স্বর্ণ, রৌপা, বস্ত্র, গন্ধ—ভক্ষ্য' প্রভৃতি নিত্য অসংখ্য আসিতেছে। এইরূপে ক্রমশঃ গোপালের সুন্দর মন্দির, পাক গৃহ, চারি দিকে সুউচ্চ প্রাচীর প্রভৃতি নির্ম্মিত হইল। ব্রজবাসিগণ সকলেই গোপালকে গাভী দিয়াছে, তাহাতে তাঁহার সহস্র সহস্র গাভী হইয়াছে, এখন গোপালের রাজার ন্যায় সেবা চলিতেছে, মাধব পুরীর তাহাতে বড়ই আনন্দ। ইহার মধ্যে গৌড়দেশ হইতে দুইজন বৈরাগী ব্রাহ্মণ আসিয়াছিলেন, মাধব তাঁহাদিগকে শিষ্য করিয়া সেবার ভার দিয়াছেন। অনুষ্ঠানের আর কোন দিকে কোনরূপ ত্রুটী নাই।

এইরূপে দুই বৎসর অতীত হইয়া গেলে, একদিন পুরী গোস্বামী স্বপ্ন

দেখিলেন, ঠাকুর বলিতেছেন, "গোসাঞি, আমার দেহ শীতল হয় না, তুমি নীলাচল হইতে সুগন্ধি মলয়জ চন্দন আনিয়া আমার অঙ্গে লেপন কর। পরন্তু একার্য্যের ভার অন্যের উপর না দিয়া তুমি স্বয়ংই করিবে।" তিনি ঠাকুরের প্রত্যাদেশ বাণী অবগত হইয়া পরমানন্দ মনে গৌড়দেশ দিয়া নীলাচলাভিমুখে যাত্রা করিলেন। এই সময়েই কয়েক দিবসের জন্য তিনি শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈত-ভবনে আতিথ্য স্বীকার করিয়াছিলেন, এবং অদ্বৈত প্রভু তাঁহার অলৌকিক কৃষ্ণপ্রেম দর্শন পূর্ব্বক সাতিশয় চমৎকৃত হইয়া, তাঁহার নিকট দীক্ষিত হইয়া ধন্য হন।

নানা তীর্থভূমি অতিক্রম করিয়া গোস্বামী আবার চলিতে লাগিলেন। পথে রেমুনাতে গোপীনাথ দর্শন করিতে গেলেন। গোপীনাথের অঙ্গ-মাধুরীর তুলনা হয় না। তিনি দেখিয়া মোহিত হইলেন। ঠাকুরের সম্মুখে আনন্দাবেশে বহুক্ষণ নৃত্য গীত করিলেন, এবং পরে জগমোহনে বসিয়া গোপীনাথের ভোগের বিবরণ জানিবার জন্য উৎসুক হইলেন; দেখিলেন ঠাকুরকে যে সমস্ত ভোগ দেওয়া হয় তাহা অতি উত্তম। মনে মনে সংকল্প করিলেন যে, তিনি শ্রীগোপালকেও ঐরূপ ভোগের বন্দোবস্ত করিয়া দিবেন। সন্ধ্যাকালে অমৃতকেলি নামক ক্ষীর ভোগ দেওয়া হয়। অপর কোন দেবমন্দিরে ঐ রূপ ভোগের বন্দোবস্ত নাই। যথাকালে নিয়ম মত বার থানি ক্ষীর ভোগ দেওয়া হইল। এই যে ভুবন বিখ্যাত ক্ষীর, ইহার আস্বাদ কিরূপ তাহা জানিবার জন্য গোসাঞির মনে বাসনা জন্মিল, ইচ্ছা এই যে ইহার তথ্য অবগত হইয়া তাঁহার ঠাকুরের জন্য—এই মত ভোগের বন্দোবস্ত করিবেন। কিন্তু মনোমধ্যে এই লোভের উদয় হওয়ায় তিনি লজ্জিত হইলেন, কাহাকেও কিছু বলিলেন না।

"অযাচিত বৃত্তি পুরী বিরক্ত উদাস।
অযাচিত পাইলে খান, নহে উপবাস॥
প্রেমামৃতে তৃপ্ত—ক্ষুধা তৃষ্ণা নাহি বাধে।
ক্ষীরে ইচ্ছা হৈল তাহে মানে অপরাধে॥"

চৈঃ চঃ

লজ্জিত হইয়া মন্দির হইতে কিঞ্চিৎ দূরে, গ্রামের শূন্য হাটে গমন করিয়া ভুবন মঙ্গল নাম কীর্ত্তনে রজনী অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। এদিকে ভোগ দিয়া পুজারী শয়ন করিয়াছেন, এমন সময় ঠাকুর তাঁহাকে স্বপ্নে বলিতেছেন,—

"উঠ, আমার নিচোল-বস্ত্র-মধ্যে একখানি ক্ষীর লুকাইয়া রাখিয়াছি, তোমরা আমার মায়ায় তাহা জানিতে পার নাই। ইহা লইয়া তুমি বাজারে যাও, দেখিবে মাধবেন্দ্র পুরী নামক জনৈক সন্ন্যাসী নাম-কীর্ত্তনে নিশি যাপন করিতেছেন, তিনি আমার প্রিয়জন তাঁহাকে দাও।" পূজারী তাঁহার দেবতার আদেশবাণী অবগত হইয়া, আনন্দে অবশ-চিত্ত হইলেন, এই অপূর্ব্ব ভক্ত প্রবরকে দেখিবার জন্য বলবতী বাসনা জন্মিল। তিনি ঠাকুরের ধড়ার অঞ্চল লুক্কায়িত ক্ষীর খানি লইয়া গমন করিলেন, এবং মাধবেন্দ্রকে তল্লাস করিয়া তাঁহার সম্মুখে উহা স্থাপন করিলেন আর বিনীত ভাবে প্রণাম পূর্ব্বক বলিলেন "গোসাঞে! আমাদের মুরলীধারী গোপীনাথ আপনার নিমিত্ত এই ক্ষীর চুরি করিয়া ধড়ার অঞ্চল মধ্যে লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন, এক্ষণে আমার দ্বারা প্রেরণ করিয়াছেন, আপনি আস্বাদ করিয়া ধন্য হউন।

ঠাকুর তাঁহার ভক্তের নিমিত্ত ক্ষীর চুরি করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাই সেই দিন হইতে তাঁহার নাম হইল "ক্ষীর-চোরা গোপীনাথ।"

শ্রীগৌর-ভগবান নীলাচলে গমন করিবার সময়, এই রেমুনাতে আসিয়া ঠাকুরের এই ক্ষীর চুরির ঘটনা অতীব আনন্দের সহিত তাঁহার ভক্তগণের নিকট বিবৃত করিয়াছিলেন। এইস্থানে আমি ভক্তবর শিশির বাবুর গ্রন্থ হইতে কিছু উদ্ধৃত করিয়া প্রিয় পাঠকবর্গকে উপহার দিব।—

"ঠাকুর গোপীনাথ দ্বিভুজ মুরলীধর, প্রভু এই প্রথম দ্বিভুজ মুরলীধর মূর্ত্তি আপনি দেখিলেন ও ভক্তগণকে দেখাইলেন।

"এ কথার তাৎপর্য্য অতি সংক্ষেপে বলিতেছি। প্রভু প্রকাশ হইয়াই দ্বিভুজ মুরলীধর-ধ্যান শিক্ষা দিতে লাগিলেন। তাহার মানে এই যে, তখন সকলে শ্রীকৃষ্ণকে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী চতুর্ভুজ রূপে ধ্যান করিতেন। এখন প্রভু শ্রীভগবানের মাধুর্য্য ভাব শিক্ষা দিবার নিমিত্ত অবতীর্ণ। মাধুর্য্য ভজন এই যে, শ্রীভগবানকে নিজ-জনরূপে অর্থাৎ পতি, পুত্র প্রভৃতি রূপে ভজনা করা। সেই ভগবান যদি চারি-হস্ত সম্পন্ন রহিলেন, তবে তাঁহাকে পতি কি পুত্র বলিতে জীবের সাহস হইবে কেন? মুখে বলিলে ত হইবে না? অন্তরে, একজন চারি-হস্ত সম্বলিত শঙ্খ চক্র প্রভৃতি ধারী পুরুষকে, কোন স্ত্রী কি পুরুষই নির্ভয়ে পতি কি পুত্র কি সখা বলিতে পারেন না। সুতরাং মাধুর্য্য ভজন করিবার অগ্রে শ্রীভগবানের দু'খানি হাত ফেলিয়া দিতে হয়। আর যে দু'খানি রহিল তাহাতে এমন কোন বস্তু দিতে হইবে যাহা মনোহর ও মনুষ্য ব্যবহার উপযোগী।

অর্থাৎ প্রভু বৃন্দাবনের শ্রীনন্দনন্দনের ভজনা উপদেশ দিতে লাগিলেন। শ্রীনন্দেরনন্দন ত চতুর্ভুজ নহেন? তাহা হইলে নন্দ তাঁহাকে দিয়া কিরূপে মাথায় বাধা বহাইবেন, কিম্বা যশোদা তাঁহাকে বন্ধন করিবেন? শ্রীনন্দের নন্দন দ্বিভুজ মুরলী ধর, আর প্রভু মাধুর্য্য ভজনের নিমিত্ত এইরূপ ঠাকুরের ধ্যান দিতে লাগিলেন।

প্রভুর ভক্তগণ অবশ্য প্রভুর এইন্যায় সঙ্গত কথা বলিবামাত্র গ্রহণ করিলেন কিন্তু যাঁহারা বাহিরের লোক, তাঁহারা তর্ক উঠাইতে লাগিলেন। তাঁহাদের আপত্তি এই যে, যদি দ্বিভুজ মুরলীধর শ্রীকৃষ্ণ ধ্যানের বস্তু হইলেন, তবে প্রাচীন এরূপ মূর্ত্তি নাই কেন? ভক্তগণ একথায় উত্তর দিতে পারিলেন না। কিন্তু রেমুনার গোপীনাথ বহুদিনের প্রাচীন মূর্ত্তি। আর তিনি দ্বিভুজ মুরলী-ধর। তাই প্রভু, ভক্তগণ সম্বলিত বনপথ ছাড়িয়া, রাজপথে রেমুনায় গোপীনাথকে দর্শন করিতে আইলেন।

"এই ঠাকুর উদ্ধব কর্তৃক বারাণসী নগরে স্থাপিত হইয়াছিলেন, পরে তিনি রেমুনাতে আসিয়া বাস করেন। শ্রীগৌরাঙ্গ সেই কথা স্মরণ করিয়া "উদ্ধব" "উদ্ধব" বলিয়া আর্ত্তনাদ করিতে করিতে তাঁহার অগ্রে আইলেন। আসিয়া প্রথমে "উদ্ধবের ঠাকুর" বলিয়া অঞ্জলি বদ্ধ করিয়া মস্তক স্পর্শ করিয়া, শ্রীগোপীনাথকে প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন, পরে প্রদক্ষিণ করিতে করিতে নৃত্য আরম্ভ করিলেন। যথা চৈতন্য মঙ্গলে—

"উদ্ধব" "উদ্ধব" ডাকে আর্ত্তনাদে।
প্রেমায় বিহ্বলে প্রভু ভূমে পড়ি কান্দে॥
অরুণ নয়নে জল ঝরে অনিবার।
পুলকে ভরল অঙ্গ কম্প বারে বার॥

ভক্তগণ যত্ন করিয়া প্রভুকে বিশ্রাম করাইলেন। প্রভু বসিলেন আর সকলে বসিয়া মনসুখে কৃষ্ণ কথা কহিতে লাগিলেন। প্রভু বলিলেন—"এই যে ঠাকুর, ইনি একবার ভক্তের নিমিত্ত ক্ষীর চুরি করিয়া ছিলেন, তাই ইঁহার নাম ক্ষীর চোরা গোপীনাথ হইয়াছে।" ভক্তগণ ইহাতে সে কাহিনী শুনিতে চাহিলে উহারে প্রভু যাহা বলিলেন আমরা সে ঘটনা ইতিপূর্ব্বেই বিবৃত করিয়াছি।

অতএব মাধবেন্দ্রের কথা, যাহা মহাপ্রভু স্বয়ং বলিতে গিয়া কত আনন্দ পাইতেন—সেই জগদ্বরেণ্য ভক্তশ্রেষ্ঠের কথা আমরা কি বলিতে জানি। শ্রীগৌরাঙ্গ যাঁহার শিষ্যের নিকট দীক্ষিত হইয়াছিলেন সেই মাধবেন্দ্রের প্রতি

কথা স্মরণ করিতে গিয়া, আমাদের চিত্ত কি এক অভূত পূর্ব্ব আনন্দাবেশে মুগ্ধ হইয়া পড়ে।

আমরা বলিতেছিলাম, মাধবেন্দ্র ঠাকুরের নিকট হইতে এক খানি ক্ষীর উপহার পাইলেন। ঠাকুরের প্রেমে ও কারুণ্যে তাঁহার চিত্ত দ্রবীভূত হইল। তিনি ক্রন্দন করিতে লাগিলেন. আর দু'টী হাত যোড় করিয়া সেই মহাপ্রসাদের স্তব করিলেন। আস্বাদ করিয়া দেখিলেন, উহা একেবারে অমৃত। ক্ষীর টুকু খাইলেন আর পাত্রটী টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া বহির্ব্বাসে বাঁধিয়া লইলেন—পরে সে গুলিও আস্বাদ করিয়া দেখিবেন—ঠাকুরের স্বহস্তের উপহার কিছুই ফেলা যাইতে পারেনা।

ক্রমশঃ রজনী প্রভাতা হইয়া আসিতেছে, তিনি ভাবিলেন,—ঠাকুর আমার জন্ম ক্ষীর চুরি করিয়া ছিলেন,—একথা লোকে যখন শুনিবে, তখন আমার নিকট লোক-সংঘট্ট হইবে।

"এই ভয়ে রাত্রিশেষে চলিলা শ্রীপুরী।
সেই স্থানে গোপীনাথে দণ্ডবৎ করি॥
চলি চলি আইলা পুরী—শ্রীনীলাচল।
জগন্নাথ দেখি প্রেমে হইলা বিহ্বল॥
প্রেমাবেশে উঠে পড়ে হাসে নাচে গায়।
জগন্নাথ দরশনে মহাসুখ পায়॥" চৈঃ চঃ

তখন চারি-দিকে সাড়া পড়িয়া গেল, মাধবপুরী আসিয়াছেন। চতুর্দ্দিকে জনতার সৃষ্টি হইল। দলে দলে লোক আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম পূর্ব্বক বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইল। ইহাতে তিনি কিরূপ লজ্জিত ও ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন তাহা সহজেই অনুমেয়।

"প্রতিষ্ঠার স্বভাব এই জগতে বিদিত।
যে নাবাঞ্ছে—তার হয় বিধাতা নির্ম্মিত॥
প্রতিষ্ঠার ভয়ে পুরী গেলা পলাইয়া।
কৃষ্ণ-প্রেম সঙ্গে প্রতিষ্ঠা চলে লাগ লৈয়া॥
যদ্যপি উদ্বেগ হৈল পলাইতে মন।
ঠাকুরের চন্দন সাধন হইল বন্ধন॥"

তিনি কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া, শ্রীজগন্নাথের সেবকগণকে—গোপালের আদেশ জানাইয়া চন্দন প্রার্থনা করিলেন। সেবকগণ ইহাতে আপনাদিগকে—কৃতার্থ

স্নান করিলেন এবং রাজ কর্ম্মচারীদিগকে বলিয়া প্রচুর পরিমাণে কর্পূর ও চন্দন সংগ্রহ করিয়া দিলেন। অধিকন্তু পথের সম্বল সহ এক ব্রাহ্মণ ও ভৃত্য সঙ্গে দিয়া দিলেন। এবং—

"ঘাটী দানী ছাড়াইতে রাজ পাত্র দ্বারে।
রাজলেখা করি দিল পুরী গোসাঞির করে॥"

প্রত্যাবর্ত্তন পথে, তিনি রেমুনাকে আসিয়া গোপীনাথকে প্রণাম করিলেন। গোপীনাথের সেবকগণ তাঁহাকে বহু সম্মান করিয়া ভোগের ক্ষীর প্রসাদ দিয়া তাঁহাকে ভিক্ষা করাইলেন। রাত্রে সেই দেবালয়ে শয়ন করিয়া আছেন, শেষ রাত্রে তাঁহার গোপাল আসিয়া তাঁহাকে বলিতেছেন,—"মাধব! এই যে গোপীনাথ, ইনি আমার অভিন্ন কলেবর, চন্দনাদি ইহাঁকেই অর্পণ কর, তাহাতেই অমার পাওয়া হইবে। আমার কথা শুন, বিশ্বাস করিয়া গোপীনাথকে চন্দন পরাও, আমার বাক্যে দ্বিধা করিওনা।" এই বলিয়া গোপাল তাঁহার স্বপ্ন-পথ হইতে অন্তর্হিত হইলে তিনি জাগ্রত হইয়া, গোপীনাথের সেবকগণকে ডাকাইয়া গোপালের আদেশ শুনাইলেন, বলিলেন,—গোপাল বলিয়াছেন—"এই চন্দন নিত্য গোপীনাথের শ্রীঅঙ্গে লেপন কর. তাহাতেই আমার দেহ শীতল হইবে।' তিনি স্বতন্ত্র ঈশ্বর, তাঁর প্রবল আজ্ঞা কে লঙ্ঘন করিবে।" গোপীনাথ শ্রীঅঙ্গে চন্দন পরিবেন, শুনিয়া সেবকগণ বড়ই আনন্দিত হইলেন, যেহেতু তখন গ্রীষ্মকাল। পুরী বলিলেন, "আমার সঙ্গের এই দুইজন লোক চন্দন ঘসিবে। আপনারা আরও দুইজন লোক সংগ্রহ করিয়া দিউন, আমি তাহাদের বেতন দিব।" এই মত চারিজন লোকে প্রত্যহ চন্দন ঘসিয়া দিত এবং সেবকগণ তাহা ঠাকুরের শ্রীঅঙ্গে লেপন করিয়া দিতেন। এইরূপে প্রতি দিন ঠাকুরকে চন্দন পরান হইত, আর যতদিন না তাহা শেষ হইয়াছিল, ততদিন পুরী সে স্থান ত্যাগ করেন নাই। গ্রীষ্মকাল অন্তে, তিনি পুনরায় নীলাচলে ফিরিয়া গিয়া, চারিমাস তথায় অবস্থান করিয়াছেন। এখন তাঁহার প্রেমের পরাকাষ্ঠা অনুভব করুন।

এই যে অতি মধুর মাধবেন্দ্র চরিত, ইহা প্রভু গোপীনাথের মন্দিরে বসিয়া—ভক্তগণকে শুনাইয়াছিলেন। তাহা আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি।

"প্রভু কহে—নিত্যানন্দ করহ বিচার।
পুরী সম ভাগ্যবান জগতে নাহি আর॥
দুগ্ধদান-ছলে কৃষ্ণ যাঁরে দেখা দিল।

তিনবার স্বপ্নে আসি যাঁরে আজ্ঞা কৈল ॥
যার প্রেমে বশ হঞা প্রকট হইলা।
সেবা—অঙ্গিকার করি জগৎ তারিলা ॥
যাঁর লাগি গোপীনাথ ক্ষীর চুরি কৈল।
কর্পূর চন্দন যাঁর অঙ্গে চড়াইল ॥
ম্লেচ্ছ দেশে কর্পূর চন্দন আনিতে জঞ্জাল।
পুরী দুঃখ পাবে—ইহা জানিঞা গোপাল ॥
মহাদয়াময় প্রভু ভকত বৎসল।
চন্দন পরি' ভক্তশ্রম করিল সকল ॥
পুরীর প্রেম-পরা কাষ্ঠা করহ বিচার।
অলৌকিক প্রেম—চিত্তে লাগে চমৎকার ॥
পরম বিরক্ত মৌনী—সর্ব্বত্র উদাসীন।
গ্রাম্য বার্ত্তাভয়ে দ্বিতীয় সঙ্গ হীন ॥"

এমন যে লোক, তিনি গোপালের "আজ্ঞামৃত" প্রাপ্ত হইয়া, এই যে বহু দূর দেশ এখানে দ্বিধা-শূন্য চিত্তে চলিয়া আসিলেন। পথে ক্ষুধায় কাতর হইয়াও কাহার নিকট কিছু চাহিতেন না। এমনই তাঁহার অযাচিত বৃত্তি, আর এমনই তাঁহার অলৌকিক প্রেম।

"মনেক চন্দন তোলা বিশেক কর্পূর।
গোপালে পরাইব—এই আনন্দ প্রচুর ॥
উৎকলের দানী রাখে চন্দন দেখিয়া।
তাহাঁ এড়াইলা রাজপত্র দেখাইয়া ॥
ম্লেচ্ছ দেশ—দূর পথ—জগাতি অপার।
কেমনে চন্দন নিব ?—নাহি এবিচার ॥
সঙ্গে এক বট নাহি ঘাটি দান দিতে।
তথাপি চন্দন লৈয়া, উৎসাহ লইতে ॥
প্রগাঢ় প্রেমের এই স্বভাব আচার।
নিজ দুঃখ—বিঘ্নাদিক না করে বিচার ॥
এই তাঁর গাঢ় প্রেম লোকে দেখাইতে।
গোপাল তাঁরে আজ্ঞা দিল চন্দন আনিতে ॥
বহু পরিশ্রমে চন্দন রেমুনা আনিল।

আনন্দ বাঢ়য়ে মনে—দুঃখ না গনিল ॥
পরীক্ষা করিতে গোপাল কৈল আজ্ঞাদান।
পরীক্ষা করিয়া শেষে হৈল দয়াবান ॥
এই ভক্ত,—ভক্ত প্রিয় কৃষ্ণ ব্যবহার।
বুঝিতে হো আমা সভার নাহি অধিকার ॥"

প্রভুর শ্রীমুখের এই প্রশংসা বাক্যের পর আমাদের আর কি বলিবার আছে। ইহার পর যখন, শেষের সেদিন আসিল, তখনও তিনি নিঃ সম্বল—আপনার বলিতে নিজ-জন কেহ নিকটে ছিল না। নির্জ্জন বৃক্ষতলে শয়ন, কেবল একটী ভক্ত-শিষ্যের সেবাধিকার পাইয়া ছিলেন, সেই শিষ্যটী—আমাদের বহু পরিচিত ঈশ্বর পুরী।

ঈশ্বর পুরী অতি সঙ্গোপনে তাঁহার রোগাক্রান্ত গুরুর সেবা করিতেছেন। দ্বিধা শূন্য চিত্তে মল মূত্রাদি পরিস্কার করিয়া তাঁহাকে সুস্থ করিতে প্রয়াস পাইতেছেন। এই ঈশ্বর পুরী, জাতিতে কায়স্থ কিংবা বৈদ্য। অনেকে ইহাকে কায়স্থ বলিয়াই বিবেচনা করেন। পূর্ব্ব-নিবাস হালিসহরের একাংশ কুমার হট্টে।

মাধবেন্দ্র এই দয়ালু শিষ্যটীর সেবা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন এবং শ্রীকৃষ্ণের করুণা স্মরণ করিয়া সুস্বরে স্বীয় কৃত এই শ্লোকটী পাঠ করিয়া, তাঁহার অনন্ত বিরহ ব্যথা জ্ঞাপন করিতেছেন,—

অয়ি দীনদয়ার্দ্রনাথ হে মথুরানাথ কদাবলোক্যসে।
হৃদয়ং ত্বদলোককাতরং দয়িত ভ্রাম্যতি কিং করোম্যহম্।"

তিনি রাধা ভাবে বলিতেছেন, হেনাথ, দীনজনের দুঃখে তোমার কোমল হৃদয় দ্রবীভূত হয়। হে প্রিয়ে! আমার হৃদয় তোমার অদর্শন জনিত দুঃখে-কাতর হইয়া তোমাকে ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছে, আমি কি করি? হে মথুরানাথ। আমি তোমাকে কবে দেখিব?"

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী এই শ্লোকটীর এইরূপ প্রশংসা করিয়াছেন,—

"ঘষিতে ঘষিতে যৈছে মলয়জ সার।
গন্ধ বাঢ়ে—তৈছে এই শ্লোকের বিচার ॥
রত্নগণ মধ্যে যৈছে কৌস্তভ মণি।
রস-কাব্য মধ্যে তৈছে এই শ্লোকমণি ॥

এই শ্লোক কহিয়াছেন রাধা ঠাকুরাণী।
তাঁর কৃপায় স্ফুরিয়াছে মাধবেন্দ্র বাণী॥
কিবা গৌরচন্দ্র ইহা করে আস্বাদন?
ইহা আস্বাদিতে আর নাহি চৌঠা জন॥
শেষকালে এক শ্লোক পড়িতে পড়িতে।
সিদ্ধিপ্রাপ্তি হৈল পুরীর শ্লোক সহিতে॥"

এই শ্লোকটী শ্রীল শিশির বাবু এইরূপ বিচার করিয়াছেন :—

"আচ্ছা, তিনি যে এই অবস্থায় পড়িয়া, কৃষ্ণকে দয়াময় বলিয়া আদর করিতেছিলেন তিনি কি শ্রীভগবানকে বিদ্রূপ করিতেছিলেন? অবশ্য তাহা কখন নয়। তবে তিনি রোগে অভিভূত হইয়া নিঃসহায় বৃক্ষতলে পড়িয়া যে যন্ত্রণা পাইতেছিলেন, তাহার মধ্যেও এমন কিছু ছিল যে, তাহাতে তাঁহার হৃদয় কৃষ্ণের প্রতি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ হইতেছিল। অদ্বিতীয়, নতুবা শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য সমস্ত জগৎ খুঁজিয়া তাঁহাকে আত্ম সমর্পন করিবেন কেন? এই মাধবেন্দ্র পুরীর, আমাদের ন্যায় সামান্য জীবের বিবেচনায়, খুব সমৃদ্ধিশালী হওয়া উচিত ছিল, তাঁহার বহুতর লোক অনুগত থাকিবে রাজা মহারাজগণ তাঁহার আজ্ঞানুবর্ত্তী হইবে ইত্যাদি। শ্রীকৃষ্ণের বিচারে তিনি ইহার কিছুই পাইলেন না, তবে পাইলেন কি, না রোগ, বৃক্ষতল, কাঠের একটী জল পাত্র ও কৃপালু একটী শিষ্যের সেবা। তবু তিনি আনন্দে গদ্ গদ্ হইয়া তাঁহার সমুদায় যন্ত্রণা ভুলিয়া মৃত্যুকালে বলিতেছেন যে, "হে দীনদয়ার্দ্রনাথ ইহার তাৎপর্য্য কি? শুধু তাহাও নয়। তিনি যে মৃত্যুকালে অশেষ যন্ত্রনার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণকে দীনদয়ার্দ্রনাথ বলিয়া আদর করিতেছিলেন, তুমি সিংহাসনে বসিয়া, শত সহস্র লোক দ্বারা সেবিত হইয়াও, মহা সুখের সময়ও তাহা বলিতে পারনা। কেন? ইহার একমাত্র এই উত্তর সম্ভব যে, তোমার সিংহাসন ও দাস দাসী দ্বারা যে সুখ, তাহা অপেক্ষা অনেকগুণ—অন্য জাতীর সুখ মাধবেন্দ্রর ছিল। নতুবা তিনি মৃত্যুকালে রোগ যন্ত্রণার মধ্যে থাকিয়া একথা বলিতে পারিতেন না। ইহাতে এই সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, শ্রীভগবান জীবন্ত সামগ্রী, ও তাঁহার ভক্তগণও এই ভবের বাজারে সার্থক "বিকি কিনি" অর্থাৎ বিক্রয় ক্রয় করিয়া থাকেন।

আবার দেখুন, মাধবেন্দ্র, "হে দীনদয়ার্দ্রনাথ? আমি তোমাকে না দেখিয়া দুঃখ পাইতেছি। "বলিয়া কান্দিতে কান্দিতে প্রাণ ত্যাগ করিলেন।

সামান্য জীবে মৃত্যুকালে যাহা বলে যথা 'আমার গা জ্বলিতেছে কি 'উদরে যন্ত্রণা হইতেছে' কি অঙ্গ অবশ হইতেছে, 'আমার প্রাণ গেল' ইত্যাদি, ইহা একবারও বলিলেন না, ইহাতে শ্রীকৃষ্ণ কি করিলেন ?

কোন কোন পণ্ডিত লোকে বলেন সৃষ্টি প্রক্রিয়া আপনি হয়। অর্থাৎ নিঃসর্গই সমস্ত সৃষ্টি করিয়া থাকেন, শ্রীভগবান বলিয়া আর কোন পৃথক বস্তু নাই যেহেতু তাঁহারা ইহাও বলেন যে স্বভাবের সৃষ্টিতে জটীলতা নাই যথা, স্বভাব যেমন অভাব দিয়াছেন তেমনি অভাব দুর করিবার বস্তু দিয়াছেন, যেমন পিপাসা দিয়াছেন তেমন জল দিয়াছেন। যেমন ক্ষুধা—দিয়াছেন তেমনি অন্ন দিয়াছেন। স্বভাবই যদি সৃষ্টি করিয়া থাকেন, আর সে সৃষ্টির যদি ভুল না থাকে তবে আমি কখনও মরিব, কি 'কৃষ্ণ দরশণ দাও নতুবা প্রাণে মরিব, এ সমুদয় ভাব তিনি কেন দিলেন ? আমি মরিব, অর্থাৎ একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যাইব, জীবে ইহা ভাবিতে পারে না। যদি স্বভাবের সৃষ্টিতে জটীলতা না থাকে, তবে ইহার দ্বারা ইহাই প্রমাণীকৃত হইবে যে, জীব বিলুপ্ত হইবে না। শ্রীভগবানরূপ বস্তু যদি না থাকিতেন, তবে স্বভাব জীবকে ঈশ্বরের ভাব মনে আসিতে দিতেন না। যদি শ্রীকৃষ্ণকে পাইবার সম্ভাবনা না থাকিত তবে স্ব-ভাব কৃষ্ণের প্রতি লোভ দিতেন না। স্বভাব লোভ দিবেন, লোভের বস্তু দিবেন না, ইহা হইতে পারে না।

"এই যে, মাধবেন্দ্র পুরী 'কৃষ্ণ! দেখা দাও, প্রাণ যায়,' বলিতে বলিতে প্রাণত্যাগ করিলেন, স্বভাবের সৃষ্টিতে যদি ভুল না থাকে, তবে কৃষ্ণ তখন কি করিলেন ? কৃষ্ণ তখন কি করিলেন বলিতেছি। এমত অবস্থায় কৃষ্ণ কি করিবেন, তাহা সংসাররূপ গ্রন্থে স্বভাব লিখিয়া রাখিয়াছেন। যখন গো-বৎস হাম্বা রবে ডাকিতে থাকে, তখন তাহার দুরবর্ত্তী জননী সেই ডাক শুনিবামাত্র হাম্বা বলিয়া উত্তর দিয়া দৌড়িয়া আইসে। যেমন মাধবেন্দ্র "কৃষ্ণ দর্শন দাও, প্রাণ যায়" বলিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন, আর কৃষ্ণ "এই যে আমি" বলিয়া তাঁহাকে দর্শন দিলেন। স্বভাব পরক্ষে ইহা প্রমাণ করিতেছেন। ইহা যদি না হয়, তবে সমুদায় মিথ্যা, তাহার বড় ভুল।"

মৃত্যুকালে মাধবেন্দ্র তাঁহার সমস্ত প্রেম, ভক্তি, শিষ্য ঈশ্বর পুরীকে অর্পণ করিয়া যান। এই প্রেম-ধনে ধনী হইয়া ঈশ্বর পুরী একজন অপূর্ব্ব ভক্ত হইতে পারিয়াছিলেন।

পূর্ব্বে বলিতে ছিলাম, শ্রীগৌরাঙ্গ ক্ষীরচোরা গোপীনাথের মন্দিরে বসিয়া

ভক্তগণকে মাধবেন্দ্রের চরিত্র-সুধা আস্বাদন করাইতেছিলেন এবং পুরীর সেই বিখ্যাত শ্লোকটী পাঠ করিলেন যথা,—

এত কহি পড়ে প্রভু তাঁর কৃত শ্লোক।
যেই শ্লোক-চন্দ্রে জগৎ করিয়াছে আলোক॥

*   *   *   *

এই শ্লোক পড়িতে প্রভু হইলা মূর্চ্ছিত।
প্রেমেতে বিবশ হঞা পড়িলা ভূমিত॥
আস্তে ব্যস্তে কোলে করি নিল নিত্যানন্দ।
ক্রন্দন করিয়া তবে উঠে গৌরচন্দ্র॥
প্রেমোন্মাদ হৈল—উঠি ইতি উতি ধায়।
হুঙ্কার করয়ে হাসে নাচে কাঁদে গায়॥
'অয়ি দীন অয়ি দীন' বোলে বারেবার।
কণ্ঠে না নিঃস্বরে বাণী বহে অশ্রুধার॥
কম্প স্বেদ পুলকাদি স্তম্ভ বৈবর্ণ্য।
নির্ব্বেদ বিষাদ জাড্য গর্ব্ব হর্ষ দৈন্য॥
এই শ্লোকে উঘাড়িল প্রেমের কপাট।
গোপীনাথ সেবক দেখে প্রভুর প্রেমনাট॥
লোকের সংঘট্ট দেখি প্রভুর বাহ্য হৈল।

—চরিতামৃত।

অতএব এই মাধবেন্দ্র যে আমাদের গৌর-ভক্তমণ্ডলীর কত আদরণীয়, তাহা আর বলিতে হইবে না। এই মাধবেন্দ্র-আরাধনা তিথি উপলক্ষে আমাদের গৌর আনা গোসাঞিটী তাঁহার সর্ব্বস্ব দরিদ্র নারায়ণদিগের সেবার জন্য নিক্ষেপ করিতেন। শ্রীমদ্বৃন্দাবন দাস মহাশয়ের বর্ণনা হইতে আমরা, তাঁহার এই তিথি আরাধনা উৎসবের এক বৎসরকার বিবরণ, প্রিয়তম পাঠকগণকে উপহার দিয়া, আনন্দ লাভ করিব বাসনা করিয়াছি।

মহাপ্রভু তখন নীলাচল হইতে জগজ্জননী শচীদেবীকে দর্শন করিতে আসিয়া অদ্বৈত-ভবনে অবস্থান করিতেছেন। এমন সময়ে দৈবক্রমে সেই পুণ্য তিথি আসিয়া মিলিত হইল। অদ্বৈত প্রভু আনন্দভরে ভাবি উৎসবের জন্য সজ্জিত হইতে লাগিলেন। আর পারিষদগণ পরিবেষ্টিত শ্রীগৌর সুন্দর, সেই পবিত্র দিবসের আগমন দেখিয়া অতীব প্রীত হইলেন। এদিকে সেই

তিথি পূজা করিবার জন্য অদ্বৈত প্রভু, কত যে সজ্জা করিতে লাগিলেন তাঁহার ইয়ত্তা নাই। নানাদিক হইতে নানা দ্রব্য আসিতেছে। মাধবেন্দ্রের উপর সকলেরই শ্রদ্ধাভক্তি ছিল। প্রত্যেকেই উৎসাহের সহিত এক এক কার্য্যের ভার লইলেন। যেমন, আই অর্থাৎ শচীমাতা রন্ধন কার্য্যের ভার লইলেন। আর যত সব বৈষ্ণব সিমন্তিনীরা তাঁহাকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইলেন। নিত্যানন্দ প্রভুর আনন্দের সীমা নাই, তিনি বৈষ্ণব পূজিবার ভার নিলেন। অন্যান্য সকলে, চন্দন ঘর্ষণ, মাল্য-গ্রন্থন, জল আনা, স্থান পরিষ্কার করা, আগন্তুক বৈষ্ণবগণের চরণ প্রক্ষালন করা, পতাকা বান্ধা, চান্দোয়া টানান, ভাণ্ডারের জন্য দ্রব্য সংগ্রহ করা প্রভৃতি কার্য্য আপনাদের মধ্যে ভাগ করিয়া লইলেন। কেহ সঙ্কীর্ত্তন করিতেছেন, আনন্দে নৃত্য করিতেছেন, শঙ্খ ঘণ্টা বাজাইতেছেন, পূজার কার্য্যের বন্দোবস্ত করিয়া দিতেছেন আর কেহ বা তিথি পূজার আচার্য্য হইয়াছেন। সকলেই পরমানন্দ রসে মগ্ন। সকলেই নিজ ইচ্ছা মত কার্য্যে নিযুক্ত। চতুর্দ্দিকে কেবল খাও খাও, নাও নাও ও হরি হরি ধ্বনি। কীর্ত্তনানন্দে কাহারও বাহ্য মাত্র নাই। অদ্বৈত ভবন যেন শ্রীধাম বৈকুণ্ঠের তুল্য বরণীয় হইয়াছে। আর আমাদের ভক্তের ভগবান—তিনি পরম সন্তোষে সজ্জা সম্ভার দেখিয়া বেড়াইতেছেন। দেখিতেছেন, দুই চারিটী তণ্ডুল পূর্ণ ঘর রহিয়াছে। পর্ব্বত প্রমাণ কাষ্ঠ সারি সারি সাজান আছে। পাঁচ ঘরে ঘট প্রভৃতি রন্ধনের দ্রব্য, দুই চারি ঘরে 'মুদ্গের বিয়লি, স্তূপীকৃত নানাবিধ বস্ত্র, প্রচুর পরিমাণ খোলা পাত, চারি খানি ঘর চিপিটকে পূর্ণ, সহস্র সহস্র কান্দি কদলী আর নারিকেল, গুয়া, পান, পটল, বার্ত্তাকু, থোড়, আলু, মানকচু, ইক্ষু, দধি, দুগ্ধ, ক্ষীর, তৈল, লবণ, ঘৃত প্রভৃতি কত যে আসিয়াছে তাহার সীমা নাই। এই অমানুষী আয়োজন ও অনন্ত সম্ভার দেখিয়া প্রভু আমাদের চমৎকৃত হইলেন। তিনি ঈষৎ হাসিয়া বলিতেছেন—এত সম্পত্তি মানুষের থাকিতে পারে না, বুঝিয়াছি আচার্য্য ঠাকুর স্বয়ং মহেশ। মহাপ্রভু হাস্য ছলে অদ্বৈত তত্ত্ব জগদ্বাসীকে জানাইতেছেন।—

"মনুষ্যের এতেক কি সম্পত্তি সম্ভবে।
এ সম্পত্তি সকল সম্ভবে মহাদেবে॥
বুঝিলাম আচার্য্য মহেশ অবতার।
এইমত হাসি প্রভু বলে বার বার॥
ছলে অদ্বৈতের তত্ত্ব মহাপ্রভু কয়।" চৈঃ ভাঃ

শ্রীঅদ্বৈত প্রভু যে মহাদেবের অবতার একথা শ্রীচৈতন্য চন্দ্র অনেকবার ইঙ্গিতে বলিয়াছেন। আর আজ পর্য্যন্ত তিনি বৈষ্ণব জগতে মহেশ-যোগ্য পূজাও পাইয়া আসিতেছেন।

প্রভু তাঁহার এই বিরাট আয়োজন দেখিয়া বড়ই আনন্দিত হইয়াছেন। আচার্য্যের প্রভূত প্রশংসা করিয়া সঙ্কীর্ত্তন স্থানে ফিরিয়া আসিলেন। প্রভুকে পাইয়া কীর্ত্তনকারী ভক্তগণ পরমানন্দে গাহিতে লাগিল। কে কোন দিকে নাচিতেছে ও গাহিতেছে, কে কোন দিকে আনন্দে ছুটিয়া যাইতেছে, কে তাহার নির্দ্ধারণ করিবে। অনন্ত ভক্তগণ-কণ্ঠ-নিঃসৃত হরি হরি ধ্বনিতে দিক সমূহ মুখরিত হইতেছে। বৈষ্ণবগণের শ্রীঅঙ্গ মাল্য চন্দনে ভূষিত, ভক্তিতে কে বড় আর কে ছোট তাহা জানিবার উপায় নাই। প্রভুকে বেষ্টন করিয়া সকলে কীর্ত্তন করিতেছেন। গগন ভেদিয়া হরি হরি ধ্বনি উঠিতেছে, আবাল বৃদ্ধ বনিতার কর্ণে সে ধ্বনি পশিয়া সুধা ধারার সৃষ্টি করিতেছে। মহামত্ত প্রেম সুখময়' নিত্যানন্দ বাল্য ভাবে নাচিতেছেন। এই সুখকর দৃশ্যে বিহ্বল হইয়া আচার্য্য প্রভু ও অনেক নাচিলেন। তাহার পর হরিদাস ঠাকুর নাচিলেন। সে এক মধুর ব্যাপার। সর্ব্বশেষে মহাপ্রভু শ্রীগৌর সুন্দর অতি অশেষ বিশেষে নৃত্য করিলেন। প্রথমে সর্ব্ব পরিষদগণের নৃত্য দেখিলেন তাহার পর আপনি আবার সকলকেই লইয়া নাচিতেছেন। সকলের মধ্যে তিনি—সে এক সুন্দর শোভা হইয়াছে।

এইরূপে আনন্দাবেশে নৃত্য করিয়া সারাটী দিবস কাটিয়া গেল। প্রভু তখন ভক্তগণকে লইয়া বিশ্রাম করিতে বসিলেন। অবসর বুঝিয়া অদ্বৈত প্রভু অনুমতি লইয়া ভোজনের স্থান করিলেন। তখন,—

বসিলেন মহাপ্রভু করিতে ভোজন।
মধ্যে প্রভু চতুর্দ্দিকে সর্ব্ব ভক্তগণ॥
চতুর্দ্দিকে ভক্তগণ যেন তারাচয়।
মধ্যে কোটি চন্দ্র যেন প্রভুর উদয়॥
দিব্য অন্ন বহুবিধ পিষ্টক ব্যঞ্জন।
মাধবেন্দ্র আরাধনা আইর রন্ধন॥
মাধবপুরীর কথা কহিয়া কহিয়া।
ভোজন করেন প্রভু সর্ব্ব ভক্ত লৈয়া॥

প্রভু বলে মাধবেন্দ্র আরাধনা তিথি।
ভক্তি হয় গোবিন্দে, ভোজন কৈলে ইথি ॥

চৈঃ ভাঃ

আমাদের রঙ্গিয়া প্রভু, এই মত নানা রঙ্গ করিতে করিতে ভোজন সমাধা করিয়া আচমন করিলেন। তখন শ্রীঅদ্বৈত অতি সুগন্ধি চন্দন ও দিব্য মাল্য আনিয়া ভক্তি ভরে মহা অনুরাগে দুই প্রভুর নিকটে বসিলেন। প্রভু আপন হস্তে সেই সমস্ত মাল্য চন্দন ভক্তগণ মধ্যে বণ্টন করিয়া দিলেন তাহারাও তাঁহার শ্রীহস্তের প্রসাদ লাভ করিয়া আনন্দে হরি হরি ধ্বনি করিয়া উঠিলেন। আপনি শ্রীগৌর হরি যাঁহার গৃহে—সেই অদ্বৈতের ত আনন্দের অবধি নাই। প্রভু এদিন যত রঙ্গ করিয়া ছিলেন—তাঁহার ভক্তগণকে যত আনন্দ দিয়া ছিলেন—তাহা কে বর্ণনা করিবে।

এক দিবসের যত চৈতন্য বিহার।
কোটি বৎসরেও কেহ নারে বর্ণিবার ॥
পক্ষী যেন আকাশের অন্ত নাহি পায়।
যতদূর শক্তি ততদূর উড়ি যায় ॥
এই মত চৈতন্য যশের অন্ত নাই।
তিঁহো যতদেন শক্তি তত মাত্র গাই ॥
এ সব কথায় অনুক্রম নাহি জানি।
যে তে মতে চৈতন্যের যশ সে বাখানি।
এ সকল পুণ্য কথা যে করে শ্রবণ।
যেবা পড়ে শুনে মিলে কৃষ্ণ প্রেমধন ॥
'অনন্ত ভক্তের কথা মহিমা অপার"।

—আমরা সাধ্য মত সেই দেব তুল্য মহাত্মার পুণ্য কথা আলোচনা করিয়া, কৃতজ্ঞ চিত্তে তাঁহার চরণ কমলে কোটি কোটি প্রণিপাত পূর্ব্বক সেই প্রেমার্দ্র মূর্ত্তি মনোমন্দিরে জাগ্রত রাখিয়া বিদায় গ্রহণ করিতেছি।

দীন—শ্রীভোলানাথ ঘোষ বর্ম্ম

মানুষ কে ?

হে মানুষ দেহ-ধারি জীব! তুমি আপনাকে মানুষ বলিয়া অভিমান কর, কিন্তু এই অভিমানের বাস্তবিক সার্থকতা আছে কি না তাহা একবার ভাবিয়া দেখ কি? মানুষ কাহাকে বলে এবং তোমার সেই মানুষ বলিয়া পরিচয় দিবার যোগ্যতা আছে কি না ভ্রমেও তাহার আলোচনা কর কি? দৃষ্টিকে অন্তর্মুখিন করিয়া তাহাতে মনুষ্যত্বের পরিচায়ক গুণ-সমষ্টি আছে কি না, কখনও তাহার অনুসন্ধান করিয়াছ কি? যদি তাহা না করিয়া থাক, তাহা হইলে নিশ্চয় জানিও যে তুমি নরাকারে পশুরও অধম; কেননা যে আহার নিদ্রাদিকে সার বিবেচনা করিয়া তুমি সংসারে বিচরণ করিতেছ, পশুগণ তাহার আবেগ জনিত সুখ তোমা অপেক্ষা অনেক অধিক পরিমাণে উপভোগ করে, অতএব পশুভোগ্য সুখের অংশাধিকারী হইয়া যদি তুমি আপনাকে মানুষ বলিয়া মনে কর, তবে তাহা মনুষ্যের ছদ্মবেশ ধারণ করিলেও পশু অপেক্ষা অনেক নিম্নস্তরের জীব, যেহেতু পশুর দোষগুলি তোমাতে পূর্ণমাত্রায় আছে, অথচ তুমি তাহার গুণ-গুলির অধিকারী নহ। তাহারা স্বভাবজাত সংস্কারবলে আপন ব্যাধির ঔষধ চিনিয়া লইতে পারে, আহার নিদ্রাদির অভাবে ধৈর্য্যধারণ ও শীতোষ্ণাদি সহ্য করিতে পারে, পশুগণ অকপট ও কৃতজ্ঞ, কেননা তাহারা আপন স্বরূপ লুকাইতে জানে না ও পালনকারি প্রভুর জন্য প্রাণদানে পশ্চাৎপদ হয় না, কিন্তু হে মনুষ্য বেশধারিন্! তোমার এই সকল গুণ আছে কি? যদি না থাকে, তাহা হইলে তুমি কি পশু অপেক্ষা অধম নহ? অন্ততঃ কিছুক্ষণের জন্য বৃথা অভিমানের মসীময় আবরণটিকে সরাইয়া স্থির ভাবে একবার আত্মপরীক্ষা করিয়া দেখদেখি যে, ব্রহ্মাণ্ডের কোন্ অন্ধকারময় স্তরে তুমি বিচরণ করিতেছ, এবং কুসংস্কারের শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া তুমি ঐ বিচরণ স্থান হইতে ক্রমশঃ অধঃপতিত হইতেছ কি না? অশান্তি জনিত যাতনা উত্তরোত্তর ঘনীভূত হইয়া তোমার চিত্তকে আচ্ছন্ন করিতেছে কি না? মরিচীকার উদ্দেশে ধাবিত মৃগের ন্যায় সুখের আকাঙ্খায় ধাবমান হইয়াও দুঃখের কষাঘাতে তুমি জর্জ্জরিত হইতেছ কি না? হায়! এই দুঃখ ভবিষ্যৎ মহাবৃক্ষের বীজমাত্র, অতএব স্থির জানিও যে, যত অজ্ঞান—তত অন্ধকার ও যত অন্ধকার—তত দুঃখ। এই আধ্যাত্মিক অন্ধকার বড়ই ভীষণ, ব্যবহারিক অন্ধকার ইহার তুলনায় সমুদ্রের নিকট শিশির বিন্দুর তুল্য। দেহান্তে ইহা জীবাত্মাকে সহস্র বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া বিকল

বাসনায় নরকানলে নিক্ষেপ করে হায় সে যাতনা বড়ই ভয়ানক, দহ্যমান জীবাত্মার সে আকুল ক্রন্দন বর্ণনাতীত।

হে ভ্রাতঃ! তোমাকে মিনতি করি, ক্ষণেকের জন্য মোহ-মদের পাত্রটিকে তোমার সতৃষ্ণ দৃষ্টির বাহিরে রাখিয়া আমার কাতর প্রার্থনায় কর্ণপাত কর, অহঙ্কারের দ্বারটি খুলিয়া অবিদ্যার অন্ধকারময় গৃহ হইতে একবার বাহিরে আইস, বাহিরের জ্ঞানালোক একবার তোমার অন্তশ্চক্ষুতে প্রতিফলিত হইলেই আমার কাতর বাক্য হৃদয়ঙ্গম হইবে, আমি যে দর্পণ খানি লইয়া দাঁড়াইয়া আছি তখন ক্ষণেকের জন্য তাহাতে দৃষ্টিপাত করিলেই বুঝিতে পারিবে যে, তোমার স্বভাব সুন্দর মুখখানি ক্ষত বিক্ষত ও কর্দ্দমাক্ত হইয়া কিরূপ বিকৃত হইয়া গিয়াছে। চাহিয়াদেখ দেবতা হইয়া তুমি পিশাচের আকার ধারণ করিয়াছ এবং ইহাতে যে কেবল তুমি নিজের সর্ব্বনাশ করিতেছ তাহা নহে, আপনার নাক কাটিয়া পরের যাত্রাভঙ্গ করিবার কারণ হইতেছে। তোমার বর্ত্তমান স্বরূপ না জানিয়া যাহারা তোমার সঙ্গ করিতেছে তাহাদেরও সর্ব্বনাশ করিতেছ, তোমার কুপ্রবৃত্তির সংঘর্ষণ জনিত আঘাতে তাহাদেরও আধ্যাত্মিক দেহ ক্ষত বিক্ষত হইতেছে, নেশার ঘোরে কিছুক্ষণের জন্য বেদনা অনুভব করিতে না পারিলেও ভবিষ্যতে বিকলাঙ্গ হইয়া ইহ পরকাল ব্যাপী যাতনা ভোগ করিতে হইবে। তাই বলিতেছি যে এখনও সাবধান হও, সুহৃদের কথা এখনও শ্রবণ কর, যদি বর্ত্তমান অধঃপতিত অবস্থা হইতে উন্নীত হইতে চাও, শান্তিরস পান করিয়া যদি প্রকৃত আনন্দ লাভ করিবার আগ্রহ থাকে, তবে মোহমদের পাত্র দূরে নিক্ষেপ কর, অবিদ্যা রাক্ষসীর অনিত্য বাসনাময় গৃহ হইতে বাহির হইয়া আইস। অনুতাপের দ্বারা অহঙ্কারকে আবরিত করিয়া সাধু সঙ্গ কর, তাঁহাদের উপদেশ মতে তোমার মলিনতা ধৌত ও ক্ষত চিহ্নগুলি বিলুপ্ত হইয়া যাইবে এবং মেঘোন্মুক্ত শশধরের ন্যায় তোমার প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশিত হইয়া পড়িবে, তুমি যথার্থ মানুষ হইবে।

মন ধাতুর অর্থ জ্ঞান, আহার বিহারাদির উপায় নির্ণয় রূপ ব্যবহারিক জ্ঞানকে জ্ঞান বলে না, উহা অজ্ঞানের অন্তর্গত। যে আপনাকে ও আপনার সৃষ্টিকর্ত্তাকে জানে, আপনার অনন্ত পরিণাম চিন্তা করিবার উপযোগী সূক্ষ্মদৃষ্টি যাহার আছে, সেই ব্যক্তিকেই জ্ঞানী ও মানুষ শ্রেণীর অন্তঃর্গত বলিয়া জানিও।

হে মুগ্ধ ভ্রাতঃ! সংসার তিন দিনের খেলা মাত্র, স্থির চিত্তে ভাবিয়া দেখ দেখি যে, তোমার বাল্যকাল হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত স্বপ্নের ন্যায় চলিয়া

গিয়াছে কি না ? জলস্রোতের ন্যায় বৎসরগুলি যেন প্রত্যহ চলিয়া যাইতেছে এবং তোমার জীবন এইরূপ কয়টা বৎসরের সমষ্টিমাত্র। আবার কল্যই তোমার কালের ভেরি বাজিয়া উঠিতে পারে, ফলতঃ তোমার ক্ষণস্থায়ী জীবনের কয়টাদিন যখন কালের গর্ভে বিলীন হইয়া শেষদিন উপস্থিত হইবে, মৃত্যুর অন্ধকারময় করাল বদন-গহ্বরের অন্তঃর্গত হইয়া যখন আর্ত্তনাদ করিবে, তখন মহাভয়ে আকুল হইয়া দেখিবে যে তুমি কত নিম্নস্তরে পতিত হইয়াছ। আরও দেখিতে পাইবে যেন যাতনা সকল পুঞ্জীভূত হইয়া তোমাকে গ্রাস করিতে আসিতেছে। ভীষণ অন্ধকার! রক্ষা করিবার কেহ নাই, যে প্রকৃত রক্ষক সময় থাকিতে তাঁহাকে জানিবার বা চিনিবার চেষ্টা কর নাই, কাজেই তখন তাঁহাকে মনেও আনিতে পারিবে না অথচ যাহাদের মুখ চাহিয়া এই বিষম ভ্রম করিয়াছ সংসারের তারণায় আকুল প্রাণে তাহাদেরই ডাকিবে, কিন্তু হায়! সাড়া পাইবে না, তোমার পিপাসাশুষ্ক কণ্ঠে শান্তিরস প্রদান করিতে কেহই অগ্রসর হইবে না; কেননা তাহারাও যে আপন আপন কর্ম্ম শৃঙ্খলে বদ্ধ, আপনার জ্বালায় অস্থির, কে সাড়া দিবে !!

তাই বলিতেছি যে, সময় থাকিতে সাবধান হও, সংসার পথে চলিবার উপযোগী জ্ঞানলাভ কর, মোক্ষলক্ষ্যে ভোগের পথে অগ্রসর হও, প্রকৃত আত্মীয় ও বান্ধবকে চিনিয়া লও, যিনি আত্মা বা শ্রীভগবানের দিকে অগ্রসর করিয়া দেন তিনিই আত্মীয়, আর যিনি বন্ধন মুক্তির কারণ হন তিনিই বান্ধব, সময় থাকিতে ইঁহাদের সহিত পরিচিত হইলে ইঁহারাই মধ্যবর্ত্তী হইয়া তোমার প্রকৃত রক্ষক ও আপন হইতেও আপন সেই প্রেমময় শ্রীভগবানকে চিনাইয়া দিবেন; তুমি নির্ভয় ও কৃতার্থ হইবে, নচেৎ ভ্রমবশে যাহাদের আপন ভাবিতেছ, যাহাদের মুখ চাহিয়া আপনাকে ভুলিয়াছ, এবং যাহাদের জন্য আপন মঙ্গল ঘট পদদলিত করিতেছ, নিশ্চয় জানিও যে "তারা কেবল ডুবাতে পারে পা—থা—রে।"

বলিতেছি না যে তুমি সংসার ত্যাগ কর,তবে আমার বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, জ্ঞানলাভ পূর্ব্বক আসক্তিকে ভগবন্মুখীন করিয়া প্রকৃত মনুষ্যরূপে সংসার পথে অগ্রসর হও এবং যাহাদের লইয়া সংসার করিতেছ তাহাদিগকে উন্নত করিবার চেষ্টা কর, যদি তাহারা দুরদৃষ্ট বশতঃ তোমার মতানুযায়ী না চলে, তবে আপনার স্বরূপ জ্ঞান-অব্যাহত রাখিয়া তাহাদের সহিত ব্যবহার কর, তাহা হইলে মন্ত্র জানিয়া সাপ খেলাইলে যেমন দংশন ভয় থাকে না, সেইরূপ তাহারা তোমার কোন অনিষ্ট করিতে পারিবে না। ভাব ও ব্যবহার ভেদে

প্রাকৃত ভোগই জীবের বন্ধন বা মুক্তির কারণ হয় জানিও, চতুর মক্ষিকা যেমন আপনার পাখা দুইটী সাবধানে রাখিয়া দূর হইতে শুড় বাড়াইয়া মধুপান করে ও পেট ভরিলেই উড়িয়া যায় সেইরূপ যদি তুমি জ্ঞান ও ভক্তিকে অব্যাহত রাখিয়া প্রাকৃত ভোগ তৃষ্ণা নিবৃত্ত কর, তাহা হইলে ভোগ তোমার বন্ধনের শৃঙ্খল স্বরূপ না হইয়া তৃপ্তিদান ও প্রারব্ধক্ষয় করিয়া বন্ধন মুক্তির কারণ হইবে; কেননা যে জলে ডুবাইয়া মারে, ব্যবহার ভেদে তাহাই আবার তৃষ্ণা নিবৃত্তির কারণ হয়।

বর্ত্তমান সময়ে পরলোকতত্ত্ব লইয়া পাশ্চাত্য দেশের মনীষিগণ একাগ্রভাবে আলোচনা করিতেছেন, তাঁহারা যে সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন তাহা সত্যপূর্ণ, সুতরাং হিন্দুশাস্ত্রের কল্পনা প্রসূত বলিয়া উহা উড়াইয়া দিবার সময় আর নাই, যে কোন ব্যক্তি ইচ্ছা করিলে সেই সকল পরীক্ষার ফলাফল অবগত হইতে পারেন, মৃত্যু পথগামী অজ্ঞানী পাপাত্মার ভীষণ যাতনা, বাসনা মলিন কর্ম্মিদিগের অশান্তিময় অনুতাপ ও জীবন পথগামী জ্ঞানী সাধকগণের অপ্রাকৃত আনন্দের মধুময় উচ্ছ্বাস অবগত হইলে লক্ষ্যহীন ও ভ্রান্ত হৃদয়ের গতি পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়, জীবন সমস্যার মীমাংসা ও অধ্যাত্মতত্ত্বের দ্বার উদ্ঘাটন করিবার জন্য প্রাণ আকুল হইয়া উঠে, ফলে যেখানে আকুলতা সেইখানেই সাফল্য। আপনার ভবিষ্যত উজ্জ্বল ও আনন্দময় করিবার জন্য হৃদয়ে আকুল পিপাসার উদয় হইলেই তাহার লক্ষ্য ভগবন্মুখী হইয়া পড়ে ও তাহার গতি মৃত্যুর অন্ধকারময় পথ হইতে ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত হইয়া জীবনের জ্যোতীর্ম্ময় পথে চালিত হয়।

অনেকে মনে করেন যে দেহত্যাগ করিলেই মৃত্যু হয়, কিন্তু তাহা ভ্রম মাত্র, মৃত্যু শব্দের অর্থ অধোগতি, এবং অজ্ঞানী পাপাত্মাগণের জন্যই এই যন্ত্রণাময় বিধান, যাঁহারা জ্ঞানী ও সাধন শক্তি সম্পন্ন, তাঁহারা ছিন্নপাদুকার ন্যায় উল্লাসিত প্রাণে দেহত্যাগ করিয়া জীবনের পথে ঊর্দ্ধগতি লাভ করেন ও ক্রমে স্বরূপ চৈতন্যের আনন্দময় স্তরে উপনীত হইয়া কৃতার্থ হন।

ক্রমশঃ

শ্রীহরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

———

গৌর-বিরহে

(১)

প্রাণ গৌর হে!

(আমার) পরাণ কাঁদে কেন তোমার তরে।
নাম করিলে কেন নয়ন ঝরে॥

কে তুমি আমার হও, বল নাথ! বলে দাও,
কি করে' আপন করে' লই তোমারে।

(সুধু) কাঁদিলে কি পাওয়া যায়, দেখা তব গোরা-রায়
ইহার বিচার বল দেবে কে করে'।
পরাণ কাঁদে কেন তোমার তরে॥

(২)

নাথ হে!

না দেখে তোমায় মন কেমন যে করে।
মূরতির পানে চাহি নয়ন ঝরে॥

কিরূপ ওরূপ তব, কি মাধুরী নব নব,
সুঠাম দাঁড়ায়ে আছ কি প্রেম ভরে।

দুই বাহু উর্দ্ধে করি, বলিতেছ হরি হরি
র'য়েছি হেরিয়ে রূপ জীবনে মরে'।
না দেখে তোমায় মন কেমন যে করে॥

(৩)

কি ফাঁদে ফেলিলে নাথ! মরি কাঁদিয়া।
তব নামে নাচে মোর হৃদি-নদীয়া॥

যে দিকে ফিরাই আঁখি নদীয়া মাধুরী দেখি
পুলকে শিহরে তনু রূপ হেরিয়া।

যে কাজ করিতে চাই তাহাতেই সুখ পাই
নাম তব সর্ব্ব-সিদ্ধি ভরা অমিয়া।
কি প্রেম শিখা'লে তুমি মরি কাঁদিয়া॥

(৪)

(তব) চরণের ধূলি আমি শিরে বান্ধিয়া।
মন সুখে নাচি গাই তাথিয়া থিয়া॥
কোন দুখ নাই মোর তবে কেন আঁখি লোর,
ঝরিতেছে সদা মোর বুক ভাসিয়া।
লোকে বলে গৌর হরি, প্রেম ভকতি তরী,
ইথে কিছু নাহি আন প্রাণ বঁধুয়া।
কবে তুমি দেখা দেবে বল খুলিয়া॥

(৫)

গৌর হে!
কাঁদি যেন তব তরে দিন রাতিয়া।
এই ভিক্ষা দাও মোরে গুণনিধিয়া॥
কেঁদে কেঁদে ম'রে যাব, তব নাম না ছাড়িব,
ছাড়ি যদি রেখো তুমি কেশে বাঁধিয়া।
যত দিন দেহ র'বে, শ্রীগৌরাঙ্গ নাম লবে,
তোমার চরণ দাসী হরিদাসিয়া
দাসী ব'লে মনে রেখ গুণ-মনিয়া॥

শ্রীহরিদাস গোস্বামী

মানুষ কে

শ্রীভগবানের চৈতন্য-বিভূতি সর্ব্বব্যাপী, সুতরাং মৃত্যু বা অজ্ঞানের অন্ধকারময় নিম্নতম স্তর হইতে চৈতন্যের ঊর্দ্ধতম স্তর পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইলেও এই ব্যাপ্তির প্রকাশ ভেদ আছে, সূর্য্যালোক যেমন বিভিন্ন স্তরে বিভিন্নরূপে প্রকাশ পাইলেও আধার যে স্তরের অনুযায়ী হয়, সেই স্তরের জ্যোতী তাহাতে প্রতিফলিত হয়, অর্থাৎ কূপ, গৃহ দর্পণ ও আতস প্রস্তর প্রভৃতি বিভিন্ন আধার ভেদে প্রকাশ ভেদ হয় ফলতঃ আধার যত নির্ম্মল হইবে, ততই ঊর্দ্ধস্তরের চৈতন্য তাহাতে জ্ঞান স্বরূপে প্রতিফলিত হইবে, আতস প্রস্তরে সূর্য্যালোক পতিত হইয়া কেন্দ্রীভূত হইলে যেমন সূর্য্যমণ্ডলের সন্নিহিত অগ্নিময় জ্যোতী মূহুর্ত্ত মধ্যে

নিকটবর্ত্তী হয় সেইরূপ সাধকের হৃদয়াধার সর্ব্বোর্দ্ধ স্তরস্থ চৈতন্যের উপযোগী হইলে তিনি তৎক্ষণাৎ ভগবদ্দর্শন পূর্ব্বক মায়াতীত শিবত্বের অধিকারী হন এবং এই জন্যই শ্রীভগবান বহুদূরে অপিচ অতি নিকটে।

এই ব্রহ্মাণ্ড সপ্তম স্তরে বিভক্ত আবার প্রত্যেক স্তরের কতকগুলি বিভাগ ও উপবিভাগ আছে, দেহত্যাগের সময়ে জীবের মনে যে স্তরের ভাব প্রবল হয়, দেহান্তে ভুব ও স্বঃ লোকে দুস্কৃতি ও সুকৃতি জনিত কর্ম্মফল ভোগ শেষ হইলে পুনরায় ভূলোকে আসিয়া সেই স্তরের উপযোগী দেহ ধারণ করে, এই জন্যই গীতায়—শ্রীভগবান বলিয়াছেন —

যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরং।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ॥

অর্থাৎ হে কৌন্তেয়! যে যে ভাব লইয়া দেহত্যাগ করে সে সেই ভাবানুযায়ী গতি প্রাপ্ত হয়।

এইস্থানে একটি কথা না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না, দগ্ধোদর পূরণের জন্য জীবহিংসার আধিক্য যত হইতেছে, পশুভাবাপন্ন মানবের ততই বৃদ্ধি হইতেছে, কেননা পৈশাচিক ভাবের প্ররোচনায় মানব যে সময়ে পশ্বাদি বধ করে, ঐ পশুগণ সেই সময়ে মানবের মুখ চাহিয়া প্রাণত্যাগ করায় পরজন্মে মানবের পরিচ্ছদ পরিধান করিলেও পশুর হৃদয় লইয়া ভূমিষ্ঠ হয়, সুতরাং সেই সকল নিম্নস্তরের জীবের নিকট মানবীয় ভাবের প্রত্যাশা করা বিড়ম্বনা মাত্র, যদিও উচ্চভাব সকল প্রত্যেক জীবের চিত্তাধারে বীজস্বরূপে নিহিত থাকে, কিন্তু সৎসঙ্গরূপ মৃত্তিকার সংযোগ না হইলে উহা অঙ্কুরিত হইবে কিরূপে? কিন্তু হায়! সর্প যেমন আলোকের নিকট যাইতে না পারিয়া দূর হইতে বৃথা গর্জ্জন করে, সেইরূপ তাহারাও সাধুগণের নিকটস্থ হইতে পারেনা, অথচ আপন হীন স্বভাবের প্ররোচনায় দূর হইতে বৃথা চীৎকার করে। সতের সহিত খলের চিরশত্রুতা; সাধুগণ তাহাদের কোন অনিষ্ট না করিলেও তাহারা অহেতুক শত্রুতা করিয়া একটু যাতনা-গর্ভ আরাম বোধ করে; কিন্তু ধূমের দ্বারা কিছু-ক্ষণের জন্য আকাশকে মলিন দেখাইলেও উহা শত চেষ্টা করিয়া যেমন আকাশের গায়ে দাগ লাগাইতে পারে না, পরন্তু বায়ুর দ্বারা তাড়িত হইয়া পরিশেষে বজ্রাগ্নির দ্বারা দহ্যমান হয়, সেইরূপ মূঢ়গণ সাধুগণের ভাব বুঝিতে না পারিয়া কেবল বাহ্যিক কার্য্য দৃষ্টে নিন্দা করে ও সাধারণের চক্ষে তাঁহাদিগকে হীন করিবার বৃথা চেষ্টা পায়, ফলে তাহারাই অশান্তির দ্বারা তাড়িত হইয়া পরি-

শেষে নরকাগ্নিতে দগ্ধ হয় কিন্তু দুর্ব্বুদ্ধির এইরূপ বিষময় ফলভোগ করিলেও কার্য্য কারণের সম্বন্ধ বোধ না থাকায় তাহাদের চৈতন্য হয় না, সাধুগণও এরূপ মূঢ় জীবকে আপন কার্যের ভাব বুঝাইতে বৃথা চেষ্টা করেন না, তাঁহারা নীরবে আপন ভাবানুযায়ী পথে চলিয়া যান। ভক্ত তুলসীদাস বলিয়াছেন :-

"হস্তী চলে বাজার মে,কুত্তা ভুখে হাজার
সাধু কা দুর্ভাব নাহি, যব নিন্দে সংসার।'

জীবগণ অজ্ঞান জনিত কর্ম্ম-মালিন্যের দ্বারা আপনচিত্তকে যত আবরিত করে, ততই তাহার নিম্নগতি অনিবার্য্য হয়, জীব মাত্রেরই হৃদয়ে সদসৎ ভাবগুলি বীজরূপে নিহিত থাকে এবং সঙ্গের দ্বারা উহা অঙ্কুরিত হইয়া ফলবান হয়। সাধুগণ অসদ্ভাব বৃদ্ধি করিয়া সদ্ভাবগুলিকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে কিন্তু স্বর্ণকার যেমন সোহাগার দ্বারা স্বর্ণের মল বিনষ্ট করিয়া জলের দ্বারা ঐ সোহাগাকেও ধৌত করিয়া ফেলে সেইরূপ সাধুগণ সদ্ভাবের দ্বারা অসদ্ভাবের বীজগুলিও জনন শক্তি নষ্ট করিয়া চৈতন্যরসে ঐ সদ্ভাবগুলিকে ডুবাইয়া শিবত্ব লাভ করে।

মনের তিন রকম ভূমি, অজ্ঞান ভূমি, জ্ঞানভূমি ও চৈতন্য ভূমি। দেহান্ত-সময়ে মন অজ্ঞান ভূমিতে অবস্থান করিলে মৃত্যুপথগামী হইয়া নরক যাতনা ভোগ করে, জ্ঞান ভূমিতে অবস্থান করিলে জীবন-পথে ক্রম মুক্তির আনন্দ ও চৈতন্য ভূমিতে অবস্থান করিলে প্রকৃতির অতীত হইয়া সদ্য মুক্তির পরমানন্দ লাভ করে। ভাবই মনের উন্নতি বা অবনতির কারণ। থারমমিটারের পারা যেমন তাপ পাইলে উদ্ধে উঠে ও তাপের অভাবে নামিয়া পড়ে, সেইরূপ সদ্ভাবের তাপে মন উর্দ্ধস্তরাভিমুখে উন্নীত হয় এবং অসদ্ভাবে নিম্নস্তরে নামিয়া যায়, এই ব্রহ্মাণ্ডে চৈতন্যের যতগুলি স্তর আছে, ব্রহ্মাণ্ডের মানচিত্র স্বরূপ জীবের দেহ ভাণ্ডেও তাহা আছে, সাধনের দ্বারা ভাবগুলি যে পরিমাণে উর্দ্ধগামী হইবে, দেহান্তে ব্রহ্মাণ্ডের সেই স্তর পর্য্যন্ত তাহার গতি অব্যাহত থাকিবে। অতএব ভাই উন্নত হইবার চেষ্টা কর, অজ্ঞানের কুহকে ক্ষণস্থায়ী জীবনটাকে বৃথা নষ্ট করিয়া অনন্ত যাতনার বীজবপন করিও না, মোহ-নিদ্রা হইতে জাগরিত হও, কাপুরুষের ন্যায় প্রবৃত্তির দাস হইও না, বীরের ন্যায় প্রবৃত্তির প্রভু হইয়া বিষয় ভোগ কর। নারিকেলের ছোবড়া খুলিয়া জল খাওয়ার ন্যায় রূপ রসাদি বিষয়ের মধ্য হইতে চৈতন্য-রস আহরণ কর, কর্ম্মকে সদ্ভাবের ছাঁচে ঢালিয়া জীবন পথে অগ্রসর হও, তাহা হইলে শীঘ্রই ধর্ম্মের বিমল আনন্দ উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইবে। শাস্ত্রে তিন সত্য করিয়া বলিতেছেন—

"ধর্ম্মাদ্ধি সুখং ধর্ম্মাদ্ধি সুখং ধর্ম্মাদ্ধি সুখং"।

অনেকে কর্ম্মকে ধর্ম্ম মনে করিয়া প্রবঞ্চিত হয়, উপায়কে উদ্দেশ্য মনে করায় আনন্দ লাভ করিতে পারে না। কর্ম্ম—উপায় ও ধর্ম্ম—উদ্দেশ্য, অর্থোপার্জ্জনরূপ উপায়ের উদ্দেশ্য ভোগ করা, কিন্তু উপার্জ্জনকেই উদ্দেশ্য মনে করিয়া ভোগ না করিলে যেমন কষ্টমাত্র সার হয়, ভোগের সুখলাভ করা যায় না সেইরূপ যে কর্ম্মের দ্বারা ধর্ম্মের বিমল আনন্দ লাভ করা যায় না তাহা দুঃখ জনক অকর্ম্ম মাত্র, তামসিক ও রাজসিক কর্ম্মের দ্বারা নিম্ন ও মধ্যগতি মাত্র লাভ হয়, কিন্তু দুঃখময় অজ্ঞান ভূমি হইতে উন্নীত হওয়া যায় না। তাই বলিতেছি যে, সাধুসঙ্গের দ্বারা কর্ম্মের স্বরূপ অবগত হও, একমাত্র সাত্ত্বিক কর্ম্মই ধর্ম্মমন্দিরে প্রবেশ করিবার সোপান এবং জ্ঞান সেই মন্দিরের দ্বার স্বরূপ। গীতায় ভগবান বলিয়াছেন "যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্" অতএব প্রথমতঃ সাত্ত্বিক কর্ম্মের তত্ত্ব অবগত হইয়া তদ্দ্বারা জ্ঞানলাভ পূর্ব্বক যখন ধর্ম্মের উপলব্ধি করিতে পারিবে এবং ভাবের সোপান অবলম্বন করিয়া চৈতন্যের স্তরে উন্নীত হইতে থাকিবে, তখন আর ভয় থাকিবে না, নিত্যানন্দে হৃদয় পূর্ণ হইয়া যাইবে, সামান্য অগ্নির দ্বারা যেমন একটা প্রদেশ দগ্ধ হয় সেইরূপ ধর্ম্মের উপলব্ধি অল্প পরিমাণে হইলেও উহা মহাভয় হইতে ত্রাণ করে ইহা ভগবদ্বাক্য, গীতায় তাঁহার এই অভয় বাণী জ্বলন্ত অক্ষরে লিখিত আছে, তিনি বলিয়াছেন—

"স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ"।

পাঠকগণ! ধর্ম্ম ও কর্ম্মের তত্ত্ব মন ও চৈতন্যের সংযোগ রহস্য বিশদ ভাবে বুঝাইবার ইচ্ছাছিল কিন্তু প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়া পড়িয়াছে দেখিয়া এই স্থানেই ক্ষান্ত হইলাম। অবশেষে পাঠকগণের নিকট আমার নিবেদন যে, তাঁহারা যেন মধ্যে মধ্যে এই প্রবন্ধটী পাঠ করেন, নিঃস্বার্থ ভাবের প্রভাব ও কার্য্যকারিতা শক্তি অসীম, সেই জন্যই ভগবৎ প্রেরণায় কেবল লোকহিতের জন্য ইহা প্রচার করা হইল, পাঠে যদি পাঠকের হৃদয়ে সদ্ভাবের বীজ সঞ্চার হইয়া একজনেরও চিত্ত ভগবন্মুখীন হয় তাহা হইলেও আমি কৃতার্থ হইব।

শ্রীহরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

শ্রীশ্রীঈশ্বরতত্ত্ব

(অখণ্ডাকারতত্ত্ব)

পুষ্করিণীতে একটি ঢিল ফেললেই দেখিতে পাইবেন যে যেখানে সেই ঢিলটি পড়ে প্রথমে তাহার চতুর্দ্দিকে একটি বৃত্তাকার তরঙ্গ উৎপন্ন হয়, তারপর ঐ তরঙ্গের চারিপাশে আর একটি বৃহত্তর বৃত্তাকার তরঙ্গ উঠে, পুনরায় সেই দ্বিতীয় তরঙ্গের চারিপার্শ্বে তৃতীয় তরঙ্গ তৃতীয় তরঙ্গের চারিধারে চতুর্থ তরঙ্গ ইত্যাদি ক্রমে বহু বহু বীচিমালা সঞ্জাত হইয়া শেষে তরঙ্গের আঘাত যতই স্বল্প হউক না —তীর ভূমিকে স্পর্শ করে।

জগতের কর্ম্মাবলীও ঠিক ঐরূপে পরস্পর সংশ্লিষ্ট ও একের পর এক ক্রমে অনন্তকর্ম্ম উদ্ভূত হয়। পৃথিবী যেন কর্ম্মের সমুদ্র, অতীত ও বর্ত্তমান যুগের মানবেচ্ছা যেন বাতাস, সেই ইচ্ছানিলসংযোগে কর্ম্মের উর্ম্মিমালা সদাই জগতার্ণবে প্রবহমান রহিয়াছে। কোন কর্ম্মই স্বতন্ত্র বা পৃথক নহে। শৃঙ্খলের ন্যায় একটি আর একটির সহিত সংযুক্ত আছে। সুতরাং কতকগুলি কর্ম্ম প্রত্যক্ষ বা দৃষ্ট আর কতকগুলি পরোক্ষ বা অদৃষ্ট এই পরোক্ষগুলিই অদৃষ্ট নামে অভিহিত হয়।

জীবগণও ঐরূপ পরস্পর সংসৃষ্ট ও সাপেক্ষ। পরস্পর পৃথক প্রতীয়মান হয় বটে—বস্তুতঃ কিন্তু পৃথক নয়। 'সূত্রে মণিগণাইব' একপাশে সকলেই আবদ্ধ আছে। কেহই কাহাকে ছাড়িয়া যাইবার যো নাই।

গ্রহ-নক্ষত্রগণও তাই। দেখিলে পৃথক মনে হয় কিন্তু সে মরুভূমির মরীচিকা ভ্রম মাত্র। পৃথক নয়—পরস্পর গাঁথা আছে। এক মহা আকর্ষণে সকলেই সংবদ্ধ আছে। কোথাও যাইবার উপায় নাই।

মনে করুন আপনি ময়দা খাইবেন; আপনার ঐ খাওয়া ক্রিয়ার জন্য আর একজনকে গম পেষণ করিতে হইবে। আবার তাহার ঐ পেষণ ক্রিয়ার জন্য আর একজনকে প্রস্তর ছেদন ও অন্য একজনকে গম উৎপাদন করিতে হইবে। তজ্জন্য লোহের প্রয়োজন। তজ্জন্য একজনকে খনি হইতে লৌহ সংগ্রহ করিতে হইবে। একজনকে লৌহ বহন করিতে হইবে ইত্যাদি ক্রমে গণনা করিলে সকল কর্ম্মই পরস্পর সাপেক্ষ প্রতীত হইবে।

ক্রিয়াগুলি সাপেক্ষ হইলে ঐ ঐ ক্রিয়ার কারক জীবগুলিও যে পরস্পর সাপেক্ষ তাহা আর বুঝাইতে হয় না যিনি লেখক তিনি লেখনী নির্ম্মাতার

মুখাপেক্ষী। লেখনী নির্ম্মাতা আবার লৌহ সংগ্রাহকের মুখাপেক্ষী ইত্যাদি ইত্যাদি। পশুপক্ষী গ্রহ নক্ষত্রের মধ্যেও তাই।

তবেই এখন বুঝুন বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ও তৎস্থিত জীবনিচয় কর্ম্মাবলী সকলে একত্রে বা সাকল্যে এক অখণ্ড বস্তু কিনা? শুধু চোখের দেখায় পৃথক মনে হইতে পারে; কিন্তু একবার জ্ঞানের সেই তৃতীয় নয়ন দিয়া দেখুন দেখি, বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডাবলী এক অখণ্ড চৈতন্যময় পদার্থ কিনা এবং তাহা সেই 'একেরই' একাংশ স্বরূপ সেই একেরই মহিমাখ্যাপন করিতেছে কি না? ঠিক যেন একটা সুবৃহৎ বিশ্বযোড়া জয়েণ্টষ্টক কোম্পানি বা যৌথ কারবার। কতকগুলি মনুষ্য,পশু, ভূমি, জল ও মাল মসলার সমষ্টি বা সমাহার।

শ্রীসত্যচরণ চন্দ্র বি, এ

সতর্কতা

(১)

অবিদ্যা-বিলাসে রহিলে মজিয়া।
দেখিলে না কভু চক্ষু উন্মীলিয়া॥
যতনের ধন জীবন রতন
প্রবল দস্যুতে লইল লুটিয়া॥

(২)

অসার অর্থের রক্ষণাবেক্ষণে।
রেখেছ চতুর দ্বারবান গণে॥
শূন্য নবদ্বার, রাখিয়া বিহার,
করিছ ভুলিয়া বিষয়-বাসনে॥

(৩)

থাকিতে সময় হওরে চেতন।
দূর ক'রে দাও গুপ্ত দস্যু গণ॥
জ্ঞানখড়্গা ধরে, প্রতি দ্বারে দ্বারে
প্রহরি হইয়া কররে ভ্রমণ॥

(৪)

কিম্বা রুদ্ধ করি খোলা নবদ্বার।
অমূল্য জীবন দাও উপহার॥
শ্রদ্ধা ভক্তি সহ শ্রীহরি চরণ—
(ভাব) ভব ভয়ে যদি পাইবে উদ্ধার॥

শ্রীভূপতি চরণ বসু।

শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুর

ইঁহার নিবাস বর্দ্ধমান জেলার অধীন কাটোয়ার সান্নিধ্য শ্রীখণ্ড নামক গ্রামে। ইনি অম্বষ্ঠ কুলোদ্ভব। শ্রীমন্মহাপ্রভুর পার্ষদ মধ্যে যদিও বিখ্যাত কিন্তু মূল গ্রন্থ মধ্যে দেখা যায়, ইনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীনবদ্বীপ লীলা একবারেই দর্শন করেন নাই। শ্রীচৈতন্যলীলার মূল মুখ্যগ্রন্থ শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত মহাকাব্য, ইহা শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপাপ্রাপ্ত এবং পণ্ডিতপ্রবর শ্রীকবিকর্ণপুর মহাশয় দ্বারা বর্ণিত। এই গ্রন্থ শ্রীমন্মহাপ্রভুর অপ্রকটের ৯ বৎসর পরে প্রণয়ন হইয়াছিল, গ্রন্থের শেষভাগে ত্রয়োদশ স্বর্গে কেবল এই কয়েকটী কথামাত্র বর্ণনা করিয়াছেন। যথা—

ইত্থং শ্রীপুরুষোত্তমে স্থিতবতি প্রত্যাসমা সীদ্ধনিঃ
সর্ব্বেসাং বিদিশাং দিশাঞ্চ জনতা সোৎকণ্ঠা মেবাগতা।
যে চান্যো খলু সত্যরাজ সুমতিস্তদভ্রাতৃ পুত্রাদয়ো
যে চান্যো রঘুনন্দনো নরহরি শ্রীমুকুন্দাদিক ইতি।

অর্থাৎ - এইরূপে শ্রীগৌরচন্দ্র শ্রীপুরুষোত্তমে স্থিত হইলেই প্রতি দিকে ধ্বনি হওয়ায়, সমস্ত দিগ্বিদিকের লোকসকল অত্যুৎকণ্ঠায় সমাগত হইল। তথা সত্যরাজ সুমতি এবং তাঁহার ভ্রাতৃ-পুত্রাদি ও অন্যান্য যে সকল রঘুনন্দন, নরহরি ও মুকুন্দ প্রভৃতি বহুবিধ ভক্তসকল সমাগত হইল।

উক্ত গ্রন্থে শ্রীনরহরি প্রভৃতির নামগন্ধ এই পর্য্যন্তই শেষ হইল, ইহা ভিন্ন অন্য কোন কথাই বর্ণনা দেখা যায় না।

শ্রীমন্মহাপ্রভু অপ্রকট হইয়াছিলেন ১৪৫৫ শকে, উক্ত গ্রন্থ প্রণয়ন হইয়াছে ১৪৬৪ শকের আষাঢ় মাসের সোমবারে কৃষ্ণপক্ষীয় দ্বিতীয়া তিথিতে। যথা—

বেদারসাঃ শ্রুতয় ইন্দু রিতি প্রসিদ্ধে
শাকে তথা খলু শুচৌ শুভগেচ মাসি।
বারে সুধা কিরণ নাম্নাসিত দ্বিতীয়া
তিথ্যন্তরে পরিসমাপ্তি রভূদমুষ্যা ॥

আবার ঐ কবিকর্ণপুর মহাশয় কৃত শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রোদয় নাটকের নবমাঙ্কে যাহা বর্ণনা হইয়াছে তাহাও শ্রবণ করুন।

অর্থাৎ—তন্মধ্যে গৌড় দেশীয় লোক ভগবানের প্রিয়, গৌড়ীয়গণের মধ্যে অতিপ্রিয় শত শত ব্যক্তিকে দর্শন করিলাম। তাঁহারা ইহাকে পূর্ব্বে না দেখিলেও অতীব সৌভাগ্যশালী। যেমন খণ্ডবাসী নরহরি প্রভৃতি ভাগ্যবানগণ প্রথমে ইহাকে দরশন করেন নাই এক্ষণে প্রতি বৎসর পুরুষোত্তমে আগমন করেন। এই উভয় গ্রন্থে শ্রীনরহরি প্রভৃতির পরিচয় বা ইহাঁদের গুণগ্রাম এই পর্য্যন্তই বর্ণনা হইয়াছে। ইহাতে যাহা বুঝা যায় পাঠক পাঠিকাগণ বিচার করিয়া দেখিবেন। এই গ্রন্থ শ্রীমন্মহাপ্রভুর অপ্রকটের ৩৯ বৎসর পরে প্রণয়ন হইয়াছিল।

আহা! যাঁহার উচ্ছিষ্ট ভক্ষণে আমার কাব্যের রচয়িতা বাগ্বাদিনীর অনুগ্রহ ভাজন হইয়াছি, সেই ভগবান শ্রীগৌরাঙ্গচন্দ্রের গুণাবলী কীর্ত্তন করিয়া আমার যাহা কর্ত্তব্য তাহাই করিয়াছি ইহাতে যে পণ্ডিতগণ অনুবাদ করিবেন তাঁহারা অন্য বিষয় শ্রবণ করুন। আমি এই অপূর্ব্ব গৌরাঙ্গচরিত্রের নিরন্তর বন্দনা করি, কিন্তু তাঁহারা এই লীলাকে যেন আমার স্বকপোল কল্পিত মনে না করেন, ইহাই আমার প্রার্থনা।

আমি যেমন দেখিয়াছি ও যেমন শুনিয়াছি তদনুসারেই এই শ্রীচৈতন্যের পবিত্র কথাবলিকে যথামতি গ্রন্থরূপে নিবদ্ধ করিলাম, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, তাঁহার প্রিয়মণ্ডলী একবারেই অন্তর্হিত সুতরাং এই কথা কীর্ত্তনগুণে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। ইহাই হইতেছে শ্রীগ্রন্থকারের নিজোক্তি। তাঁহার দেখা কথাই তিনি গ্রন্থরূপে নিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, ইহাতে অবিশ্বাস করিবার কোন কারণই নাই। তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন শ্রীখণ্ডের শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুর প্রভৃতি শ্রীমন্মহাপ্রভুকে নীলাচলে গিয়াই দর্শন করিয়াছিলেন। এই সমস্ত কথাতে আস্থা না করিয়া যাহারা কতকগুলি আধুনিক বাজে বহির কথা লইয়া প্রবন্ধ লেখালেখি করেন, তাঁহাদিগকে আর কি বলিব; বলুন। আরও দেখুন শ্রীচৈতন্যলীলাতে যিনি সাক্ষাৎ বেদব্যাস সেই শ্রীবৃন্দাবন

দাস ঠাকুর, আপন গ্রন্থে অর্থাৎ শ্রীচৈতন্য ভাগবত গ্রন্থের মধ্যে যে নরহরি প্রভৃতির নাম পর্য্যন্ত বর্ণনা করেন নাই, সেই নরহরিকে লইয়া এত আন্দোলন করা অতি অসঙ্গত। বিশেষতঃ তিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর অতি অন্তরঙ্গ পার্ষদের মধ্যে কেহ ছিলেন, এই কথা কিরূপে বিশ্বাস করিতে পারা যায় বলুন? যে বৃন্দাবন দাস ঠাকুর মহাশয় সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থ প্রণেতা শ্রীকৃষ্ণ দাস কবিরাজ মহাশয় আপন গ্রন্থের আদি ৮ পরিচ্ছেদে বর্ণনা করিয়াছেন যে,—

"ওরে মূঢ় লোক শুন শ্রীচৈতন্য মঙ্গল। চৈতন্য মহিমা যাতে জানিবে সকল। কৃষ্ণলীলা ভাগবতে কহে বেদব্যাস। চৈতন্য লীলাতে ব্যাস বৃন্দাবন দাস। মনুষ্য রচিতে নারে ঐছে গ্রন্থ ধন্য। বৃন্দাবন দাস মুখে বক্তা শ্রীচৈতন্য।" এই শ্রীচৈতন্য ভাগবত গ্রন্থে যাহাদের বিশ্বাস নাই, যে গ্রন্থের মধ্যে শ্রীনরহরির প্রভৃতির নাম পাওয়া যায় না, তাঁহারা শ্রীমহাপ্রভুর পার্ষদের মধ্যে কেহ বটেন কি না তাহা তাঁহারাই বলিতে পারেন, আমরা এই সম্বন্ধে আর কিছুই বলিতে চাহি না।

শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী মহাশয় শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থের মধ্যে ১৩শ পরিচ্ছেদে বর্ণনা করিয়াছেন যে,—

"খণ্ডের সম্প্রদায় করে অন্যত্র কীর্ত্তন। নরহরি নাচে তাঁহা শ্রীরঘুনন্দন।

এই লেখাতেই অনুমিত হইতেছে যে, শ্রীনরহরি প্রভৃতি ভক্তগণ শ্রীমন্মহাপ্রভুর সমভিব্যাহারে শ্রীসংকীর্ত্তন করিতেও সমর্থবান ছিলেন না। শ্রীলোচনদাসের কৃত আধুনিক শ্রীচৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থ-সম্বন্ধে রাঢ়দেশে একটা বরাবর প্রবাদ চলিতেছে যে শ্রীচৈতন্য ভাগবত গ্রন্থে শ্রীনরহরি প্রভৃতির নামোল্লেখ না থাকার কারণেই শ্রীনরহরি দাস আপন শিষ্য শ্রীলোচন দাসকে দিয়া শ্রীচৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

শ্রীপ্রেমবিলাস গ্রন্থখানিও সেইরূপ শ্রীখণ্ড নিবাসী শ্রীনিত্যানন্দ দাস "শ্রীগ্রন্থ কর্ত্তা" ইনি জাতিতে বৈদ্য এবং শ্রীনরহরি দাসের আত্মীয় বলিয়াই শ্রীশ্রীনিবাস আচার্য্য ব্রাহ্মণ কুলোদ্ভব হইলেও তাঁহাকে দিয়া শ্রীনরহরি দাসের দাসত্ব পর্য্যন্ত বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। ফলকথা বৈদ্যজাতি সকল অতিশয় স্বজাতি বৎসল বলিয়াই এই সকল গ্রন্থের প্রকাশ হইয়াছে কিন্তু এই সমস্তগ্রন্থ অতিশয় আধুনিক।

শ্রীপ্রেমবিলাস গ্রন্থ শ্রীমন্মহাপ্রভুর অপ্রকটের প্রায় দুইশত বৎসর পরে

প্রণীত হইয়াছিল। এই শ্রীপ্রেম বিলাস গ্রন্থের পরিশিষ্ট গ্রন্থ হইতেছেন শ্রীকর্ণানন্দ এবং শ্রীভক্তিরত্নাকর ইত্যাদি। শ্রীভক্তিরত্নাকরের জন্ম ১৩০ কি ১৪০ বৎসরের অধিক নহে।

এই সকল আধুনিক গ্রন্থের পয়ার গুলি প্রমাণ স্বরূপ গ্রহণ করিয়া, অনেকেই শ্রীনরহরি দাসকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর নবদ্বীপ লীলার সাক্ষী করিতে চাহেন। আবার পদকল্পতরুর সংগৃহীত আধুনিক কবির পদগুলিতে এক্ষণে শ্রীনরহরি দাসের অনুকূলে আসিতেছে।

যথা শ্রীমন্মহাপ্রভুর—সন্ধ্যা আবত্রিক পদের মধ্যে বর্ণনা হইতেছে যে, "নরহরি গদাধর চামর ঢুলায়" এই পদটী শ্রীনরহরি দাসের মন্ত্র শিষ্য দ্বারা প্রণীত, নতুবা এরূপ অসঙ্গত কথা বর্ণনা হইবে কেন? যে হেতু পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, শ্রীনরহরি দাস শ্রীমহাপ্রভুর শ্রীনবদ্বীপলীলা আদৌ দরশন করেন নাই, তখন শ্রীনবদ্বীপলীলাকালিন যখন শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবাত্রিক হইয়াছিল, তখন শ্রীনরহরি দাস তথায় ছিলেন না। তবে পূর্ব্ব মহাজন কৃত পদ্যই যদি প্রমাণ স্বরূপ এক্ষণে গ্রহণ হইয়া থাকে। তখন নিম্ন লিখিত পদ্য ছইটী বিশেষ রূপেই প্রমাণ দিতেছে যে, শ্রীনরহরি দাস শ্রীনবদ্বীপ লীলাতে শ্রীমহাপ্রভুর সঙ্গী নহেন। যথা পূর্ব্ব মহাজন কৃত পদ্য। "শ্রীখণ্ডের ভক্তগণে,—মহাপ্রভুর দরশনে নীলাচলে করিলা গমন। দেখি শিবানন্দ ধাইয়া, কহেন প্রভুরে গিয়া, শুনি প্রভু আনন্দিত মন। কহে গোরা গুণমণি, কি নাম কাহার শুনি, আন দেখি দেখি তাঁ'সবারে। শুনি সেন শিবানন্দ, পাইয়া পরমানন্দ, ডাকি আনেন প্রভুর গোচরে। আসিয়া ভূমিতে পড়ি, কাঁদছেন নরহরি, শ্রীরঘুনন্দন শ্রীমুকুন্দ। পুলকে পূর্ণিতকায়, স্বেদজল বহিযায়, মন্দ মন্দ হয় দেহ স্পন্দ। কাতরে কাকুতি করি, কহে সবে ধিরি ধিরি, কি কহিব দুঃখের সবার। নদীয়া বিহাররঙ্গ,সে সুখ হইল ভঙ্গ,দেখিতে না পাইল কিছু তার॥ হাহা প্রভু দয়াময়, দাসে দাও পদাশ্রয়, কৃপাকরি রাখ শ্রীচরণে। এত বলি তিনজন, ধরিলেন শ্রীচরণ, বাসুদেবে থাকি সন্নিধানে।"

"করুণার পারাবার গৌরাঙ্গ আমার। একে একে তুলি কোল দেন বার বার। বলিলেন করুণা করিয়া কত কথা। শুনিয়া প্রভুর কৃপা দূরে গেল ব্যথা॥ সেন শিবানন্দ প্রভু কহিলেন হাসি। স্বজাতি স্ব সন্নিধানে রাখ ভালবসি। যাহ এবে সবে নিজ নিজ বাস স্থানে। এতবলি বিদায় দিলেন তিনজনে। সবারে সাদরে প্রভু বিদায় করিয়া। মধ্যাহ্ন করিতে যান হরিধ্বনি দিয়া। দেখি বসু রামানন্দ আনন্দ পাইল। ভক্ত সঙ্গে শ্রীগৌরাঙ্গের মিলন গাহিল।"

শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিয়া শ্রীনীলাচলে গমন করেন তখন তাঁহার সঙ্গে কে কে গমন করিয়া ছিলেন, তাহাই শ্রীকবিকর্ণপুর মহাশয় শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত মহাকাব্যে বর্ণনা করিয়াছেন—

অর্থাৎ ভূরি করুণ শ্রীগৌরচন্দ্র সন্তুষ্ট চিত্তে যখন শ্রীনিত্যানন্দকে অগ্রে করিয়া গমন করিতেছেন, এমন সময় নিজপদে প্রণত শ্রীগদাধর প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণ মুকুন্দ এবং অন্যান্য ভক্ত সমুদায় কর্তৃক পরিবৃত হইয়া কথঞ্চিৎ দুঃখে প্রভু অবলোকিত হইতে লাগিলেন। এই কথার পাল্টা কথা শ্রীগোলক দাস যাহা গান করিয়াছেন তাহা শ্রবণ করুন "পণ্ডিত শ্রীগদাধর অবধূতবায় নরহরি আদিকবি কত সঙ্গে যায়। ইহাকেই বলে, "মাথা নাই—তার মাথা ব্যথা, অতএব পাঠক, পাঠিকাসকল এক্ষণ বিচার করিয়া দেখুন দুইটী কথার মধ্যে কোন কথাটী সমীচীন ?

অনেক আধুনিক পয়ারে পুঁথীগুলি এক্ষণে মুদ্রাযন্ত্রের কৃপায় মুদ্রিত হইয়া গ্রন্থরূপে পরিগণিত হইয়াছেন। সেই সমস্ত পুঁথীর পয়ার তুলিয়া এক্ষণ অনেক নব্য কবি সকল প্রবন্ধ লেখা লেখি করিয়া গৌড়ীয়-বৈষ্ণব জগতে আদৃত হইবার ইচ্ছা করেন, ইহা অপেক্ষা দুঃখের কথা আর কি হইতে পারে ? কালের কি বিচিত্র গতি !

হায় ! হায় ! কালে কালে হইতেছে কি ? আর হবেই বা কি ? দিন্ দিন কতই নূতন নূতন কথা প্রকাশ হচ্ছে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। নূতন সাধন, নূতন নূতন দেবতা গঠন। নূতনতন্ত্র, নূতনমন্ত্র নূতন নূতন ষড়যন্ত্র। নূতন নূতন নাম, নূতনধাম, নূতন নূতন অধিষ্ঠান। নূতন উপাধি নূতন বিধি, নূতন নূতন হতেছে ব্যাধি। হায় ! হায় ! এ রোগের কি আর ঔষধ নাই ? সকলেই এক্ষণ বড় হইতে সাধ করিতেছে, যাহা সত্য তাহা মিথ্যায় পরিণত করাইয়া, মিথ্যাকে সত্য করিয়া তুলিতেছে কি সর্ব্বনাশের কথা ? হে ভগবান ! হে শ্রীগৌরহরি ! তোমার শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবগণকে এই বিপদ হইতে উদ্ধার কর, প্রভু সত্যের জয় হউক। ইতি *

শ্রীনৃসিংহপ্রসাদ গোস্বামী

---

* এই সম্বন্ধে পাঠকগণ ইচ্ছা করিলে কিছু লিখিতে পারেন আমরা ভক্তিতে মুদ্রিত করিব। (ভঃ সঃ)

ওপারের-দেশ

(১)

আছে গো মরতে অপূর্ব্ব দেশ,
অপূর্ব্ব-সৌন্দর্য্য স্বভাব বেশ!
সকলের কাছে দেয়না দেখা,
সকলেই তারে পায়না হে!

(২)

এপার হইতে ওপারে দেখিলে,
দৃঢ় ধৈরজে, মন না বাঁধিলে,
নদীর মায়াতে সুখ-সৌন্দর্য্য
হেরিবে দুঃখেতে ভরা হে!

(৩)

এপারে যখন ঘোর আঁধার,
জীব-রব শুধুই হাহাকার!
সেপারে তখন দিব্য-আলোকে
জীবানন্দ ধ্বনি শুনি হে!

(৪)

মোদের এদেশে ধনি-নির্ধনী
আছয়ে কতই জ্ঞানী অজ্ঞানী;
ওদেশ এমন—সকলেই সম,
মান-অভিমান নাই হে!

(৫)

এদেশে সকলি ভঙ্গ-প্রবণ,
কালের করালে করে গমন,
সেদেশে কাল মানব-অধীন
মানব-আজ্ঞায় চলে হে!

(৬)

পশু-পক্ষি নর সকলে সেথা
একই সূত্রে সকলেই গাঁথা,
সকলের মন সকলে বুঝে,
সকলেই বন্ধু বান্ধব হে!

(৭)

নাহি সেদেশে চোর দস্যু-ভয়,
সদাই সকলে নিত্য-অভয়,
সদাই সেখানে নিত্য আনন্দ,
বিমল সৌন্দর্য্য শোভে হে!

(৮)

ওপারে গেলে সংসার যাতনা,
ক্ষণিক—বিভব সুখ কামনা
বিনিময়ে এ'র পাইব মুক্তি
অনন্ত দেহে মিশিব হে!

(৯)

চাও যদি তুমি যেতে ওপারে,
মায়া-নদীতে মন-তরণী
ছেড়ে দাও সেই পুর-জোয়ারে;
সত্য তোমার তরীর মাঝি
দয়া-প্রীতি ভক্তি দাঁড়ী মাঝি,
যাবে তরী হুহু ক'রে পর-পারেতে হে

শ্রীশশিভূষণ পাত্র।

গুরুপদাশ্রয়

কৃপা সুধা সরিদ্‌যস্য বিশ্বমাপ্লাবয়ন্ত্যপি।
নীচগৈব সদাভাতি তং শ্রীচৈতন্যমাশ্রয়ে॥

হরিদাস—(গুরুদেবকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাতপূর্ব্বক সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন) প্রভো, বাস্তবিকই আপনি দয়ারনিধি, আমি চক্ষু হারাইয়াছিলাম, মোহতিমির আমাকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল, আমাকে এতদিন এক অদ্ভুত মায়ারাজ্যে ঘুরাইতেছিল, আমি মায়া-পিশাচীর হাতে পড়িয়া মহানন্দে পৈশাচিক আমোদে মজিয়াছিলাম, সাধ করিয়া কাল-সর্পকে কণ্ঠহার করিয়া আনন্দে অধীর হইয়াছিলাম; ক্রমে ক্রমে মোহ-মদিরার নেশা এমন জমিয়া গিয়াছিল যে, নিজের রক্তমাংস ভক্ষণ করিয়াছি—আর আনন্দে তাণ্ডবনৃত্য করিয়াছি। আমি আত্মহা, প্রভো! এখন আমার প্রায়শ্চিত্ত বিধান করুন। যদি কৃপা করিয়া জ্ঞানাঞ্জন-শলাকা দ্বারা আমার মায়ামুগ্ধ চক্ষুকে উন্মীলিত করিলেন তবে তত্ত্বোপদেশামৃত দানে নিস্তেজ চক্ষুকে শক্তিশালী করুন। মোহান্ধকারে থাকিতে থাকিতে আমার দৃষ্টিশক্তি নিস্তেজ ও বুদ্ধিবৃত্তি জড় হইয়া গিয়াছে। প্রেমরাজ্যের উজ্জ্বল-ভাস্কর আমার নিস্তেজ চক্ষুকে ঝলসিয়া দিতেছে সময়ে সময়ে হতাশ আসিয়া আমার চিত্তকে অবসন্ন করিতেছে। প্রভু যদি কৃপা করিলেন তবে আমায় হাতে ধরিয়া লউন, নচেৎ আমি বিনষ্ট হইব। বেশ বুঝিতেছি, মায়া পিশাচী আমাকে এখনও ছাড়ে নাই, কখন্ আবার তাহার হাতে পড়িয়া বিনষ্ট হই, সেই ত্রাসে আমার হৃদয় আতঙ্কিত হইতেছে। প্রভো, দীন হরিদাসের কাতর প্রার্থনা পূর্ণ করুন। (এই বলিয়া হরিদাস গুরুপাদমূলে জানুপরি উপবিষ্ট হইয়া সাশ্রুনয়নে গাহিলেন :—

ছায়নাট—ঝাঁপতাল।

বিঘ্ন বিপদ সম্পদ মাঝে
থেকো সদা হরি আমার নিকটে।
আমি অতি দীন ভক্তি জ্ঞানহীন
হাত ধ'রে মোরে নিও সাথে সাথে॥
পাপ প্রলোভন ফাঁদ পেতে আছে
গ্রাসিবে আমারে একা পেলে।

তাই বলি তোমারে　　যেওনা অন্তরে
থেকো হে অন্তরে হরিদাসের ॥
ভব ভয়ে শঙ্কিত　　তরঙ্গে কম্পিত
ত্রিতাপে লাঞ্ছিত আর্ত্তজনে।
ভব ভয় ভঞ্জন　　নিত্য নিরঞ্জন
সত্য সনাতন রক্ষ দীনে ॥

গুরুদেব—বৎস হরিদাস, দেখিয়া সুখী হইলাম যে অল্পদিনের মধ্যে তোমাতে হরিনাম মহামন্ত্রের কাজ আরম্ভ হইয়াছে; অসাড় অবসন্ন রোগীর চিকিৎসার একমাত্র মহৌষধি এই তারকব্রহ্ম হরেকৃষ্ণ হরিনাম; ইহা অমোঘ ঔষধি, তবে রোগের মাত্রা বিবেচনায় কাহার বা সত্বর কাহার বা বিলম্বে ফললাভ হয়। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী কি বলিতেছেন শুন :—

এক কৃষ্ণ নামে করে সর্ব্বপাপ নাশ।
প্রেমের কারণ ভক্তি করেন প্রকাশ ॥
হেন কৃষ্ণনাম যদি লয় বহুবার।
তবু যদি প্রেম নহে নহে অশ্রুধার ॥
তবে জানি অপরাধ তাহাতে প্রচুর।
কৃষ্ণনাম বীজ তাহে না হয় অঙ্কুর ॥

শ্রীচরিতামৃত।

অন্যস্থলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সহিত কথোপকথনে ঠাকুর হরিদাস বলিতেছেন কি শুন :—

নামের অক্ষর সবের এই ত স্বভাব।
অব্যবহিত হৈলে না ছাড়ে আপন স্বভাব ॥
নামাভাস হইতে সর্ব্ব সংসারের ক্ষয়।
নামাভাস হৈতে হয় সর্ব্ব পাপ ক্ষয় ॥
নামাভাসে মুক্তি হয় সর্ব্বশাস্ত্রে দেখি।
শ্রীভাগবতে তাহা অজামিল সাক্ষী ॥

শ্রীচরিতামৃত।

বৎস! তোমার ব্যাকুলতা দেখিয়া আমি সুখী হইলাম। ব্যাকুলতাই সজীবতার লক্ষণ, মোহান্ধ জীবের আত্মদৃষ্টি না হইলে তাহার উদ্ধারের আশা কোথায়? ব্যাধিগ্রস্থ ব্যক্তি যদি তাহার ব্যাধির খবর না রাখে, তবে ঔষধের

চেষ্টা হইবে কেন? বহুমূত্র রোগে অন্তঃসার শূন্য হইয়া যাইতেছে কিন্তু মূর্খ জীব তাহার খবর না রাখিয়া তবুও বিষতুল্য মিঠাই খাইতেছে। এতদিন তুমি যে সমস্ত প্রশ্ন করিয়াছ, এখন ক্রমে তাহা আলোচনা করিবার তোমার যোগ্যতা আসিবে। ঈশ্বরতত্ত্ব অতি দুর্ব্বোধ্য, "ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াম্"। এই মহাবাক্যের দ্বারাই তাহা বুঝিতেছ, আমাদিগের ন্যায় জড়বুদ্ধিসম্পন্ন, ভজনবিহীন জনের এ সমস্ত লইয়া নাড়া চাড়া করা ঠিক বলিয়া মনে হয় না, তজ্জন্য এতদিন তুমি বারম্বার অনুরোধ করিলেও আমি উহাতে ক্ষান্ত ছিলাম। এক্ষণে তোমার আগ্রহাতিশয্য ও প্রভুপাদের আদেশে পঙ্গুকে গিরি উল্লঙ্ঘনে প্রবৃত্ত করাইল; জানিনা মহাপ্রভুর কি ইচ্ছা।

যুক্তকরে দণ্ডায়মান হইয়া তখন গুরুদেব স্তোত্র পাঠ করিলেন।

"মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিং।
যৎ কৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দ মাধবম্॥

ভাঃ ১।১।১ ভাবার্থদীপিকায়াম্।

হে পতিতপাবন শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর, তোমার কৃপায় অন্ধ চক্ষু পায়, খঞ্জ হেঁটে যায়, বোবা গীত গায়, বধির শুনে, তোমার লীলামৃত কোটী সমুদ্রগম্ভীর, আজ তাহার কণাস্পর্শ করিতে প্রবৃত্ত করাইলে, দেখিও যেন অপরাধ-ভাগী না হই।

বৎস, আমি শাস্ত্রাদি-জ্ঞানসম্পন্ন পণ্ডিত নহি বা মহাভাগবত নহি; নিতান্ত দীনহীন অকিঞ্চন প্রেমভিখারী মাত্র। সাধু-বৈষ্ণব পদরজঃ আমার সম্বল, আর শ্রীগৌরাঙ্গ নামমাত্র আমার ভরসা; যাহা কিছু সাধু মহাজনের নিকট শুনিয়াছি বা যাহা মহাপ্রভু কৃপা করিয়া বুঝাইয়াছেন তাহাই আমার পুঁজি, যদি কোনস্থল সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ বা সাধুজনমতবিরুদ্ধ হয়, কৃপা করিয়া অসঙ্কোচে আমার ভ্রম সংশোধন করিয়া চক্ষুদান দিও। মহাপ্রভুর চরিতামৃত আস্বাদনে ভক্তগণেই অধিকারী, যখন ভাগ্য প্রসন্ন হইয়াছে, আইস আমরা তাঁহাদের উচ্ছিষ্ট লেহনে প্রবৃত্ত হই।

হরিদাস—প্রভো, আমি এতদিন অবিদ্যার কুহকে পড়িয়াছিলাম, ষোড়শোপচারে তাহারই পূজা করিয়া আসিয়াছি। মায়া আমাকে এমনই মন্ত্রমুগ্ধ করিয়াছে যে, এখন জ্ঞানালোকের উন্মেষ হইতেছে দেখিয়াও নানাপ্রকার ধাঁধা ও সন্দেহ আসিয়া আমাকে আচ্ছন্ন করিতেছে, এমন কি মহাপ্রভুর শ্রীমুখবাণীর উপর আস্থা দৃঢ় হইতেছে না এ মোহতিমির হইতে আমার

উদ্ধার অসম্ভব বোধ হইতেছে, প্রভো, আপনার শ্রীপদে শরণ লইলাম, শরণাগত দাসকে কৃপা করুন।

গুরুদেব—বৎস হরিদাস, অধীর হইও না, হতাশ হইবার কিছুই নাই, তোমার নৌকা উত্তাল তরঙ্গে পড়িয়াছে সত্য, তোমার নিজ শক্তিতে আর নৌকা ঠিক রাখিতে পারিতেছ না তাহা বুঝিতেছি, কিন্তু তাই বলিয়া এখন আঁকু পাঁকু করিলে হইবে না, সুদক্ষ কর্ণধারের আশ্রয় গ্রহণকর, তাঁহাকে আত্মসমর্পণ করিয়া জীবন তরণীর কাণ্ডারী কর, দেখিবে সুচতুর কর্ণধারের সুকৌশলে নৌকাখানি তুঙ্গ তরঙ্গরাজির উপর দিয়া হেলিতে দুলিতে নাচিতে নাচিতে চলিয়া যাইবে। বৎস আশাবদ্ধ হও; শ্রীগুরুপদাশ্রয় করিয়া ক্রিয়া তৎপর হও। এটী বিশেষ স্মরণ রাখিও যে সর্ব্ব-কারণ-কারণ সর্ব্ব-মঙ্গলালয় শ্রীগৌরাঙ্গদেব তোমাকে এইরূপ বিপন্ন দেখিয়া নিশ্চিন্ত নহেন। তিনিও সর্ব্বদাই তোমাকে কৃপা করিবার জন্য উন্মুখ হইয়াই আছেন। তোমাকে প্রকৃতই হাতে ধ'রে সাথে সাথে নিবার জন্য সাথে সাথে ফিরিতেছেন; কখন্ যে তোমার আত্মদৃষ্টি হইবে, কখন্ যে তুমি কাতরভাবে প্রপন্ন হইয়া তাঁহার দিকে তাকাইবে আর ডাকিবে "হে প্রপন্নভয়ভঞ্জন, আমায় রক্ষা কর", তিনি তাহাই প্রতীক্ষা করিতেছেন। তোমার ডাকের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার অভয়হস্ত নামিয়া তোমাকে মায়া-সংসার-সাগর হইতে উদ্ধার করিয়া সচ্চিদানন্দধামে লইয়া যাইবে। বাজে কথা নয়, প্রভুর শ্রীমুখনিঃসৃত অভয়বাণী;—

সকৃদেব প্রপন্নোযস্তবাস্মীতি চ যাচতে।
অভয়ং সর্ব্বদা তস্মৈ দদাম্যেতদ্ ব্রতং মম॥ হরিভক্তিবিলাস।

যে ব্যক্তি প্রপন্ন হইয়া একবার মাত্র বলে যে "আমি তোমার হইলাম, আমি সর্ব্বকালের জন্য তাহাকে অভয় প্রদান করিয়া থাকি ইহাই আমার ব্রত জানিবে"।

হরিদাস—(সোৎসাহে) আজ্ঞে প্রভো, একবার ডাকিলেই কি তবে হইবে?

গুরুদেব—অত উতলা হইওনা, ভাল করিয়া বুঝ, এইরূপ অসার পল্লবগ্রাহিত্বে আজকাল সব নষ্ট হইতেছে। দিবারাত্র আমরা যে কত বড় বড় কথা বলি তাহার ইয়ত্তা নাই, কিন্তু কোনটাই অন্তরে পৌছে না; সবই উপরে ভাসিয়া যায়। আজকাল শাস্ত্রালোচনার এত বাড়াবাড়ি হুড়াহুড়ি হইয়াছে যে, এমন দিন নাই যেদিন পথে ঘাটে রেলে বা ষ্টীমারে সেই

বেচারিকে নিয়ে টানাটানি না হচ্ছে, অথচ দেখা যায় তাহার একটী বর্ণও কাহারও ভিতরে প্রবেশ করে না। এই বিপদই শক্ত বিপদ হ'য়েছে। হাঁ একবার ডাকিলেই হবে সেটী নিশ্চিত, নিশ্চিত কেন সুনিশ্চিত; যেহেতু স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন যে ইহাই আমার ব্রত অর্থাৎ অবিচল পাকা নিয়ম, কিন্তু প্রপন্নহ'য়ে ডাকা চাই। মুখে মুখে বেগার দিলে বা মনকে চোখঠার দিলে হইবে না। সর্ব্বান্তঃকরণে আত্মসমর্পণ চাই। যখন কথা উঠিল তখন এই শ্লোকটী ভাল করিয়া আলোচনা করা যাউক।

ব্রত—বলিবার উদ্দেশ্য যে উহা সনাতন, অলঙ্ঘনীয় পাকা নিয়ম, সুতরাং ইহার উপর নিশ্চিতভাবে সকলে দৃঢ় আস্থা করিতে পারেন।

সর্ব্বদা—এরূপ ডাকের কোনরূপ কালাকাল নাই। কেহ যেন মনে না করেন যে এতকাল যখন ভুলেও তাঁহাকে ডাকি নাই বরং নানাপ্রকার পাপকার্য্যই করিয়াছি, তখন আর এখন শেষ অবস্থায় ডাকিলে কি হইবে! এরূপ বিচারের কোন কারণ নাই। যে কোন সময়েই হউক ডাকিলেই হইল, তাঁহার করুণা চিরদিন সমানভাবেই বর্ষিত হইতেছে।

প্রপন্ন—[প্র + পদ + ক্ত] = প্রাপ্ত, শরণাগত।

প্রকৃষ্টভাবে শ্রীপাদপদ্মে পতিত হইতে হইবে। অর্থাৎ নিজের হাতে (গাঁটীতে) কিছু না রাখিয়া সটান তাঁহার শ্রীচরণে পতিত হইয়া সেই অভয় চরণে শরণ লইতে হইবে। ইহাকেই বলে আত্মসমর্পণ। তখন আর আমিত্বের কিছুই থাকিবে না, সমস্তই তাঁহার। কামনা চলিয়া যাইবে, সুখ দুঃখ বোধ থাকিবে না; তোমার জিনিষ, তুমি যেরূপে রাখিয়া সুখী হও, সেইরূপে রাখ, এই একমাত্র কথা। সাধকের এই ভাবই গোপীভাব। তুমি গৃহে রাখিয়া সুখী হও, আচ্ছা তাই রাখ; কুলে জলাঞ্জলি দিলে সুখী হও, তাই কর, আমি সাজসজ্জা, অলঙ্কার পরিলে সুখী হও, আচ্ছা তাই করিব, আবার বিবসনা করিয়া সুখ পাও, তাই কর; জিনিষ তোমার ভাল মন্দ তোমার, নিন্দা খ্যাতি সবই তোমার, আমাদের কি, আমাদের কেবল এককথা "যাহাতে তুমি সুখী হও, তাই কর।" এইখানে মহাভাগবত কবিরাজ গোস্বামী গোপীভাবের কিরূপ আভাস দিয়াছেন শুন :—

লোকধর্ম্ম, দেহধর্ম্ম, দেহধর্ম্ম কর্ম্ম।
লজ্জাধৈর্য্য, দেহসুখ, আত্মসুখমর্ম্ম॥

দুস্ত্যজ আর্য্যপথ নিজ পরিজন।
স্বজনে করয়ে যত তাড়ন ভৎর্সন॥
সর্ব্বত্যাগ করি করে কৃষ্ণের ভজন।
কৃষ্ণ সুখ হেতু করে প্রেম সেবন॥

শ্রীচরিতামৃত।

এখন বুঝ, গোপী হওয়া কেবল মুখের কথা নয়, কত সাজ সজ্জার দরকার দেখ।

(ক) লোকধর্ম্ম—লৌকিক ধর্ম্ম, যাহা সমাজের খাতিরে গৃহীকে করিতে হইবে।

(খ) বেদধর্ম্ম—বেদ পুরাণাদিতে উক্ত ধর্ম্ম, যাগ যজ্ঞাদি।

(গ) দেহধর্ম্ম—ভোগবাসনা, আহার নিদ্রাদি।

(ঘ) কর্ম্ম—সমস্ত কর্ম্মই সেখানে অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণে পর্য্যবসিত।

(ঙ) লজ্জা—ইহার বিশেষ উল্লেখ আবশ্যক, যেহেতু স্ত্রীজাতির লজ্জাটী অপরিহার্য্য ধর্ম্ম, গোপীরা তাহাও শ্রীকৃষ্ণচরণে অর্পণ করিয়াছিলেন।:

(চ) ধৈর্য্য—যতক্ষণ পারিয়াছিলেন, ততক্ষণ, সামলাইয়াছিলেন, পরে অধীরা উন্মাদিনী হইয়াছিলেন।

(ছ) দেহসুখ—তাহা ত বহুপূর্ব্বেই গিয়াছে, কঙ্কর ও বালুকাতপ্ত কণ্টকাকীর্ণ পথে যাইতেও কষ্ট হইত না।

(জ) আত্মসুখমর্ম্ম—যাহাদের 'আত্ম' সম্বন্ধ বোধ নাই তাহাদের আবার আত্মসুখই বা কি? আর তাহাদের মমতাই বা কোথায়?

(ঝ) আর্য্যপথ—বাস্তবিক ইহা কুলকামিনীর পক্ষে দুস্ত্যজ্য বটে। পতি গৃহেবাস, পতিসেবাই স্ত্রীজাতির আর্য্যপথ। ইহা কিছুতেই ত্যাগযোগ্য নহে; কিন্তু কৃষ্ণভজনের জন্য গোপীগণ তাহাও ত্যাগ করিয়াছিলেন। (পরকীয়াতত্ত্ব পরে আলোচনা করিলে বুঝা যাইবে যে গোপীদের ইহা দুষণীয় নহে।)

(ঞ) নিজ পরিজন—ভাই, বন্ধু, স্বামী, পুত্র, কন্যা ইত্যাদি আত্মজন।

(ট) স্বজনে করয়ে যত তাড়ন ভৎর্সন—ইহা আরও সুন্দর, যুক্ত-বৈরাগ্যের ইহাই একটী সুন্দর চিত্র। প্রিয়তমের জন্য নিজ-সুখ ত্যাগ করিলে বেশী কি হইল, তাঁহার জন্য আবার যদি গঞ্জনাভোগ ও যন্ত্রণা সহ্য না

করিলাম তবে প্রেমের পরিপক্কতা হইল কিসে? মোট কথা সর্ব্বত্যাগ করিয়া কৃষ্ণের ভজন করিতে যখন পারিবে তখনই "প্রপন্ন" হইবে; তখনই গোপী হইতে পারিবে। এই প্রপন্নভাবের আবার তারতম্য আছে। প্রপন্ন ব্যক্তি অতি দীনহীন, একেবারে অভিমান বিবর্জ্জিত, তৃণাপেক্ষাও সুনীচ, বৃক্ষের ন্যায় ধীর ও সহিষ্ণু, মারিলে কাটিলেও কথা নাই বরং আঘাতকারীর মঙ্গল-কামনা করেন, যথালাভেই সন্তুষ্ট যেহেতু শরণাগতের নিজসুখ চেষ্টা নাই, অভাব-আকাঙ্ক্ষাও নাই, নিজে নিরভিমানী অথচ অন্যকে সম্মান করিতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত।

এইখানে লোক পাবন মহাপ্রভুর জগন্মঙ্গল উপদেশ-শ্লোকটী স্মরণ কর।

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব-সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয় সদা হরিঃ॥

শ্রীচরিতামৃত।

এই শ্লোক-রাজ প্রায় সকল কণ্ঠেই বিরাজ করিতেছেন দেখা যায়, কিন্তু দুঃখের বিষয় কেহই ইহার অনুশীলন করেন না। ভক্তপ্রবর কবিরাজ গোস্বামী নির্ব্বন্ধাতিশয় সহকারে মাথার দিব্য দিয়া কি বলিতেছেন শুন :—

ঊর্দ্ধবাহু করি কহি শুন সর্ব্বলোক।
নামসূত্রে গাঁথি পর কণ্ঠে এই শ্লোক॥
প্রভুর আজ্ঞায় কর এই শ্লোক আচরণ।
অবশ্য পাইবে তবে শ্রীকৃষ্ণ-চরণ॥

শ্রীচরিতামৃত।

মহাপ্রভুর দোহাই দিয়া কবিরাজ গোস্বামী দৃঢ়তার সহিত বলিতেছেন, এই শ্লোকের নির্দ্দেশ মত কার্য্য কর, নিশ্চয়ই "শ্রীকৃষ্ণ-চরণ" পাইবে। কি করিতে হইবে? সর্ব্বদা নাম কীর্ত্তন করিতে হইবে।

কিরূপে?—তৃণ হ'তে নীচ হইয়া সদা লবে নাম।
আপনি নিরভিমানী অন্যে দিবে মান॥
তরুসম সহিষ্ণুতা বৈষ্ণব করিবে।
ভর্ৎসন, তাড়নে কারে কিছু না বলিবে॥
কাটিলেও তরু যেমন কিছু না বোলয়।
শুকাইয়া মৈলে তবু জল না মাগয়॥

এই মত বৈষ্ণব কারে কিছু না মাগিবে।
অযাচিত বৃত্তি কিম্বা শাক ফল খাবে॥
সদা নাম লইবে যথা লাভেতে সন্তোষ।
এই ত আচার ক'রে ভক্তি ধর্ম্ম পোষ॥

শ্রীচরিতামৃত।

ইহার আর ব্যাখ্যা অনাবশ্যক, তবে কিরূপে সাধককে তৃণ ও তরু হইতে হইবে তাহাই আলোচনার বিষয়। পরে সে বিষয় ধরা যাইবে; এখন বুঝ, শুধু নাম করিলে হইবে না, "প্রপন্ন" হইয়া ডাকা চাই।

প্রপন্নের মধ্যে আবার আর্ত্তভাবও দেখা যায়; লোকশিক্ষার জন্য জগদ্‌গুরু শ্রীগৌরাঙ্গ দেব নিজকৃত শ্লোকে এই ভাবটী কেমন ফুটাইয়াছেন দেখ :—

অয়ি নন্দতনুজ কিঙ্করং পতিতং মাং বিষমে ভবাম্বুধৌ।
কৃপয়া তব পাদ-পঙ্কজস্থিত ধূলী সদৃশং বিচিন্তয়॥
তোমার নিত্য দাস মুঞি তোমা পাসরিয়া।
পড়িয়াছোঁ ভবার্ণবে মায়াবদ্ধ হঞা॥
কৃপা করি কর মোরে পদধূলি সম।
তোমার সেবক করোঁ তোমার সেবন॥

মায়ার হাতে পড়িয়া সাধক যখন ঘোর সংসার সমুদ্রে হাবুডুবু খাইতেছেন, তখন হঠাৎ সচেতন হইয়া কিরূপ পরিত্রাহি ডাকিতেছেন—

"হে নন্দদুলাল তোমার কিঙ্কর ঘোর ভবসমুদ্রে পতিত হইয়াছে, প্রভো! দয়া ক'রে উদ্ধার কর, আর তোমার শ্রীপাদপদ্মের ধূলি ক'রে অনুদিন চরণাশ্রয়ে রাখিও, যেন চরণ ছাড়া ক'রো না", ইহাই শরণাগতের চিত্র।

বৎস! আমরা মায়ামুগ্ধ জীব, সহজে আমাদের এইরূপ "প্রপন্নভাব" আইসে না; দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের চিত্রটী মনে ক'রো—যে মুহূর্ত্তে দুরাত্মা দুঃশাসন কৃষ্ণাকে আকর্ষণ করিয়াছিল ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই তাঁহার প্রিয়সখা শ্যামসুন্দরের কথা মনে পড়িয়াছিল বটে, কিন্তু তখন তাঁহার মনে ছিল যে, আমি মহেন্দ্রতুল্য পঞ্চস্বামীর পত্নী, অবশ্যই তাঁহারা প্রতিকার করিবেন, তিনি সাভিমানে স্বামীগণের দিকে তাকাইতে লাগিলেন। স্বামীগণ অধোবদন, সুতরাং দ্রৌপদীর সে আশা ব্যর্থ হইল। তখন ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতি সভাস্থ ধর্ম্মবীরগণের দিকে আকুল নয়নে তাকাইতে লাগিলেন, দেখিলেন, তাঁহারাও মন্ত্রমুগ্ধ চিত্রের ন্যায় নিশ্চল। তখন ধর্ম্মের দোহাই দিয়া বিচারপ্রার্থী হইয়া

রাজন্যবর্গের দিকে সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। দেখিলেন, ধর্ম্মের স্থান অধর্ম্মে অধিকার করিয়াছে। তখন স্ত্রীজন-সুলভ লজ্জানিবারণ জন্য যথাশক্তি নিজের বাহুবলের উপর নির্ভর করিলেন, অবশেষে তাহাও যখন বিধ্বস্ত হইল, তখন "প্রপন্ন" হইয়া যুক্তকরে সেই অগতির গতি শরণাগতবৎসল শ্রীহরিকে কাতর প্রাণে ডাকিলেন। যেমনি ডাক্ অমনি ফল। ডাকের সঙ্গে সঙ্গে ভগবৎকৃপা নামিল। এখন বুঝিলে "প্রপন্ন" কাহাকে বলে এবং এক ডাকেই ফল হয় কি না।

হরিদাস—বুঝিলাম, কিন্তু সমস্তই সাধনসাপেক্ষ, এখন তাহার পন্থা কীর্ত্তন করিয়া কৃতার্থ করুন।

গুরুদেব—বৎস! মহাপ্রভু জীবশিক্ষার জন্য সমস্ত ঠিক করিয়া রাখিয়াছেন, আমরা দেখিয়াও দেখি না, শুনিয়াও শুনি না, তাই আমাদের এ দশা! আমরা সকল জিনিষের একটা Pocket Edition চাই। আমরা Algebra made easy, Science made easy পাইতেছি, সাধন ভজনও made easy চাই। অন্তর্য্যামী সকল মঙ্গলালয় শ্রীগৌরাঙ্গদেব কলির জীবের মতিগতি ও শক্তি সামর্থ্য বুঝিয়াই আমাদের প্রার্থিত সাধন ভজনও made easy করিয়া দিয়াছেন। ইহাতেও মন না উঠিলে আর উপায় কি?

সিদ্ধিলাভ মুখের কথাও নহে বা বাজারে কিন্‌তে মিলে না যে চট্ ক'রে মিল্‌বে, তবে যে মিলাতে চাহে সে মুখের কথাতেই পাইবে ও ঘরে বসিয়া বিনা মূল্যেই পাইবে।

প্রভু নিজে রায় রামানন্দকে বলিতেছেন, "সাধ্যবস্তু সাধন বিনা কেহ নাহি পায়"। অনাদিকাল হইতে জীব কৃষ্ণ বহির্ম্মুখ; মায়ার হস্তে পড়িয়া সংসারে নিত্যবদ্ধ; যেটা জীবের বাসভূমী, সেটাও মায়ারাজ্য; তাহার চতুর্দ্দিকস্থ Invironments সমস্তই কৃষ্ণ বহির্ম্মুখ, পরিকর পরিজন সমাজ ইত্যাদি সকলেই একই গোত্রের, সুতরাং এই বিষম সঙ্কটাপন্ন অবস্থা হইতে জীবের উদ্ধার লাভ করা সহজ নহে। সীতাদেবীকে সমুদ্র পার করিয়া অতি দুর্গম অশোক কাননে আট্‌কাইয়াছে। চারিদিকে অতি ভীষণ রাক্ষসগণ তাঁহাকে ঘিরিয়া আছে। অতি ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি চেটিকারা তাঁহার সহচরী। মধ্যে মধ্যে অতুল ঐশ্বর্য্যের গরিমা লইয়া দশানন আসিয়া নানা ছলে তাঁহাকে বিমোহিত করিবারও চেষ্টা করিতেছে। কখন বা শাণিত খড়্গ লইয়া কাটিয়া ফেলিবে বলিয়া শাসন গর্জ্জনও করিতেছে। লাঞ্ছিতা সীতাদেবী সেই ব্রহ্ম সনাতন

স্বামীচরণ হইতে স্খলিত হইয়াছেন বটে, কিন্তু অনুক্ষণ শ্রীরামচন্দ্রের সেই অতুল চরণে আত্মসমর্পণ করিয়া নীরবে সমস্ত উপদ্রব সহ্য করিতেছেন। আর আশাবদ্ধ হৃদয়ে তাকাইয়া আছেন, তিনি ইহা নিশ্চিত জানেন যে, তাঁহার প্রভু কখনও নিশ্চিন্ত নহেন। তিনি সময় হইলে অবশ্যই আসিয়া উদ্ধার করিবেন। এখন কেবল তিনি পাপ প্রলোভন, তর্জ্জন গর্জ্জন হইতে আত্মরক্ষা করিয়া চলিয়াছেন, তাঁহার ক্ষীণ বাহুতে বল না থাকিলেও তিনি জানেন, যে তারকব্রহ্ম রামনাম আশ্রয় করিয়া তিনি ঐকান্তিকভাবে ঐ নামাশ্রয় করিয়া থাকিতে পারিল, ত্রিভুবন-বিজয়ী লঙ্কানাথও তাঁহার কেশাগ্র স্পর্শ করিতে পারিবে না। সংসারক্ষেত্রে পতিত জীবের অবস্থাও ঠিক সেইরূপ। যদি ঠিক সীতাদেবীর ন্যায় জীবও ঐরূপ ভাবে আত্মরক্ষা করিয়া অনন্যশরণ শ্রীগৌরাঙ্গের মধুর নাম আশ্রয় করিয়া থাকিতে পারে, তবে তাহার আর ভাবনা কি, তাহার গতি তিনিই করিবেন।

হরিদাস—প্রভো! আমরা যে অবস্থায় পতিত, তাহাতে আত্মরক্ষা করা আমাদের সাধ্যায়ত্ত নহে, আমি যে ঘোর তুফানে পতিত হইয়াছি, তাহা হইতে উদ্ধার হওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব।

গুরুদেব—বৎস হরিদাস! পূর্ব্বেই বলিয়াছি সদ্‌গুরুর চরণাশ্রয় কর। একটা আশ্রয় ধরিতে পারিলে নৌকা আর ভাটীতে টানিয়া লইতে পারিবে না। একজন কেহ সহায় না হইলে বাস্তবিক আমাদের আর গত্যন্তর নাই।

হরিদাস—(সভয়ে) আজকাল অনেকেই গুরুবাদ স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন, ঈশ্বর পিতা, পিতার নিকট যাব তা আবার মোক্তার ধরিব কি জন্য?

গুরুদেব—বাপুহে! আজ কাল্‌কার কথা আর তুলো না। আজকাল সকলেই চৌদ্দপোয়া, কেহই আর তেরপোয়া হ'তে চায় না। কেহ কাহাকে বড় মানিতে চায় না। এই অবিনয়ের ভাবে দেশটা আরও উৎসন্নে গেল। স্বীকার করি অনেক গুরুনামধারী প্রভুদের অত্যাচারে বিস্তর ধর্ম্মহানি হইতেছে, সমাজ কলঙ্কিত হইতেছে; তাহার যথাযোগ্য সুব্যবস্থা কর। তাহা না করিয়া একেবারে গুরুবাদ উড়াইয়া দিতে চাও? যাহা হউক তাঁহাদের মূলেই ভুল। হিন্দুধর্ম্ম কোন মোক্তার মানে না। মোক্তার কেহ নহেন, 'গুরু'ও যিনি গোবিন্দও তিনি। ভক্ত তুলসীদাস গাহিয়াছেন,—

"গুরু গোবিন্দম্ এক পছন্দম্"।
যেই গুরু সেই কৃষ্ণ সেই সে গৌরাঙ্গ,
নিষ্ঠা করি ভজ মন গুরুপদারবিন্দ।

কবিরাজ গোস্বামী কি বলিতেছেন শুন :—

গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে।
গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥
শিক্ষা গুরুকে ত জানি কৃষ্ণের স্বরূপ।
অন্তর্য্যামী ভক্ত শ্রেষ্ঠ এই দুই রূপ॥

আবার শ্রীমদ্ভাগবতে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ ভক্তপ্রবর শ্রীউদ্ধবকে কি বলিতেছেন শুন :—

আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ।
ন মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ॥

হে উদ্ধব আচার্য্যকে আমি বলিয়াই জানিবে অর্থাৎ আচার্য্য ও আমি এক বস্তু ইহাই জানিবে, তিনি তোমার চক্ষে মানুষ প্রতীত হইলেও তিনি আমারই স্বরূপ-প্রকাশ অর্থাৎ তিনিই সাক্ষাৎ আমি, এইরূপ অপ্রাকৃত বুদ্ধিতে নিষ্ঠাবান হইও।

কদাচ তিনি আমাদেরই একজন, এইরূপ মানববুদ্ধি করিয়া কোনরূপ অসূয়া প্রকাশ করিও না। যেহেতু তাঁহাতে সকল দেবতার অধিষ্ঠান আছে, সুতরাং তিনি অপ্রাকৃত পুরুষজ্ঞানে সর্ব্বদা তাঁহার সেবা ও অর্চ্চনাদি করিবে।

উক্ত শ্লোকের মৌলিক যে অর্থ তাহা তোমাকে শুনাইলাম। এখন গোস্বামী প্রভুপাদেরা "মাং" শব্দ অর্থে "মদীয়ং প্রেষ্ঠং" এইরূপ করিয়াছেন; মূলতঃ একই অর্থ। তবে ভজনের জন্য, সাধকের হিতের জন্য, গোস্বামী প্রভুরা শেষোক্ত অর্থই সমীচীন দেখাইয়াছেন। মদীয়ং অর্থে আমারই নিজ জন, আবার তার উপরেও প্রেষ্ঠং বলিয়া আরও অভিন্ন-স্বরূপত্ব বুঝাইয়াছেন। কি জন্য এরূপ অর্থ আবশ্যক এবং ইহার সামঞ্জস্য কিরূপ, কিঞ্চিৎ পরে তৎসম্বন্ধে আলোচনা করা যাইবে। ফল কথা সর্ব্বশাস্ত্র ও সকল ভাগবত মোহান্তাদি একবাক্যে কীর্ত্তন করিতেছেন যে গুরু সাক্ষাৎ শ্রীভগবান শ্রীব্রজেন্দ্র-নন্দনের প্রকাশ। অতএব সাক্ষাৎ শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন হইতে গুরু কোন অংশই ভিন্ন নহেন।

হরিদাস—প্রভো, দুই পাতা ইংরাজী পড়িয়া আমাদের বুদ্ধি বিকৃত হইয়া

গিয়াছে, আমরা সরল বিশ্বাস হারাইয়াছি। মনুষ্যে দেবতা বুদ্ধি সহজে আসিতে চায় না ; উহা যেন অসম্ভব বলিয়াই বোধ হয়।

গুরুদেব—বৎস, ঈশ্বর-বিমুখ স্থূলদর্শী সমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় বাস্তবিক শ্রীগুরুদেবে শ্রীভগবান বুদ্ধি সঞ্জাত হওয়া দুষ্কর হইয়াছে বটে, কিন্তু তাই বলিয়া উহা অসম্ভব বলিতে পার না। বিশেষতঃ কাষ্ঠ-লোষ্ট্র পূজক হিন্দুর মুখে ঐরূপ কথা আদৌ শোভা পায় না। আমরা পাষাণ-প্রতিমার মধ্যে যখন চিন্ময় সত্য-সনাতনকে প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করিয়া সেই বিশ্বনিয়ন্তা বৈকুণ্ঠেশ্বরের পূজা করিয়া থাকি ; তখন শ্রীভগবানের অংশবিভূতি, সচ্চিদানন্দ-ময়ের চিৎকণ, জীবাধারে সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদাতা পরমগুরু নিত্যানন্দস্বরূপকে অনুভব করিব, ইহা আর বেশী বিচিত্র কি হইল? তবে হিন্দুধর্ম্মের চরম অধোগতি হইয়াছে বলিয়া হিন্দুর হৃদয়ে ঐরূপ অবিশ্বাসের চিন্তা স্থান পাইয়াছে। আমরা এখন কাঞ্চন হারাইয়া খালি-আঁচলে গিরা দিয়া বসিয়া আছি, বস্তু ছাড়িয়া খোসা লইয়া গরবে চক্ষু লাল করিয়া রহিয়াছে। এখন শ্রীবিগ্রহ হইতে সচ্চিদানন্দস্বরূপ অন্তর্ধান করিয়াছেন, পাষাণ প্রতিমা পড়িয়া আছে ; আমরা সেই পাষাণের পূজা করিয়া আরও জড়ত্ব সঞ্চয় করিতেছি, প্রাণ চলিয়া গিয়াছে, এখন হিন্দুধর্ম্মের কৃমিকীটপূর্ণ স্থূল দেহটা পড়িয়া আছে, আর তাই লইয়া আমরা পৈশাচিক তাণ্ডব-নৃত্য করিতেছি। "বলিহারি মায়া ; তোমার মহীয়সী দৈবশক্তির নিকট সমস্তই বিধ্বস্ত ও নির্জ্জিত। স্বয়ং চিন্ময়স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বিলসিত প্রেমভক্তি রসামৃত-পুণ্যভূমিকে এত অল্প দিন মধ্যেই তুমি একেবারে পিশাচের লীলাক্ষেত্র করিয়া ফেলিয়াছ, তোমায় নমস্কার করি!" এই বলিয়া গুরুদেব সক্ষোভে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ধ্যানস্থ হইলেন। হরিদাস ভীত অপরাধীর ন্যায় যুক্তকরে হতাশ নয়নে শ্রীপাদ মূলে উপবিষ্ট রহিলেন। কিছু কাল পরে অনুরাগরঞ্জিত চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া শ্রীগুরুদেব বলিলেন—"বৎস হরিদাস, "স্বকর্ম্মফলভুক্ পুমান্" আমরা আমাদের স্বরোপিত বৃক্ষের ফল ভোগ করিতেছি। আমাদের এই দশা অবশ্যম্ভাবী স্বয়ং পরব্রহ্ম সনাতন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ-স্বরূপের পদাশ্রয় পাইয়াও আমরা অবহেলায় তাই হারাইয়াছি, তাই এই দুর্দ্দশা। ভগবদ্বাক্য কখনও ব্যর্থ হইবার নহে। মহা যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন :—

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥

হে অর্জ্জুন, গুণময়ী আমার মায়া বড় সহজ নহেন, ইনি দৈবশক্তিসম্পন্না,

ইহাকে অতিক্রম করা অতি দুষ্কর (কিন্তু অসম্ভব নহে।) এই দুরধিগম্য মায়ার হাত হ'তে পরিত্রাণ পাইবার অন্য কোন উপায় নাই। ইহার একমাত্র পন্থা আমার চরণাশ্রয় করিয়া থাকা। যে সমুদয় ব্যক্তি প্রপন্ন হইয়া আমাকে ধরিয়াছে কেবল তাহারাই মায়ার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইতেছে। বৎস! পরম কারুণিক শ্রীনন্দদুলাল তাই শ্রীনবদ্বীপ লীলায় আমাদের দ্বারে দ্বারে বেড়াইলেন, আমরা নিতান্ত হতভাগ্য, তাই প্রাপ্তরত্ন অবহেলায় খোয়াইলাম। স্যমন্তক মণি ভাগ্যে মিলিলে কি হইবে, উহা রাখিতে পারিলাম কই? তবে বৎস হতাশ হইও না, মহাপ্রভুর ধর্ম্মরাজ্য কখনও পিশাচের অধিকারভুক্ত থাকিতে পারে না। ধর্ম্মের যথেষ্ট গ্লানি হইতেছে, ভক্তের কাতর ক্রন্দন প্রভুর চরণে পৌঁছিতেছে, প্রভুর আসনও টলিয়াছে, উষার উন্মেষ দেখা যাইতেছে, অচিরেই আবার পূর্ব্ব শৈলে প্রেমসূর্য্য উদিত হইবে।

হরিদাস—(সাক্ষেপে) প্রভো, সার্দ্ধ চারিশত বৎসর পূর্ণ হইতে না হইতে মহাপ্রভুর অত্যুজ্জ্বল প্রেমরসপূরিত সত্যধর্ম্ম এতাদৃশী গ্লানিযুক্ত হইল কি জন্য?

গুরুদেব—বৎস, যে সন্দেশে বেশী ছানা ও ননী থাকে তাহা অতি শীঘ্র নষ্ট হইয়া যায়, আর যাহা চিনির ঢেলা তাহা অনেক দিনেও নষ্ট হয় না। দয়াবান্ মহাপ্রভু নিগূঢ় ব্রজরস ছানিয়া দেবগণের অনাস্বাদিতপূর্ব্ব ব্রজগোপীর নিজস্ব বস্তু, গোলক বৃন্দাবনের অপূর্ব্ব প্রেমরস-নির্য্যাস আনিয়া, অযাচিতভাবে নির্ব্বিচারে কলির জীবকে ঢালিয়া দিলেন, যাঁহারা অধিকারী তাঁহারা মহানন্দে সেই চিন্তামণি-সার দুর্লভ রাধাপ্রেম গ্রহণ করিয়া ধন্য হইলেন। পরবর্ত্তি জীবেরা স্বয়ং সচ্চিদানন্দস্বরূপ ও পার্ষদ ভক্তগণের সান্নিধ্য হারাইয়া ক্রমে শক্তিশূন্য ও বহির্ম্মুখ হইয়া পড়িল, ক্রমে দেবত্ব যাইয়া জীবত্ব ও পশুত্ব জাগিয়া উঠিল। অসুরের আবির্ভাবে স্বর্গের অমৃত স্বর্গে চলিয়া গিয়াছে, তবে পীঠস্থানে যাহা কিছু অবশেষ রহিয়া গিয়াছে, কালক্রমে উহা হ'তে আবার রসতরঙ্গ উচ্ছ্বসিত হইয়া ত্রিজগত ভাসাইয়া দিবে। ইহা কল্পনা নহে, ধ্রুব সত্য। প্রেমের জয় অবশ্যম্ভাবী।

বৎস, ধর্ম্ম কখনও পতিত বা দুষ্ট হয় না। ধর্ম্ম চিন্ময় সনাতন, কতকগুলি উপধর্ম্ম ও কদাচার আসিয়া ধর্ম্ম সমাজকে কলুষিত করে মাত্র। কর্দ্দম জড়িত হইলে স্বর্ণ তাহার স্বাভাবিক ঔজ্জ্বল্য পরিহার করে না; মলিনত্ব অপসারিত হইলে সেই অতুলনীয় জাম্বুনদহেম আবার জগজ্জনকে প্রেমকান্তি বিতরণ করিবে।"

হরিদাস—আমরা অতি মন্দ ভাগ্য, তাই এই পতিত সময়ে জন্মগ্রহণ ক'রেছি; কুশিক্ষা আমাদের চিত্তকে সন্দিগ্ধ ও অবিশ্বাসী করিয়াছে।

গুরুদেব—অবস্থা বুঝিয়াছ; তবে তর্কপ্রবণতা ত্যাগ করিয়া শাস্ত্রযুক্তি শ্রবণ কর। শাস্ত্র শ্রীভগবানের শ্রীমুখ নিঃসৃত অমোঘ সত্য ও যুগযুগান্তরীয় মুনিঋষিগণের কঠোর-সাধনালব্ধ উজ্জ্বল রত্নভাণ্ডার। হিন্দুমাত্রকেই এখানে অবনত মস্তক হইতে হইবে। হিন্দুর শাস্ত্র অনন্ত, অনন্ত শাস্ত্রই একবাক্যে শ্রীগুরুদেবকে শ্রীভগবানের স্বরূপ বলিয়া কীর্ত্তন করিতেছে এবং সদ্‌গুরু-চরণাশ্রয় অবশ্য কর্ত্তব্য উপদেশ দিতেছে। ইহার বিস্তারিত আলোচনা সুদীর্ঘ সময়সাপেক্ষ। তবে তোমার সন্দেহ অপনোদনার্থে ও বিশ্বাসের দৃঢ়তার জন্য কয়েকটী মহাবাক্য শুনাইতেছি।

ক্রমশঃ

শ্রীবামাচরণ বসু।

ডাকাতের ধর্ম্ম।

(বিশ্বাস)

(মেদিনীপুর হিতৈষী হইতে উদ্ধৃত)

এক ধনী গৃহস্থের বাড়ীতে কথকতা হইতেছিল। গ্রীষ্মকাল—বৈশাখ মাস। গৃহস্থ নিমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গের জন্য চিত্ত-রঞ্জনের বিশেষ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন—যুঁই, বেল, বকুল, কামিনী, কুন্দ, চম্পক প্রভৃতি পুষ্পের সুগন্ধে গৃহ চত্বর আমোদিত ও পুষ্পমাল্যে নিমন্ত্রিতবর্গের আনন্দদান করিতেছিল। শর্করা সংযুক্ত সুগন্ধি পানীয় ও রসালার ব্যবস্থা ছিল। আম্র, ফুটি, তরমুজ, শশা, কলা, তাল, নারিকেল, ছানা ও চিনি প্রভৃতিরও প্রচুর আয়োজন ছিল। আহুত, বরাহুত বা অনাহুত ব্যক্তিবর্গের উদর তৃপ্তি সাধনায় তাহা নিয়োজিত হইতেছিল। হিন্দু গৃহস্থ এইরূপে গৌণ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া মুখ্য-কার্য্য সাধনা করিয়া লইতেছিলেন। তবে উদর পরিতৃপ্তির কার্য্য কথকতা অন্তেই সম্পন্ন হইতেছিল। এইরূপে উপস্থিত জনমণ্ডলী নয়ন, মন, শ্রবণ ঘ্রাণ ও উদর পরিতৃপ্তির পূর্ণানন্দে বিভোর হইয়া আত্মহারা হইতেছিল।

কথকঠাকুরের সঙ্গীত সুধা পান করিয়া জনমণ্ডলী চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় নিশ্চল! সকলেরই বাহ্য ও বৃথা চিন্তা বিলুপ্ত! সকলেই ভাগবতী লীলা শ্রবণে আনন্দে বিস্ফারিত নেত্রও তন্ময়!

সুযোগ বুঝিয়া সন্ধ্যার অন্ধকারে এক ডাকাইত নিঃশব্দে ধনীর গৃহে প্রবেশ করিয়া ধন-রত্ন অন্বেষণ করিতেছিল; কিন্তু সুবিধা করিতে না পারিয়া কি করিবে ইতস্ততঃ করিতেছে এমন সময় শুনিল উচ্চকণ্ঠে কথকঠাকুর বলিলেন "প্রভাত হইল! পূর্ব্বদিকে উষার মনোরম জ্যোতির উদয় হইল, ব্রজের শ্রীদাম সুদাম, দাম, বসুদাম প্রভৃতি রাখালগণ গোষ্ঠে যাইবার জন্য নন্দালয়ে উপস্থিত হইয়া কৃষ্ণ বলরামকে ডাকিতে লাগিল। নন্দরাণী যশোদা লক্ষ লক্ষ টাকার মণি মুক্তা বিজড়িত স্বর্ণালঙ্কার দ্বারা তাঁহাদের শিশু পুত্রদ্বয়কে সজ্জিত করিতে লাগিলেন। তাহারা উত্তমরূপে সজ্জিত হইলে রাখালগণের সঙ্গে ধেনু বৎসগণ সহিত গোষ্ঠে বিদায় দিলেন!" ডাকাইত এই কথা শুনিয়াই একান্ত মনযোগে ভাবিল-"বা! এই ত মস্ত সুযোগ। সামান্য অর্থের জন্য কেন এমন করি-তেছি? দুটো ছেলের দু'গালে চারটে চড় দিয়ে কাণ ধরে সব গয়না খুলে নোব।" এই বলিয়া সে আনন্দে বাহিরে আসিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল কখন কথকতা শেষ হয়।

তাহার আর আনন্দের সীমা নাই। কথকঠাকুর শ্রীকৃষ্ণ বলরামের যে যে রূপের ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন তাহা আর তাহার কর্ণে প্রবেশ করে নাই। সে কেবল অলঙ্কারের কথাই ভাবিয়া মধ্যে মধ্যে আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিতে-ছিল! যথাসময়ে কথকতা শেষ হইল; হরিধ্বনিতে আকাশ মণ্ডল প্রকম্পিত হইয়া উঠিল। গৃহকর্ত্তা গললগ্নীকৃতবাসে যোড়হস্তে জনমণ্ডলীকে সম্বোধন করিয়া ঠাকুরের প্রসাদ গ্রহণের জন্য অনুরোধ করিলে আবার আনন্দের স্রোত বহিল, হরিধ্বনিতে আকাশ মণ্ডল চঞ্চল হইয়া উঠিল। ক্ষিপ্রতার সহিত প্রসাদ বিতরিত হইতে লাগিল—দীয়তাম্ ভুজ্যতাম্ শব্দে গৃহচত্বর মুখরিত হইয়া উঠিল। সকলেই আনন্দে উদর তৃপ্তি সাধনায় নিয়োজিত হইল কিন্তু ডাকাইতের সে দিকে লক্ষ্য নাই। সে কেবল মুহুর্মুহুঃ কথকের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া তাহার গতিবিধি লক্ষ্য করিতে লাগিল। যথাসময়ে আহারান্তে কথক মহাশয় স্বস্থানে যাত্রা করিলেন। ডাকাইত তাঁহার সঙ্গ লইয়া পিছু পিছু চলিল। কথক মহাশয় যখন এক মাঠের মাঝখানে উপস্থিত হইলেন তখন পশ্চাৎ হইতে ডাকাইত চীৎকার করিয়া ডাকিল "ও ঠাকুর—ও ঠাকুর—

দাঁড়াও।" ঠাকুরের সঙ্গে কিছু দক্ষিণা ছিল, ঠাকুর ভীত হইয়া দ্রুতপদে চলিতে আরম্ভ করিল, তাহা দেখিয়া ডাকাইত বেগে দৌড়িতে দৌড়িতে ঠাকুরকে বলিতে লাগিল "দাঁড়াও ঠাকুর দাঁড়াও, না দাঁড়াইলে আর তোমার নিস্তার নাই।" ঠাকুর দেখিলেন তাঁহাকে ধরিতে ডাকাইতের আর বড় বিলম্ব নাই, তখন তিনি অগত্যা থমকিয়া দাঁড়াইলেন। ডাকাইত তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল "দেখ ঠাকুর ঐ যে তুমি কৃষ্ণ বলরামের কথা বল্‌ছিলে তাদের লক্ষ লক্ষ টাকার গয়না, তাদের বাড়ী কোথায় আর তারা কোথায়ই বা গরু চরাতে যায়? বেশ ভাল ক'রে ঠিক ঠিক বল যদি না বল তাহ'লে এই খানেই এই লাঠি দিয়ে তোমার মাথা ভাঙব।"

কথক ঠাকুর দেখিলেন হস্তে লম্বা লাঠি, কঠিণ কটাক্ষ, অমিত বল, সম্ভবতঃ ডাকাইত! ঠাকুর সাহসে ভর করিয়া বলিলেন তাহাতে তোমার আবশ্যক কি? ডাকাইত রূঢ় ভাষায় উত্তর করিল "আবশ্যক আছে।" ঠাকুর বলিলেন —কি আবশ্যক বলিতে বাধা আছে কি? সে তখন বলিল ঠাকুর আমি ডাকাত! সেই সব গয়না কাড়িয়া আনিব। যদি পাই তোমাকেও কিছু দিব। দেখ ঠাকুর এখন গোল করোনা।

ঠাকুর দেখিল এটা বদ্ধ পাগল। তখন একটু সাহস পাইয়া বলিল সেজন্য আর চিন্তা কি? আমি তাহাদের সব বলিয়া দিব। তবে আমার কাছে ত পুঁথি নাই, আমার বাসায় পুঁথি আছে। পুঁথি দেখিয়া সব ভাল করিয়া বলিয়া দিব আমার সঙ্গে চল।

সে সঙ্গে সঙ্গে চলিল। কথক ঠাকুর বাসায় পৌঁছিয়া কাহাকেও কিছু না বলিয়া এবং তাহাকে বদ্ধ পাগল জানিয়া পুঁথি বাহির করিয়া রামকৃষ্ণের রূপ বর্ণনা করিতে লাগিলেন।

যাহার চরণে হীরা জহরৎ জড়িত স্বর্ণ নূপুর! পরণে পীতবাস! কটি দেশে স্বর্ণ কিঙ্কিনী আবক্ষঃ-লম্বিত মণিমুক্তাবিজড়িত কৌস্তভ মণিপ্রলম্বিত বহু মূল্য সুবর্ণ হার, হস্তে সুবর্ণ বলয়, কর্ণে মণিমুক্তা সম্বলিত বহু মূল্য স্বর্ণ কুণ্ডল, মস্তকে মোহন চূড়া! অলক তিলক রঞ্জিত, সুকুঞ্চিত ভ্রমরকৃষ্ণ কেশদাম, মুখে মধুর হাসি, হস্তে সোণার বাঁশী। কোটী সূর্য্যসম দেহের লাবণ্য! নির্ম্মল আকাশের ন্যায় নীলাভ রূপ! অগুরু চন্দন চর্চ্চিত, পরম-কমনীয় ললাটগণ্ডে হরিচন্দনাঙ্কিত লতাপুষ্প পদ্মপলাশলোচন বাঁশীর ন্যায় অনিন্দ্য নাসিকা, কুন্দ বীজের ন্যায় সুচারু দন্তপংক্তি, সুধা মাখা কথা ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম ঠাম! বংশীতে

রাধা রাধা গান! ব্রজপুরীর বনপ্রান্তে যমুনা তীরস্থ কদম্ব বৃক্ষতলে অবস্থান। জানিও সেই বনমালী কৃষ্ণ; আর যাহার তুষারধরবল রূপ, স্কন্ধদেশে হল, পাটল পট্টবস্ত্র পরিধান ও ঐরূপ বেশ ভূষা তাহাকে বলরাম বলিয়া জানিও।

ডাকাইত বলিল—আচ্ছা কত টাকার গয়না হবে? ঠাকুর বলিলেন—ওঃ! সে অনেক টাকার—লাখ লাখ টাকার!

ডাকাইত—তুমি যা বল্‌লে তার চেয়েও বেশী গয়না আছে কি বল?

ঠাকুর—তাহার আর সন্দেহ আছে! এক কৌস্তভ মণির দামই পৃথিবীর লোকের টাকায় কুলায় না।

ডাকাইত—(আনন্দে গদগদ হইয়া) বটে বটে! তা সেটা কি রকম?

ঠাকুর—সেটা যেখানে থাকে সেখানে সূর্য্যের ন্যায় আলো হয়ে যায়। আর অন্ধকার থাকে না। তেমন জগতে আর দ্বিতীয় নাই।

ডাকাইত—তাহলে তার দাম খু—ব বেশী হবে! কি বল? আচ্ছা ঠাকুর তুমি আর একবার রূপটা ভাল করে বুঝিয়ে বল, আর ঠিকানাটা।—

কথক ঠাকুর আবার রূপ বর্ণনা করিয়া তাহাকে বুঝাইয়া বলিল। ডাকাইত ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া বলিল দেখ ঠাকুর আমি শীঘ্রই আসিয়া তোমাকেও কিছু দিব। বেশী দূর হবে না ত কি বল? এক রাত্রিতেই যাওয়া যাবে কেমন?—হাঁ হাঁ আর একটা কথা তারা কি প্রত্যহই গরু চরাতে আসে?

ঠাকুর—হাঁ প্রত্যহ বৈ কি!

ডাকাইত—কখন আসে?

ঠাকুর—ঠিক, ভোরে তখন কিছু কিছু—অন্ধকারও থাকে।

ডাকাইত—বড় কথা মনে পড়ে গেল, এখন কোন দিকে যাব?

ঠাকুর—বরাবর উত্তর মুখে!

ডাকাইত—আচ্ছা ঠাকুর তবে আসি। বলিয়া প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল। কথক ঠাকুর মনে মনে হাসিতে লাগিলেন যে, এমন পাগলও থাকে! কিন্তু কথক ঠাকুরের একটা চিন্তা হইল তিনি ভাবিতে লাগিলেন বেটা ত দুই চারি দিন চেষ্টা করিবে তারপর ফিরিয়া আসিয়া আমার উপর অত্যাচার যে না করিবে এমন ত বোধ হয় না। কিন্তু বেটা বড় বিশ্বাসী বেটাকে আর একটা পথের সন্ধান বলিয়া দেওয়া যাইবে আর আমি এদিকে যত শীঘ্র পারি কথকতা শেষ করিয়া পলাইবার চেষ্টা করিব। ঠাকুর এইরূপ ভাবিয়া একরূপ নিশ্চিন্ত হইল।

এদিকে ডাকাইত সেইরূপ চিন্তা করিতে করিতে ঘরে গেল। তাহার আহার নিদ্রা দূরে গেল সেই চিন্তাতেই সে বিভোর হইয়া পড়িল। সেই-রূপ সেই অলঙ্কার ভূষিত ব্রজবালকদ্বয়কে যেন সে চক্ষে চক্ষে রাখিতে লাগিল! পাছে ভুলিয়া যায় এই জন্য অনবরত মনে মনে রূপ আওড়াইতে লাগিল। অলঙ্কারের সুষমা যেন তাহার চক্ষে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। চিন্তায় রাত্রি প্রভাত হইয়া গেল। সূর্য্যোদয় হইল তাহার চিন্তা বাড়িতে লাগিল।—কখন সূর্য্য অস্ত যায়, কখন সূর্য্য অস্ত যায়। দেখিতে দেখিতে সূর্য্য অস্ত গেল। সে চাল চিড়া পূর্ব্ব হইতেই বাঁধিয়া রাখিয়াছিল, তাহা স্কন্ধে লইয়া যষ্ঠী হস্তে বাহির হইয়া পড়িল এবং বরাবর উত্তর মুখে চলিল। চিন্তায় তাহাকে এতদূর উত্তেজিত করিয়াছে যে আহারের বিষয় একবার মনেও ভাবিল না ক্রমাগত পথ চলিতে লাগিল। সন্ধ্যার প্রাক্কালে এক স্থানে উপস্থিত হইয়া দেখিল তথায় একটী বন আছে, বনের প্রান্তভাগে একটী নদী বহিয়া যাইতেছে, ইহা দেখিয়া তাহার আনন্দের সীমা রহিল না সে নদীর তীরে নামিয়া কদম্ব বৃক্ষ অন্বেষণ করিতে লাগিল, কিয়দ্দূর গিয়া দেখিল একটী কদম্ব বৃক্ষ আছে তখন তাহার আর আনন্দের সীমা রহিল না আবার বনের নিকটে কতকটা পাহাড় জঙ্গলও আছে গোচারণের মাঠও আছে। সে স্ব-স্থ হইয়া আনন্দে নিকটবর্ত্তী গ্রামে ফিরিয়া গিয়া বৃক্ষতলে অন্নপাক করিয়া খাইল। আহারান্তে বিশ্রাম করিবার তাহার অবকাশ হইল না; সে গভীর অন্ধকারে সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া কদম্ববৃক্ষে রাত্রি যাপন করিবার বসনা করিল; এমন সময় এক কুকুর ভীষণ শব্দে ঘেউ ঘেউ করিয়া তাহাকে আক্রমণ করিল। ডাকাইত যষ্ঠি প্রহারে তাহাকে বধ করিয়া নদীতে ফেলিয়া দিল; কুকুর জীবিত হইয়া উঠিয়া আসিয়া আবার ঘেউ ঘেউ করিতে লাগিল। আবার যষ্ঠি প্রহারে সে নদীতে ফেলিয়া দিল আবার সে জীবিত হইয়া আসিয়া তদ্রূপ করিতে লাগিল। ডাকাইত আবার তাহাকে মারিয়া নদীতে ফেলিল আবার সে বাঁচিয়া উঠিয়া আবার তদ্রূপ করিতে লাগিল! এইরূপ এক শত বার মারিয়া নদীতে ফেলিল একশত বারই সে বাঁচিল দেখিয়া ডাকাইত তাহাকে তাড়না করিয়া জঙ্গলের বহুদূর প্রদেশ পর্য্যন্ত খেদাইয়া দিয়া আসিল।

তাহার পর কুকুরের যন্ত্রণা হইতে নিস্কৃতি পাইয়া আশ্বস্ত হইল। যদিও বা বহু কষ্টে ঠিকানা ঠিক করিতে পারিয়াছে কিন্তু কুকুর ঘেউ ঘেউ করিলে যদি তাহারা সতর্ক হইয়া পলায়ন করে তাহা হইলেই ত সকল আশাই

বিফল হইবে ইহা ভাবিয়া সে অত্যন্ত বিরক্ত ও অস্থির হইয়াছিল। যাহা হউক সে যন্ত্রণাটা এখন গেল। এখন সুস্থির হইয়া চিন্তা করিতে লাগিল কখন প্রভাত হয় কখন প্রভাত হয়। বৃক্ষশাখাগুলি নানাভাবে পরীক্ষা করিতেছিল বৃক্ষের কোন্ ডালে থাকিলে কেমন করিয়া ত্বরিত নামিয়া তাহাদিগকে ধরিয়া ফেলিবে, কেমন করিয়া গহনাগুলিকে কাড়িয়া লইবে শতবার তাহারই শিক্ষা ও পরীক্ষা চলিতে লাগিল। তাহার চিন্তা, উদ্বেগ, উত্তেজনা ও আগ্রহ রাত্রির সহিত বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

কখনও কৌস্তভের কথা মনে করিয়া অত্যন্ত অধীর ও চিন্তাকুল হইয়া উঠিল তাহার জ্যোতিতে অন্ধকার দূর হয়! সুতরাং আলোকে যদি আমাকে দেখিতে পায় তবেই ত সর্ব্বনাশ! তাহা হইলে ত তাহারা পালাইবে অতএব ঘন পত্র সমষ্টির ভিতর খুব উচু ডালে বসিয়া থাকি ইহা ভাবিয়া বৃক্ষের সর্ব্বোচ্চ শাখায় আরোহণ করিয়া কিয়ৎকাল থাকিবার পর আবার ভাবিল না না না তাহা হইলে নামিতে নামিতে তাহারা পলাইয়া যাইবে। সুতরাং নামিয়া আসিল এবং ভাবিল কোন বৃক্ষের অন্তরালে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকাই ভাল তাহা হইলে সত্বর দৌড়িয়া গিয়া ধরিতে পারিব, আবার ভাবিল,—না তাহা হইবে না, যদি দেখিতে পায় তাহা হইলে দূর হইতেই পলাইবে অতএব ঝোড় জঙ্গলের মধ্যে গর্ত্তের ভিতর লুকাইয়া থাকাই ভাল! কারণ তাহারা আসিলেই বংশীধ্বনি করিবে। বাঁশীর শব্দ পাইলেই দৌড়িয়া গিয়া ধরিব। এইরূপ ভাবিয়া গর্ত্তের মধ্যে গিয়া কিয়ৎ-কাল লুকাইয়া রহিল। কিন্তু পারিল না কারণ গর্ত্তের ভিতর থাকিলে বংশীধ্বনি যদি না শুনা যায় এইজন্য বাহির হইয়া আসিল এবং কাণ পাতিয়া পাতিয়া শুনিল বাঁশীর শব্দ হইতেছে কি না। কোন শব্দ শুনিতে না পাইয়া পুনরায় কদম্ব বৃক্ষের সর্ব্বোচ্চ শাখায় উঠিয়া কাণ পাতিয়া শুনিতে লাগিল কিন্তু বাঁশীর শব্দ শুনিতে পাইল না। মধ্যে মধ্যে মনকে প্রবোধ দিতে লাগিল বুঝি প্রভাতের এখনও বিলম্ব আছে। আরও ভাবিল দূর হইতে বাঁশীর শব্দ শুনিলেই "ঝাঁ ঝাঁ করিয়া নামিয়া পড়িব"। এইরূপ স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া সে তথায় রহিল এবং মুহূর্ত্তেই প্রভাতের অপেক্ষা করিতে লাগিল।

দেখিতে দেখিতে পূর্ব্বদিক রঞ্জিত হইল, অমনই তাহার হৃদয় তীব্র আগ্রহে উত্তেজিত হইয়া উঠিল। তৎক্ষণাৎ সে বৃক্ষ হইতে মাটিতে নামিয়া

পড়িল। কিন্তু বংশীধ্বনি শুনিতে না পাইয়া আবার বৃক্ষে আরোহণ করিল, আবার নামিল তবু শুনিতে পাইল না। আবার উঠিল—এবার তাহার আশা পূর্ণ হইল—দূর— বহুদূর হইতে যেন বংশীধ্বনি শুনিতে পাইল অমনি বিদ্যুৎ গতিতে নীচে নামিল, প্রত্যয় হইল না, আবার বৃক্ষে আরোহণ করিল শুনিল হাঁ—ঠিক বটে—ঠিক বটে বংশীধ্বনিই বটে, ক্রমশঃ নিকটস্থ হইতেছে। অমনি আনন্দে আত্মহারা হইয়া বৃক্ষতলে নামিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। কিয়ৎকাল পরে সে ঘোর কাটিলে পুনরায় বৃক্ষে উঠিল, দেখিল অদূরে বনপ্রান্তে মনোরম আলোক পরিদৃষ্ট হইতেছে। আলোকের ঔজ্জ্বল্য দুইটী ভুবনমোহন মূর্ত্তি ফুটিয়া উঠিয়াছে!—ধেনুগণ ও রাখালবৃন্দ অগ্রে অগ্রে ছুটিয়া যাইতেছে!

কমনীয় মূর্ত্তি দেখিয়া ডাকাইত ভাবিতে লাগিল তাই ত গয়নায় যে গা ভরা রে! এত ছোট ছেলেকে কেমন করে ওদের বাপ মা গরু চরাতে পাঠিয়েছে! তাই ত কেমন করিয়া লইব! গয়নাগুলা কাড়িয়া লইব, প্রাণে ত মারিব না? আঃ! মায়া কিসের? আমি ডাকাত! আমার আবার মায়া? দূর হোক ছাই নামিয়া পড়ি; এই বলিয়া সে তাড়াতাড়ি নামিল। রামকৃষ্ণ ক্রমশঃ নিকটস্থ হওয়ায় সে আনন্দে আত্মহারা হইয়া পুনরায় মূর্চ্ছিত হইল কিয়ৎক্ষণ পরে মূর্চ্ছা ভাঙ্গিলে দেখিল তাহারা দূরে চলিয়া যাইতেছে তখন সে যষ্ঠি হস্তে দৌড়িয়া গিয়া তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিল ওরে বেটারা দাঁড়া দাঁড়া! সব গয়না খুলে আমাকে দে।

শ্রীকৃষ্ণ—আমাদের গহনা কেন তোমাকে দিব?

ডাকাইত—দিবে না এই লাঠি দেখেছ?

শ্রীকৃষ্ণ—লাঠিতে কি হবে?

ডাকাইত—কি হবে গয়না না দিলে তোমাদের মাথা ভাঙব আর কি হবে?

শ্রীকৃষ্ণ—না আমরা দিব না।

ডাকাইত—এখনই কাণ ধরে ছিঁড়ে দিব আর সব গয়না কেড়ে নিয়ে এই নদীর জলে ডুবিয়ে মারব।

শ্রীকৃষ্ণ—বাবা গো! বাবা গো!

ডাকাইত—ত্বরায় শ্রীকৃষ্ণের মুখে হাত দিয়া চাপিয়া ধরিলে তাহার সংজ্ঞা লোপ হইয়া মাটীতে পড়িল। কিয়ৎক্ষণ পরে সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হইয়া

বলিল বাবা? তোমরা কে? আমি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে তোমাদিগকে আরও সুন্দর দেখছি কেন? তোমরা ত মানুষ নও বাবা।

শ্রীকৃষ্ণ—হাঁ আমরা মানুষ, আমরা রাখাল। ব্রজের নন্দ রাজার ছেলে।

ডাকাইত—যাও বাবা তোমরা গরু চরাওগে, আমার আর গয়না চাহি না। আমার আশা মিটে গেছে। তোমাদিগকে আমার আরও গয়না দিতে ইচ্ছা হচ্ছে। যাও বাবা তোমরা যাও, তোমাদের হাত দুটী নিয়ে একবার আমার মাথায় দাও তোমাদের হাতে আমি এক একবার চুম্বন করে প্রাণ জুড়াই! আহাহা! তোমাদের স্পর্শ এত শীতল বাবা! একবার স্পর্শ করলে গা জুড়িয়ে যায়! সকল আশা মিটে যায়! যাও বাবা তোমরা যাও! আমার ক্ষুধা তৃষ্ণা গিয়েছে আর কোথাও যেতে ইচ্ছে হচ্চে না! আমি এখানেই থাকব তোমরা এই পথে রোজ যাও এক একবার দেখা দিয়ে যেও!

শ্রীকৃষ্ণ—আমরা তবে যাই, আর আমাদিগকে মারবে না—গহনা নেবে না?

ডাকাইত—না বাবা না, তোমাদিগকে মারবো না! তোমরা যাও!

শ্রীকৃষ্ণ—আমরা যদি গহনা দি তা হ'লে নেবে?

ডাকাইত—গয়না—আর গয়না কি হবে? আমার আর যেন কিছু নিতে ইচ্ছে হচ্চে না!

শ্রীকৃষ্ণ—কেন, লওনা, এই আমরা দিচ্ছি!

ডাকাইত—তোমাদের বাপ মা মারবে না?

শ্রীকৃষ্ণ—আমরা রাজার ছেলে, আমাদের এমন কত গহনা আছে। যদি চাও ত তোমায় আরও অনেক গহনা দিতে পারি!

ডাকাইত—আছে, সত্যিই আছে?

শ্রীকৃষ্ণ—আছে বৈকি গো! তা না হলে আমরা দিচ্ছি, এই নাও—

অলঙ্কার উন্মোচন করিয়া প্রদান।

ডাকাইত—দেখ বাবা যদি নেহাতই দেবে তবে আমার এই গামছায় বেঁধে দাও! কিন্তু বাবা মনে কষ্ট কর ত আমার গহনা চাই না।

শ্রীকৃষ্ণ—না না, কষ্ট কিসের? তুমি আবার এস তোমায় আবার আরও গহনা দিব।

শ্রীকৃষ্ণ গহনাগুলি লইয়া গামছায় বাঁধিয়া দিলেন। ডাকাইত গামছা হস্তে

হইয়া বলিল, আচ্ছা বাবা আমি আবার আসব আবার আমার দিবে?
শ্রীকৃষ্ণ—হাঁ দিব।

ডাকাইত আনন্দে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া পরদিন রাত্রিকালে কথক ঠাকুরের নিকট উপস্থিত হইয়া সমুদয় নিবেদন করত গহনার পুটলিটী তাহার নিকট দিয়া বলিল, দেখ কত গহনা এনেছি, তোমার যাহা ইচ্ছা হয় লও তারা বলেছে আবার আমায় গহনা দিবে।

কথক ঠাকুর বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে তাহা দেখিয়া অবাক্ হইয়া রহিল। কথক ঠাকুর কিয়ৎ কাল পরে বলিল, আমি যাদের কথা বলেছিলাম, তাদের গহনা এনেছ? ডাকাইত হাঁ গো! এই দেখ না, বাঁশী চূড়াটী পর্য্যন্ত!

সমুদয় দেখিয়া শুনিয়া কথক ঠাকুর হতবস্ত হইয়া গেল। অনেক ভাবিল অনেক বিচার করিল, কিছুতেই কিছু ঠিক করিতে পারিল না! যে অনাদি অনন্ত পুরুষ! যাঁর ধ্যানে কত শত সহস্র যোগী সহস্র সহস্র বৎসর আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া নিরত থাকিয়াও দর্শন লাভে বঞ্চিত এই পাষণ্ড ডাকাইত এক দিনে কেমন করিয়া তাঁহার সাক্ষাৎলাভ করিল? না না তা নয়; আবার ভাবিল চূড়া বাঁশী এ সব ত অলৌকিক! এ সব কেমন করিয়া পাইল? যাহাহউক ব্যাপারখানা কি বুঝা যাউক। কিয়ৎক্ষণ পরে প্রকাশ্যে বলিল, আচ্ছা আমায় দেখাইতে পার? ডাকাইত—হাঁ পারি বৈকি! কালই চল না। কথক ঠাকুর সম্পূর্ণ অবিশ্বাসে ব্যাপারখানা কি জানিবার জন্য তাহার সহিত নির্দ্দিষ্ট সময়ে বহির্গত হইল এবং যথা সময়ে তথায় পৌঁছিল। কথক ঠাকুর দেখিলেন একটা বন বটে, তা ব্রজের বন নয় এবং কালিন্দীও নহেন। যাহাহউক, অতি কষ্টে রাত্রি কাটিল! প্রভাতের বড় বিলম্ব নাই, পূর্ব্বদিকে মনোরম অরুণোদয় হইল! ডাকাইত বলিল, দেখ ঠাকুর, তুমি নূতন মানুষ তুমি একটা গাছের আড়ালে লুকাইয়া থাক। কারণ তোমায় দেখিলে যদি না আসে। প্রভাতের বড় বিলম্ব নাই, কিন্তু এখনই আসিবে। ইহা বলিয়া তাহাকে লইয়া অনেক নাড়াচাড়া করিল। বলিতে বলিতে বংশী ধ্বনি শুনিয়া ডাকাইত বলিল, ঠাকুর ঐ শুন বংশীধ্বনি! কি মধুর, ঠাকুর কি মধুর! শুনছ ঠাকুর, শুনতে পাচ্ছ?

ঠাকুর—কৈ হে? কিছু ত শুনতে পাচ্চি না। তুমি কি পাগল হয়েছ?

ডাকাইত—পাগল কি ঠাকুর এখনই তাদের দেখতে পাবে। থাম আমি উঁচু ডালে উঠি দেখি কতদূরে আসছে।

ডাকাইত বৃক্ষে আরোহণ করিয়া দেখিয়া বলিল, ঠাকুর! আর বেশী দূরে নাই, বলিয়া সত্বর নামিয়া পড়িল। কিয়ৎক্ষণ পরে বনের প্রান্তভাগে তদ্রূপ আলোক পরিদৃষ্ট হইলে আনন্দে ডাকাইত চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল। ঐ ঠাকুর! ঐ আস্‌ছে। আলো দেখছ ঐ বন আলো ক'রে আস্‌ছে।

ঠাকুর—কৈ হে আমিত কিছু দেখছি না।

ডাকাইত—সে কি ঠাকুর, এত কাছে, অত আলো তবু দেখতে পাচ্ছ না? বন জঙ্গল, নদী নালা সব দেখতে পাচ্ছ আর ওদের দেখতে পাচ্ছ না?

ঠাকুর—হাঁ হে, দেখতে পাচ্ছি না। দেখ যদি সত্য সত্যই হয় তবে তুমি বলো, আজ যা দিবে তা ঠাকুরের হাতে দিও।

ডাকাইত—সম্মতি প্রদান করিল। এদিকে রামকৃষ্ণ আসিয়া উপস্থিত হইলে ডাকাইত বলিল, এস এস বাবা এস, আমি এসেছি, তোমাদের অপেক্ষায়ই আছি।

শ্রীকৃষ্ণ—গহনা লইবে?

ডাকাইত—না বাবা গহনা লইব না, যে গহনা দিয়াছিলে তাহা ফিরাইয়া দিতে আনিয়াছি তাহা তোমরা সব লও। তবে এই কথক ঠাকুরটা আমার কথায় বিশ্বাস না করায় তাহাকেও সঙ্গে আনিয়াছি। তোমার বাঁশীর স্বর শুন্‌ছি, তোমাদের দেহের জ্যোতিঃতে বন আলো হলো দেখছি, তোমার সঙ্গে কথা কহিতেছি, ঠাকুর এসব দেখিতে শুনিতে পায় না কেন? না দেখা দিলে আমার কথা বিশ্বাস করিবে না।

শ্রীকৃষ্ণ—ওর অনেক বিলম্ব! ও বৃদ্ধ হলে কি হয়! শত জন্মের পর তবে আমাকে দেখতে পাবে।

ডাকাইত—এই কথা ঠিক?

শ্রীকৃষ্ণ—হাঁ।

ডাকাইত বলিল, এখনই আমি ওর শত জন্ম করে দিচ্ছি বলিয়া তৎক্ষণাৎ প্রচণ্ডবেগে যষ্টি দ্বারা ঠাকুরের মাথায় আঘাত করিয়া তাহাকে মারিয়া নদীতে ফেলিয়া দিলে সে বাঁচিয়া উঠিল। আবার তদ্রূপ করিয়া নদীতে ফেলিলে আবার বাঁচিল, এইরূপ শতবারের পর ঠাকুরকে আনিয়া বলিল, দেখ বাবা ইহার ত শত জন্ম হইয়া গিয়াছে এবার দেখা দাও!

শ্রীকৃষ্ণ হাসিয়া বলিলেন, তুমি আমাকে ও উহাকে এক সময়ে স্পর্শ কর।

ডাকাইত তদ্রূপ করিলে কথক ঠাকুরের জ্ঞান চক্ষু ফুটিল! সে নবঘনশ্যাম বনমালী পদ্মপলাশলোচন নয়ন গোচর করিয়া সংজ্ঞাশূন্য হইল!

শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্হিত হইলেন।

ডাকাইত পণ্ডিতের সংজ্ঞা ভঙ্গ করাইলে শ্রীকৃষ্ণকে তথায় না দেখিয়া কথক ঠাকুর আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল!

ডাকাইত বিরক্ত হইয়া মনে মনে বলিল, এই পণ্ডিত শালার জন্যই আজ আমার সেই অপরূপ রূপ দেখিবার সাধ মিটিল না। এবার আমি একা আসিয়া ঘাঁটি আগলাইয়া বসিয়া থাকিব আর কোন শালাকে সঙ্গে লইব না ইহা ভাবিয়া তাহাকে ফেলিয়া পলায়ন করিল!

বিশ্বাস—ডাকাইত। বলপূর্ব্বক আপন অভীষ্ট সাধন করে।

কথক বা পণ্ডিত—কুতর্ক। সুতরাং তর্কে বহুদূর! সাধুসঙ্গ যষ্টিতে তার্কিকের হাড় ভাঙ্গিয়া চূর্ণীকৃত করত ভক্তি সলিলে পুনঃ পুনঃ নিমজ্জিত না করিলে ভক্তি বিশ্বাস জাগে না— জ্ঞানচক্ষু ফুটে না।

পঞ্চ মকার।

(বাঁকুড়া দর্পণ হইতে উদ্ধৃত)

মৎস্য, মাংস, মদ্য, মুদ্রা এবং মৈথুন এই পাঁচটির একত্রে সাধনকে পঞ্চ মকার শব্দে অভিহিত হইয়াছে। পাঁচটী দ্রব্যেরই প্রথম অক্ষর মকার।

১। পার্ব্বতীকে মহাদেব কহিতেছেন হে বরাননে! ব্রহ্মরন্ধ্র সরসীরুহ হইতে ক্ষরিত যে অমৃতধারা সেই অমৃতধারা পান করিয়া যে ব্যক্তি আনন্দময় হয় তাহাকেই মদ্য সাধক বলে। নতুবা সামান্য সুরাপান মত্ত বাহ্যজ্ঞান শূন্য ব্যক্তিকে সাধক বলা যায় না।

২। মা শব্দে রসনা, তদংশ ভক্ষণশীল ব্যক্তি মাংস সাধক বলিয়া উক্ত। রসনার নাম মা, তদংশ বাক্য, অতএব বাক্য সংযমকারী মৌনাবলম্বী ত্যাগী ব্যক্তিকে মাংসভুক বলিয়া উক্ত করিয়াছেন, নচেৎ ছাগ মেষাদি মাংসে পরিতৃপ্ত হইয়া যে ভগবান আরাধনা করিয়া ভববন্ধনে পরিমুক্ত হইবে, তন্ত্রশাস্ত্রের এরূপ অভিপ্রায় নহে।

৩। গঙ্গা যমুনা এই দুই নদীর মধ্যে নিরন্তর চরিতেছে যে দুই মৎস্য, সেই মৎস্যকে যে ব্যক্তি আহার করে তাহার নাম মৎস্য সাধক। গঙ্গাশব্দে এখানে

ঈড়া নাড়ী যমুনা শব্দে পিঙ্গলা, এই ঈড়া পিঙ্গলা নাড়ীর মধ্যে নিয়ত গতায়াত করিতেছে যে নিশ্বাস ও প্রশ্বাস, ইহারই মৎস্যদ্বয়, সেই মৎস্যদ্বয় ভক্ষক যোগী, অর্থাৎ শ্বাস প্রশ্বাসকে নিরোধ করিয়া কেবল কুম্ভকের পুষ্টি করিতেছে যে, শেষে প্রাণায়াম সাধক, তাহাকেই মৎশাশী বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। নতুবা সামান্য কীট বিশেষ জলচর মৎস্যাদি ভক্ষণপটু ব্যক্তিকে আমিষাহারী ব্যতীত সাধক বলা সঙ্গত হয় না।

৪। শিরসিস্থিত সহস্রদল মহাপদ্মে মুদ্রিত কর্ণিকার মধ্যে শুদ্ধ পারার ন্যায় শ্বেতবর্ণ স্বচ্ছ তরলরূপ আত্মার অবস্থিতি, কোটী সূর্য্যের ন্যায় তাঁহার প্রকাশ অথচ কোটী চন্দ্রের ন্যায় সুশীতল হয়েন। অতএব কমনীয় সৌন্দর্য্য বিশিষ্ট এবং মহাকুণ্ডলিনী শক্তি সংযুক্ত সেই পরমাত্মা তত্ত্বজ্ঞান যাহার জন্মে, তাহার নাম মুদ্রাসাধক। নতুবা কতকগুলা মদ্যপানের উপযোগী সামান্য ভক্ষ্য দ্রব্যকে মুদ্রা বলিয়া উপদেশ করেন নাই।

৫। সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের কারণ স্বরূপ মৈথুনতত্ত্ব। মৈথুনেসিদ্ধ ব্যক্তির সুদুর্লভ ব্রহ্মজ্ঞানরূপ আনন্দ উদয় হয়। মৈথুন শব্দে রমণ, যাঁহারা আত্মাতে রমণ করেন তাঁহাদিগের নাম আত্মারাম। সেই রমণশীল যিনি, তাঁহার নাম মৈথুন সাধক।

মৈথুনাঙ্গর আত্মা, যেহেতু রমণের নাম রাম। তাঁহা হইতে ব্রহ্মত্ব উৎপন্ন হয়; যাহাতে লোক রমণ হয়, তিনিই রাম। যতদিন আত্মাতে রমণ করিতে সক্ষম না হইবে, তত দিন পর্য্যন্ত এই মুদ্রযোগ অভ্যাসে রত থাকিবে। এই নিমিত্ত নিত্য মৈথুন মূর্ত্তি রামকে পরব্রহ্ম বলিয়া বেদাদিশাস্ত্রে উল্লেখ করিয়াছেন। পরমাত্মাই জগতরঞ্জক। সেই আত্মরমণ তত্ত্বকে অনুশীলন দ্বারা যে জানে, সেই রাম, রাম শব্দই মৈথুন বাচক। নতুবা সামান্য স্ত্রী সহবাসের নাম শাস্ত্রীয় মৈথুন সাধন নহে। রাম নাম মৈথুনাত্মক তারক ব্রহ্ম। মরণ কালে রমণাত্মক "রাম" এই অক্ষরদ্বয় স্মরণ করিলে সর্ব্ব কর্ম্মকে পরিত্যাগ করিয়া জীব তৎক্ষণাৎ ব্রহ্মময় হয়। ইহারই নাম মৈথুনতত্ত্ব, এই মৈথুনতত্ত্ব পরমতত্ত্ব শুদ্ধ তত্ত্বজ্ঞানের কারণ। এই মৈথুনতত্ত্ব সর্ব্ব পূজাময়, সমস্ত জপাদির ফলপ্রদ।

মৈথুনাঙ্গ আলিঙ্গন, চুম্বন, শীৎকার রমণ রেতবিসর্জ্জন। এই ষড়ঙ্গ মৈথুন-যোগ। তত্ত্বাদি ন্যাসের নাম আলিঙ্গন। ধ্যানের নাম চুম্বন। আবাহনের নাম শীৎকার। নৈবেদ্যের নাম অনুলেপন। জপের নাম রমণ। দক্ষিণান্তের নাম বীর্য্যপাতন। এই ষড়ঙ্গ যোগে মৈথুন ষড়ঙ্গ সাধন করিলে মৈথুন সাধক

বলে। নতুবা যুবতী কলেবর আলিঙ্গনকে ন্যাস যুবতী মুখ চুম্বনে ধ্যান, কামিনী-স্পর্শ শীৎকারকে আবাহন, যোষিৎ অঙ্গ বিলেপনকে নৈবেদ্য, রমণী রমণকে জপ, রেতবিসর্জ্জন দক্ষিণান্ত বলিয়া অসদাচার, কদাচ শাস্ত্রের অনুমোদন নহে। তাৎপর্য্য গ্রহণ পূর্ব্বক মন্ত্রাদির যে অর্থ, সেই মত সাধন করা কলিকালের মনুষ্যের পক্ষে কঠিন বলিয়া কলিকালে ও প্রকার সাধন নিষেধ। কলিকালে এ সাধনায় নানা বিঘ্ন উপস্থিত হয়।

শ্রীআনন্দগোপাল সেন।

কিমাশ্চর্য্যমতঃ পরম্।

এই পরিদৃশ্যমান বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমস্তই বৈচিত্রপূর্ণ—প্রহেলিকাময় ও অদ্ভুত! নীলাম্বুপরিপূর্ণ মহাসাগর এবং মেঘচুম্বী হিমালয় হইতে আরম্ভ করিয়া ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র গোষ্পদ ও কোমলতায় লজ্জাবতী লতাটী পর্য্যন্ত বিশ্বের প্রত্যেক অণু-পরমাণুই এক দুরধিগম্য রহস্যের আভাসে আভাসিত। ঐ যে নগণ্য কঙ্করকণা, নিসর্গের যুগ যুগান্তব্যাপী ভ্রূকুটিভঙ্গে পরিত্রস্ত, কালের পরিবর্ত্তনচক্রে নিষ্পেষিত এবং পথবাহী জীবকুলের দৃপ্তপদতলে অবিরাম বিদলিত হইয়া মৃয়মান অবস্থায় আজিও পথপ্রান্তে পড়িয়া রহিয়াছে, আবার এই যে জগৎ সৃষ্টির উচ্চস্তরবাসী মানুষ সহযোগিগণের কঠোর নিয়তি প্রত্যক্ষ করিয়াও, অনুদিন আসক্তির পঙ্কিল-প্রবাহে আকণ্ঠ নিমজ্জিত করিয়া আমিত্বের কর্ণভেদী কোলাহলে গগন ফাটাই-তেছে, এই আশ্চর্য্য হেঁয়ালির সমাধান করিবার জন্য কতবার কতশত বুদ্ধ চৈতন্য কালসাগরে ভাসিয়াছে, কিন্তু তাহার শেষ মীমাংসায় উপনীত হইতে অক্ষম হইয়া পরক্ষণেই আবার অনন্ত কালসিন্ধুর ঘূর্ণাবর্ত্তে বিলীন হইয়া গিয়াছে। বস্তুতঃ মানবজীবন যেরূপ বিচিত্র এবং বৈপরীত্যের আধার, এমন আর কিছুই নহে। দুইদিন পূর্ব্বে যে ভর্ত্তার ক্ষণিক বিচ্ছেদে ধর্ম্মপত্নীর মর্ম্মপীড়ার সীমা থাকিত না, এই সৌন্দর্য্যপ্লাবিত বিশ্বসংসার প্রলয়ের অধিক্যে টলমল্ করিয়া উঠিত, যাহার সুষমা উদ্ভাসিত কমনীয় বদনের রমণীয় কন্দর্পকান্তিতে আত্মহারা হইয়া যে একদিন এই সংসার সিন্ধুর উত্তাল তরঙ্গে সোনার কমলের মত ভাসিয়া বেড়াইয়াছিল, আজ সেই প্রাণপতির জীবনের রেখা নিয়তির তরঙ্গপ্রহারে কালের শিলাবক্ষ হইতে অপসৃত। ঐ দেখ সেই সহধর্ম্মিণী অঙ্গনশায়ী শবের কটীদেশ হইতে চাবি উন্মোচন করিয়া পতির বহুক্লেশলব্ধ ধনরত্নপূর্ণ লৌহপেটিকা সর্ব্বাগ্রে বন্ধ করিবার জন্য ব্যতিব্যস্ত। বলিতে কি স্বামীর শবদেহ ভস্মসাৎ

করিবার সময়ও উক্ত অর্থচিন্তা অর্দ্ধাঙ্গিনীর হৃদয়মন্দির পরিত্যাগ করে নাই। সেই চক্ষু, সেই বুক, সেই হৃদয় সমস্তই রহিয়াছে, কিন্তু সেই প্রেমাশ্রু, সেই সোহাগ, সেই প্রণয় এই এক মুহূর্ত্তে কোথায় গেল? জগতে ইহার বাড়া আশ্চর্য্য কি আছে জানি না।

"হতভাগ্যগণই মৃত্যুর করাল কবলে নিপতিত হয়, শমনের সাধ্য কি যে আমার একগাছি কেশও স্পর্শ করিতে পারে? আমার আহার প্রণালী যখন এরূপ সুব্যবস্থিত এবং স্বাস্থ্যরক্ষা বিষয়ক ও চিকিৎসা সংক্রান্ত রাশি রাশি পুস্তক যখন আমার পুস্তকাগারে বিদ্যমান তখন আমার নিকট স্বভাবের চিরন্তন সাধারণ নিয়মের যে ব্যতিক্রম হইবে না, তাহা কে বলিতে পারে?" এইরূপ একটা মোহকরী আশা বোধ হয় মানুষকে শেষের সেই ভয়ঙ্কর দিন স্মরণ করিতে দেয় না, হায়! মানুষ দেখিয়াও দেখে না যে বিশ্বের প্রত্যেক বস্তুই মৃত্যুর করাল অঙ্কে অঙ্কিত; কুসুম প্রভাতে ফুটিয়া প্রদোষে ঝরিয়া পড়ে। পদ্মপলাশলোচন শিশুর কমলমুখের অমলহাসি রোগযন্ত্রণার অনলশ্বাসে দুইদিনেই অন্তর্হিত হইয়া যায়। "স্রগকুসুমাকুলকুন্তলা" যুবতীর ঢলঢল রূপলাবণ্য দুই একদিন মাত্র প্রকৃতির সৌন্দর্য্য বিভাগে দক্ষতার সহিত কার্য্য করিয়া দেখিতে দেখিতে অবসর গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। কালের রঙ্গমঞ্চে নিয়তির এই চূড়ান্ত অভিনয়, আশার শৃঙ্খল দশা পরিবদ্ধ বাসনাক্লিষ্ট মানব স্বীয় চিত্তদৌর্ব্বল্য নিবন্ধন দেখিয়াও দেখে না; মনে করে এই ধরাধাম বুঝি আর পরিত্যাগ করিতে হইবে না। "ভেকো ধাবতি তঞ্চ ধাবতি ফণী সর্পং শিখী ধাবতি, ব্যাধো ধাবতি কোকনম্ বিধিবশাদ্ ব্যাঘ্রেহপি তং ধাবতি। স্বস্বাহারবিহার সাধনবিধৌ সর্ব্বেজনা ব্যাকুলাঃ কালস্তিষ্ঠতি পৃষ্ঠতঃ কচধরঃ কেনাপি ন দৃশ্যতে।" এই অমোঘ কবিবাক্যও তখন তাহার পক্ষে উন্মাদ কল্পনা বলিয়া মনে হয়। সর্ব্বনিয়ন্তা কাল অবিরাম দুন্দুভি নির্ঘোষে মানুষকে হাঁকিয়া বলিতেছে "দেখিতেছ কি বিভ্রান্ত মানব! নিয়তি তোমার শিয়রে উপস্থিত, ধন বল, রত্ন বল, আত্মীয়স্বজনের ক্রন্দনরোল বল, কেহই তোমাকে এই মায়ার কাননে চিরস্থায়ী করিতে পারিবে না।" কিন্তু মানুষ রিপুর তাড়নায় এত ব্যস্ত ও বিব্রত, যে কালের কথা শুনিবার অবসর তাহার কোথায়? তাহার "গলিতদশনপাতি, পলিত চিকুরভাতি," তথাপি দেখ, সে কেমন শেষের সেই ভয়ঙ্কর দিন বিস্মৃত হইয়া, তৃতীয় পক্ষের রূপবতীর রূপ-সাগরে দারুভূত মুরারির মত ভাসিয়া চলিয়াছে। ক্রমশঃ

শ্রীসুরথনাথ মুখোপাধ্যায়।

মিশ্রদম্পতির কথোপকথন

জগন্নাথ আর শচী দোঁহে
ক'রছেন একদিন কাণাকাণি,
"কে এসে হ'য়েছে উদয়
তাতো কিছু নাহি জানি!
নিশিতে যা স্বপ্ন দেখি
মুখেই তাহা যায় না আনা,
সুখের হ'লে যাইবা হ'তো
দুঃখের যে এ কপাল খানা!
একে একে আটটী মেয়ে
তুলে' দিলাম কালের মুখে,
জ্যেষ্ঠ পুত্র যতি হ'লো
শক্তি-শেল হানিয়ে বুকে!
এখন আমরা বেঁচে আছি
চে'য়ে যার চাঁদ মুখের পানে,
তার কারণ এ বিভীষিকা
খেল্‌ছে কেন মোদের প্রাণে?
আমরা করি যত্ন তারে
প্রাণাধিক সে পুত্র ব'লে,'
কি আশ্চর্য্য! স্বপ্নে কেন—
এ বেশটী তার যায় বদ্‌লে?
কে দেয় তাহার শিরে চূড়া,
কে দেয় তাহার হাতে বাঁশী?
কে দেয় তাহার গলায় গেঁথে
গুঞ্জামালা রাশি রাশি?
নন্দ ও যশোদার ভাবে
প্রাণটী কেন উঠে মে'তে?
কেন নিমাই গোপাল সেজে
হাত বাড়ায় নবনী খেতে।
এত যে কুট্‌তেছি মাথা
লক্ষ্মী নারায়ণের দ্বারে,
এত যে দিতেছি তুলসী
সংক্রান্তি পূর্ণিমার বারে।
এত যে দি' পক্ব রম্ভা,
এত যে দি' পায়স রেঁধে
এত যে জানাই আর্ত্তি
গলার মাঝে কাপড় বেঁধে।
এত যে দিতেছি নিত্য
হরির লুট সেই তুলসী তলে,
কৈ চাহিলেন বিপদহারী
একদিন একটু চক্ষু তুলে?
জানি না এ বৃদ্ধ কালে
কি আছে গোবিন্দের মনে,
জানি না কত অপরাধ
করে' ছিলাম তাঁর চরণে।
ঘুঙুর নাই নুপুর নাই বাছার,
তবু যেন মাঝে মাঝে,
আসতে যেতে রুণু ঝুনু
হঠাৎ মোদের কাণে বাজে।

আরো যে প্রাণ চম্‌কে উঠে,
আরো যে হয় মন উদ্বিগ্ন,
যখন দেখি ধূলার মাঝে
ধ্বজ বজ্রাঙ্কুশের চিহ্ন !

তবে কি সে ব্রজের ধন-ই
দুঃখ-হরণ ক'রতে এল ?
কি কহিব ? মোদের কেবল
ভাব্‌তে ভাব্‌তে জীবন গেল !"

শ্রীমহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কবিভূষণ

কিমাশ্চর্য্যমতঃ পরম্।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

মৃত্যুর শাসন-ভ্রুকুটিকে উপেক্ষা করিয়া মানুষ নিশিদিন সংসারের দুর্নিবার প্রলোভন-স্রোতে ভাসিয়া বেড়াইতেছে সত্য, কিন্তু তাহা বলিয়া কি তাহার প্রাণের ভিতর মরণের হুঙ্কার বাজিয়া উঠে না ? অবশ্যই উঠে। দরিদ্র হইতে রাজরাজেশ্বর পর্য্যন্ত সকলেই শমনের অঙ্গুলি হেলনে অবসন্ন। ক্ষীর নবনীতপূর্ণ হেমপাত্র মুখে লইয়া যে এই বিশাল ভবরঙ্গভূমির দ্বারোদ্ঘাটন করিয়াছে—বিলাসের পুষ্পিতাবরণে অঙ্গ ঢালিয়া আশৈশব যে সৌভাগ্যের কুসুমাস্তৃণ পথে বিচরণ করিয়াছে,—সুখৈশ্বর্য্যের বর্ত্তিকালোকে যাহার জীবননাটকের প্রত্যেক গর্ভাঙ্কই পরিদীপ্যমান, আত্মীয়স্বজনের ভালবাসা, প্রণয়িনীর বুকভরা সোহাগ, ও আত্মজগণের আনন্দ কোলাহল আজ যাহার মোহাচ্ছন্ন হৃদয়দর্পণে স্বর্গের ছবি প্রতিবিম্বিত করিয়া এই জ্বালাময় সংসারকে মায়ার মনোহর পুষ্পোদ্যানে পরিণত করিয়া রাখিয়াছে, দুইদিন পরে তাহাকে এই সোণার সংসার ছাড়িয়া যাইতে হইবে—এমন কামনিন্দী দিব্যকান্তি শ্মশানের দগ্ধমৃত্তিকায় লীন হইবে—এত সাধের শান্তিনিকেতন—লালসার রঙ্গভূমি, সমস্তই পরিত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে,—যে সন্তান আজ আনন্দের ভ্রাম্যমান প্রতিমূর্ত্তিরূপে সংসার আলো করিয়া রাখিয়াছে, যাহার মধুমাখা 'মা' সম্বোধনে জননী পুলকে রোমাঞ্চিতা হন, এমন বর্ত্তমান প্রীতির অমৃতখনি এবং ভবিষ্য সান্ত্বনার স্পর্শমণিকেও ছাড়িয়া যাইতে হইবে, জগতে এমন কোন সংসারী আছে, যে এই সকল স্মৃতির বিভীষিকায় চিত্তাবেগ সংযত রাখিতে পারে ? তাহা হয় না—তাহা কেহ পারে না—পারে না বলিয়াই মানুষ অন্তিমচিন্তায় উদাসীন থাকিতে ভালবাসে।

মানবের এইরূপ মৃত্যুভয়ের কারণ কি, এ বিষয়ের অনুধাবন করিলে জানা

যায় যে, আত্মার অমরত্বে অবিশ্বাস এবং পরলোক সম্বন্ধে একটা সন্দেহসমাকুল জ্ঞানই, মানব হৃদয়ের উক্ত বিকল অবস্থার নিদানভূত কারণ। জন্ম-মৃত্যুতেই মনুষ্যজীবন সীমাবদ্ধ—জন্মে উহার উৎপত্তি এবং মৃত্যুতেই উহার পরিসমাপ্তি। ইহ জগতের পরপারে আর কোন স্থান আছে কিনা, তাহা কাহারও অধিগম্য নহে। এমন কোন কলম্বস্ কিম্বা ম্যাগালিন্ সেই অজ্ঞাত জনপদ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন নাই, যাঁহাদের ভ্রমণকাহিনী সেই অজানা দেশের সর্ব্বাঙ্গীন অবস্থা বিষয়ে আমাদিগের কিয়ৎপরিমাণেও অভিজ্ঞ করিতে পারে। ইহ জগতের অপর প্রান্তে আর কোন পৃথক জগতের অস্তিত্ব সম্ভব কিনা, তথায় কোন পুরস্কার অথবা শাস্তি আমাদের জন্য প্রতীক্ষা করিতেছে কি না,—সেখানকার রাজা কেমন, প্রজা কেমন, ভেদ কেমন, দণ্ড কেমন, রাজনীতি এবং সমাজ-নীতিই বা কি প্রকার, এইরূপ একটা যুক্তি-তর্কজাত বিসংবাদী সন্দিগ্ধ ভাবই, আমাদের হৃদয়ে পরলোকের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোনরূপ স্থায়ী চিহ্ন মুদ্রিত হইতে দেয় না। "বল দেখি ভাই কি হয় ম'লে" এই লইয়াই মানবসমাজ চিরকাল বাদবিতণ্ডার খরতরঙ্গে পরিভাসমান। মানুষের মানসক্ষেত্র হইতে উক্ত ভ্রান্ত-বিশ্বাসের মূলোৎপাটন করিয়া তাহার স্থানে পারলৌকিক সংস্কারের বীজ রোপন জন্য কতবার কতশত মহামতির আবির্ভাব হইয়াছে, তাঁহাদের অভ্রান্ত যুক্তির নিকট মানুষের অসংলগ্ন ও অপ্রাসঙ্গিক প্রতিবাদ শুধু কেবল বাঙ্নিষ্পত্তিহীন মস্তক কণ্ডুয়নে পর্য্যবসিত হইয়াছে, তথাপি তাঁহারা মানবের উক্ত চিত্তবিকার আরোগ্য করিতে পারেন নাই, সন্দেহের কুয়াসা শত সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যেরূপ নীরদ-নিবিড় ও ঘনীভূত ছিল, আজও সেইরূপ ঘনঘটাচ্ছন্ন রহিয়াছে।

আত্মা ও পরলোকের অস্তিত্ব লইয়া মানবমণ্ডলীর মধ্যে বহু সম্প্রদায়ের উৎপত্তি ও মতান্তর লক্ষিত হইয়া থাকে। কেহ বলেন, আত্মা আছে, পরলোক আছে, আবার কোন সম্প্রদায় উহাদের অস্তিত্ব হাসিয়া উড়াইয়া দেন, কোন দল, আত্মাকে চৈতন্য আখ্যা প্রদান করিয়া বলিতেছেন,—জীবচৈতন্য অনন্তচৈতন্যের অণুমাত্র লইয়া জীবনের খেলা আরম্ভ করে, আবার খেলাশেষে সেই ক্ষুদ্র কণিকা চৈতন্যসিন্ধুর অনন্তগর্ভে লীন হয়। বৈজ্ঞানিক বলেন, জীবদেহ একটা যন্ত্র-বিশেষ; যন্ত্রের ন্যায় দেহও নিয়মিত আপন কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকে, যন্ত্রের অতীত কোন পদার্থ দেহে নাই। বাস্তবিক উপরিউক্ত মত সকল নিরবচ্ছিন্ন ঘৃণার সামগ্রী সন্দেহ নাই। উক্ত আদর্শে মানবসমাজ পাপাসক্তির খরপ্রবাহে ভাসিয়া যাওয়াই স্বাভাবিক! নারকীয় প্রবৃত্তির ন্যাক্কারজনক ঘৃণ্য অভিনয়ে,

বিশ্বের উন্নতি-স্রোত একেবারে প্রতিরুদ্ধ হওয়াই সম্ভব। কারণ পরলোকের সংস্কার না থাকিলে, মানুষ স্বভাবতঃই মনে করে যে, যদি জন্মেই জীবনের আরম্ভ ও মরণেই তাহার সমাধি হইল, তবে এই দিব্যসুন্দর জীবনটাকে সুখসম্ভোগে অতিবাহিত না করি কেন? ইহকাল, পরকাল, পাপপুণ্য, ধর্ম্মাধর্ম্ম প্রভৃতির বিচার করিতে গিয়া অনর্থক বিলাসবিরহিতভাবে, কঠোর তপশ্চর্য্যে আত্মসমর্পণ করিয়া সুস্থ শরীরকে ব্যস্ত করি কেন? ইন্দ্রিয়তর্পণ ও ভোগসুখের অমিয়-নিকেতন পরিত্যাগ করিয়া এক অনির্দ্দিষ্ট—তামসমলিন,—শুষ্ক সন্দিগ্ধশূন্য ভবিষ্যতের জন্য এই কমলফুল্ল অমল যৌবনকে কঠোর সমাধির উষ্ণ নিশ্বাসে ক্লিষ্ট করি কেন? কি ভয়ঙ্কর আত্মবিভ্রম! কি সৃষ্টিবিপর্য্যয়কারী প্রলয়ঙ্করী কল্পনা! বলা বাহুল্য যে, ঐ সকল আপাতরম্য মত-পথবর্ত্তী ব্যক্তিগণের পক্ষে মৃত্যুচিন্তা ভয়ানকেরও ভয়ানক। কিন্তু যাঁহারা আত্মা ও পরলোকের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন, তাঁহাদের মস্তক পুণ্যব্রত ও ধর্ম্মকর্ম্মের নিকট আপনাআপনি অবনত হইয়া পড়ে। ইহকালকৃত পাপপুণ্যের ফলাফল পরকালে অনিবার্য্যরূপে ভোগ করিতে হইবে, এইরূপ একটা অভ্রান্ত ও অটল বিশ্বাস স্বতঃই তখন তাঁহাদের মানসমন্দির অধিকার করে, এমতাবস্থায় মানুষ জ্ঞানতঃ কখনই পাপের নরকপথ আশ্রয় করিতে চাহে না, মৃত্যুর নাম শুনিলে তখন উপেক্ষার হাসি হাসিয়া বলিতে ইচ্ছা করে,—

"বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি,
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা-
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী।"

মৃত্যুই যদি জীবনের চরম সীমা এবং সুখ দুঃখের চির সমাধি হইল, তবে সেই বিশ্বপ্রসবিনী মহাশক্তি অনন্ত জ্ঞানের বিমলপ্রভায় জগতের চক্ষু ঝলসিত করিলেন কেন? এতদিন উৎকট বাসনা ও অনন্ত কৌতূহলের সহিত যে মহা-নাটকের প্রথম গর্ভাঙ্ক পাঠ করিলাম, ঐহিকলীলার পর্য্যাবসানের পর আর কি তাহার দ্বিতীয় অঙ্ক আরম্ভ হইবে না? যদি পূর্ণবিকাশের মনোমদ সৌন্দর্য্যে নয়ন মনের তৃপ্তিসাধন করিতে না পারিলাম, তবে কেবলমাত্র কোরক দর্শনে অতৃপ্তির তুষানলে দগ্ধবিদগ্ধ হইয়া, কেন এই আবর্ত্তভীষণ ভবসিন্ধুর বিশাল বক্ষে ঝম্পপ্রদান করিলাম? যে অমৃতবীজ একদিন জীবনের মধুর প্রভাতে, বাসনার

উর্ব্বর ক্ষেত্রে যত্নের সহিত উপ্ত, আশার স্নিগ্ধ শীতল সলিল প্রক্ষেপে অঙ্কুরিত—ক্রমবর্দ্ধিত ও ফলফুলে শোভিত হইয়া অপূর্ব্বশ্রী ধারণ করিল, কে আজ সেই কল্পপাদপের মূলোৎপাটন করিয়া শূন্যসমুদ্রে নিক্ষেপ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছে? নৈতিক ও মানসিক আকাঙ্ক্ষার পরিণাম কি শুধু সেই দগ্ধভীষণ—মরুময়—ধূ-ধূ—ভবিষ্যৎ? ইহা স্মরণ করিতেও গাত্র কণ্টকিত হইয়া উঠে। বলিতে পার, ইহলোকে তুমি অনেক পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে—জীবনসংগ্রামে জগতের কঠোর তিরস্কার, অন্তর্দাহকর নিন্দাবাদ ও অসহ্য নিগ্রহ সহাস্যবদনে সহ্য করিয়া লোকহিতব্রতে জীবন উৎসর্গ করিলে; যেখানে আমার মত মহাপাপীর প্রবঞ্চনা, শঠতা, গুপ্তহত্যা প্রভৃতি মহাপাপের লোমহর্ষণ অভিনয়, সেখানে তোমার মোহন পাঞ্চজন্যের সুগম্ভীর পুণ্যনির্ঘোষ! যেখানে আমার মত বিষয়লিপ্সু সংসারকীটের অবিদ্যার অমানিশি, সেখানে তোমার নির্ম্মল জ্ঞান ও পূত সদ্ভাবের পৌর্ণমাসী; যেখানে আমার ন্যায় শোকজীর্ণ ও জরাভারগ্রস্ত ব্যথিতের মর্ম্মন্তুদ যন্ত্রণা, সেখানে তোমার শুশ্রূষার মঙ্গলময়ী সুব্যবস্থা ও সহানুভূতির সুগভীর সান্ত্বনা, যেখানে দুর্ভিক্ষরাক্ষস করালজিহ্বা বিস্তারে জীবজগৎকে গ্রাস করিতে উদ্যত, সেখানে তোমার অপরিমেয় দানকর্ম্মের মঙ্গলময় মুক্তহস্ত। স্বীকার করি, তোমার এই রাশি রাশি সুকীর্ত্তির যোগ্য পুরস্কার ইহলোকে দুর্লভ, কিন্তু তাহা বলিয়া কি তুমি পুরস্কারের জন্য একটা অপর কোন জগতের প্রত্যাশা ও রাখিবে না? অন্ততঃ এই সুবিচারের জন্যও কি পরলোকের প্রয়োজন হইতেছে না? একজন সংকীর্ণ স্বার্থের পথ পরিষ্কার করিবার জন্য অসংখ্য দেবায়তন্ চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া তদুপরি নিজের ভদ্রাসন নির্ম্মাণ করিল, বিগ্রহশিলায় প্রাসাদের সোপান প্রস্তুত করিয়া, ন্যায় ও ধর্ম্মের নাম জগতের অভিধান হইতে মুছিয়া দিল; হে সাধুশ্রেষ্ঠ পরমপুরুষ! তুমি কি বলিতে চাও যে, তোমার ও তাহার জন্য ভিন্ন ভিন্ন বিধান নাই? বলিতে চাও কি যে, তপোরত যোগী ও তৃষ্ণাদগ্ধ ভোগীর একই আখ্যা একই অভিধান? ঐ যে প্রতিভাসম্পন্ন দেবোপম কবি ক্ষিপ্তগ্রহসম ধরাতে আসিয়া জ্বলিয়া শেষ হইলেন, অতি নগণ্য জঘন্য অবস্থায় জগতের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া অতিকষ্টে স্বীয় কাব্যময় জীবন অতিবাহিত করিলেন; আবার ঐ যে একজন ধর্ম্মবীর উদার বিশ্বপ্রেমে প্রমত্ত হইয়া যথেচ্ছাচারী বিরুদ্ধবাদিগণের দৃপ্ত-পদতলে আজীবন নিষ্পেষিত হইলেন, কণ্টকের কিরীট মস্তকে লইয়া জীবনসংগ্রামে অশেষ কষ্ট সহ্য করিয়া অবশেষে শোণিতের অক্ষরে প্রেম ও পুণ্যের জয় বিশ্বের পটে লিখিয়া গেলেন, উঁহাদের পুরস্কারের

জন্যও কি একটা বিভিন্ন জগতের প্রয়োজন উপলব্ধি হইতেছে না? তাহা যদি না হয়, তবে জানিব, ধর্ম্ম মিথ্যা—দেবতা মিথ্যা—সমস্তই মিথ্যা।

শ্রীসুরথনাথ মুখোপাধ্যায়।
(বীরভূমবাসী)

কপিলোপাখ্যান

মনুকন্যা দেবহূতির গর্ভে ও মহাতপা কর্দ্দম ঋষির ঔরসে ভগবান শ্রীকপিল দেব আবির্ভূত হইয়া, স্বীয় জননীকে অবলম্বন করিয়া যোগতত্ত্ব সম্বন্ধে যে সকল উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, অদ্যাবধি কোন শাস্ত্রে কোন বক্তাই সেইরূপ সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর, হৃদয়ান্ধকার নাশক উপদেশ প্রদান করিতে পারেন নাই। উক্ত কপিলদেবের জীবনী সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত আছে, আমরা এস্থলে তৎসম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা না করিয়া কেবলমাত্র আবির্ভাবের পূর্ব্বাপর কয়েকটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা প্রকাশ করিয়া তাঁহার নিজমুখ-নিঃসৃত অমিয় উপদেশাবলী যথাসাধ্য বর্ণনে ইচ্ছা করিয়াছি এক্ষণে শ্রীভগবৎ কৃপায় কতদূর কৃতকার্য্য হইতে পারিব তাহা তিনিই জানেন।

মহাতপা কর্দ্দম ঋষি যখন স্বীয় ধর্ম্মপত্নী দেবহূতিকে বলিয়া তপস্যার নিমিত্ত আশ্রম পরিত্যাগ করিয়া বনে গমনের ইচ্ছা করিলেন, তখন পতি-বিরহ ভাবনায় কাতরা, পতিপরায়ণা দেবহূতি নানাপ্রকার যুক্তিতর্কের দ্বারা পতিকে আরও কিছুদিন নিজ সন্নিধানে রাখিতে চাহিলেন এবং নানাপ্রকার কথোপকথনের পর বিনয়-সহকারে পতিকে বলিতে লাগিলেন ;—

সঙ্গো যঃ সংসৃতের্হেতুরসৎসু বিহিতোঽধিয়া।
স এব সাধুষু কৃতো নিঃসঙ্গত্বায় কল্পতে॥
নেহ যৎ কর্ম্মধর্ম্মায় ন বিরাগায় কল্পতে।
ন তীর্থপদসেবায়ৈ জীবন্নপি মৃতো হি সঃ॥
সাহং ভগবতো নূনং বঞ্চিতামায়য়া দৃঢ়ম্।
যত্ত্বাং বিমুক্তিদং প্রাপ্য ন মুমুক্ষেয় বন্ধনাৎ॥

অর্থাৎ ;—"হে স্বামিন্! অজ্ঞানের দ্বারা চালিত হইয়া জীব যদি অসতে আসক্ত হয়, তবে ঐ আসক্তি সংসার বন্ধনের কারণ হয় সত্য, কিন্তু অজ্ঞানবশতঃও

যদি সতে অর্থাৎ সাধুপুরুষে আসক্ত হয় তবে ঐ আসক্তিই যে সংসার বন্ধন বিনাশক হয় তাহাতে সন্দেহ নাই। সুতরাং আমার যাহাতে ভববন্ধন মোচন হয় তাহা করিয়া যথার্থ পতির কার্য্য করুন। প্রভো! এই জগতে ইন্দ্রিয়াদি ব্যাপার যাহার ধর্ম্মের নিমিত্ত না হয়, এবং ঐ ধর্ম্ম যাহার বৈরাগ্য সম্পাদন না করে, ও ঐ বৈরাগ্য যদি আবার পুণ্যশ্লোক ভগবান শ্রীহরির প্রতি আসক্তি না জন্মায়, তাহা হইলে সে ব্যক্তির জীবন ধারণ করা বৃথা, সে প্রাণ ধারণ করিয়াও মৃতের ন্যায় কালযাপন করে। ধর্ম্মে যারা চিত্ত শুদ্ধি হইবে, চিত্ত শুদ্ধি হইলে অনিত্য বস্তুতে আসক্তি থাকিবে না, আর ঐ আসক্তি না থাকিলেই শ্রীভগবানে ভক্তির উদয় হইবে। যাহার তাহা না হয়, তাহার যেমন সকল কর্ম্মই বিফল হয়, সেইরূপ আমিও নিশ্চয়ই শ্রীহরির অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মায়া দ্বারা অতিশয় মুগ্ধ হইয়া, তত্ত্বজ্ঞান লাভে বঞ্চিত হইয়া জীবন্মৃতাবস্থায় রহিয়াছি, কেননা আপনার ন্যায়, সাক্ষাৎ মুক্তিদাতা স্বামী পাইয়াও সংসার বন্ধন হইতে মুক্ত হইবার জন্য একদিনও প্রার্থনা করি নাই কেবল ভোগবাসনা চরিতার্থ করিতেই মত্ত ছিলাম, হায় হায়! আমি কি মন্দ ভাগ্য, আমার কি উপায় হইবে।"

মাননীয়া দেবহূতি এইরূপ নানাপ্রকারে অতিকাতরতার সহিত আপন কৃত-কর্ম্ম সকলের উল্লেখ করিতে থাকিলে, দয়ার্দ্র-হৃদয় মহর্ষি কর্দ্দম শ্রীভগবানের বাক্য অর্থাৎ কর্দ্দম ঋষির তপস্যাকালে "আমি অংশের সহিত তোমার ঔরষে জন্মগ্রহণ করিব" এই ভগবদাশীর্ব্বাদ বাক্য স্মরণ করিয়া দেবহূতিকে বলিলেন ;—

মা খিদো রাজপুত্রিত্থমাত্মানং প্রত্যনিন্দিতে।
ভগবাংস্তেঽক্ষরো গর্ভমদূরাৎ সংপ্রপৎস্যতে ॥
ধৃত ব্রতাসি ভদ্রং তে দমেন নিয়মেন চ।
তপোদ্রবিণদানৈশ্চ শ্রদ্ধয়াচেশ্বরংভজে ॥
স ত্বয়া রাধিতঃ শুক্লো বিতন্বন্ মামকং যশঃ।
ছেত্তা তে হৃদয়গ্রন্থিমৌদর্য্যো ব্রহ্মভাবনঃ ॥

অর্থাৎ ;—হে অনিন্দিতে রাজপুত্রি! তুমি আর আপনাকে ভাগ্যহীনা বলিয়া ওরূপ আক্ষেপ করিও না, কারণ জীব যেরূপ কর্ম্ম করিয়া আইসে, সেইরূপ ফলই ভোগ করিয়া থাকে ; সে জন্য দুঃখ করিতে নাই, আর দুঃখ করিয়াই বা কি করিবে। শ্রীভগবান পূর্ণব্রহ্মনারায়ণ শীঘ্রই তোমার গর্ভে

পুত্ররূপে আবির্ভূত হইবেন, পূর্ব্বে তুমি অনেক ব্রতাদির অনুষ্ঠান করিয়াছ, তাহার ফলে তোমার মঙ্গল হউক। তুমি এক্ষণে ইন্দ্রিয়দমন, স্বধর্ম্মাচরণ ও তপস্যানুষ্ঠানাদি করিয়া শ্রদ্ধার সহিত ভগবান শ্রীহরির আরাধনা কর, তোমার আরাধনায় প্রসন্ন হইয়া সেই সত্বস্বরূপ ভগবান আমাকে উপলক্ষ করিয়া আমার যশ বিস্তার করতঃ তোমার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিবেন ও তত্ত্ব-উপদেশাদি দ্বারা তোমার হৃদয়গ্রন্থি অহঙ্কারাদি শীঘ্রই দূর করিবেন। তুমি অনন্যমনে এক্ষণে তাঁহারই ধ্যান কর ও সেই মঙ্গলনিদান শ্রীহরির আগমনের জন্য প্রতীক্ষা কর। আমি তাঁহার আবির্ভাবকাল পর্য্যন্ত তোমাকে ত্যাগ করিয়া যাইব না।

দেবহূতি স্থির চিত্তে স্বামীর বাক্য শ্রবণ করিলেন এবং ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক কূটস্থ নির্ব্বিকার জগৎ গুরু শ্রীহরিকে আরাধনা করিতে লাগিলেন।

এইরূপে কিছুকাল গত হইলে পর ভগবান শ্রীমধুসূদন কর্দ্দমের বীর্য্য আশ্রয় করিয়া কাষ্ঠে যেমন অগ্নি প্রকাশিত হয় সেইরূপ, দেবহূতির গর্ভে পুত্ররূপে আবির্ভূত হইলেন। যখন আবির্ভূত হইলেন, তখন—

অবাদয়ং স্তথা ব্যোম্নি বাদিত্রানি ঘনাঘনাঃ।
গায়ন্তি তং স্ম গন্ধর্ব্বা নৃত্যন্ত্যপ্সরসোমুদা॥
পেতুঃ সুমনসো দিব্যাঃ খেচরৈরপবর্জ্জিতাঃ।
প্রসেদুশ্চ দিশঃ সর্ব্বা অম্ভাসি চ মনাংসি চ॥

অর্থাৎ ;— আকাশে সুমধুর মেঘ সকল গর্জ্জন করিতে লাগিল, দেবগণ বাদ্যধ্বনি করিতে লাগিলেন, গন্ধর্ব্বগণ ভগবানের যশঃ কীর্ত্তন করিতে লাগিল, ও অপ্সরাগণ আনন্দে নৃত্য করিতেছিল এবং আকাশ হইতে দেবগণ কর্ত্তৃক প্রদত্ত স্বর্গীয় পুষ্প সকল পতিত হইতে লাগিল দিক্ সকল ও সর্ব্বপ্রাণিগণের চিত্ত প্রসন্ন হইয়া উঠিল। এইরূপে সকল প্রকারে শুভযোগ উপস্থিত হইলে, স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানবান, পরমতত্বজ্ঞ স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা, মরীচি প্রভৃতি ঋষিগণকে সঙ্গে করিয়া সরস্বতী নদীর তীরস্থ সেই কর্দ্দম ঋষির পবিত্র আশ্রমে শুভাগমন করিলেন ও সাংখ্যতত্ত্ব প্রচারের জন্য ভগবান পূর্ণব্রহ্মসনাতন বিশুদ্ধ সত্বাংশে আবির্ভূত হইয়াছেন ইহা জানিতে পারিয়া নির্ম্মলান্তঃকরণে ভগবানের করণীয়কে অর্থাৎ জীবদিগকে তত্ত্বোপদেশরূপ কার্য্যকে প্রশংসা করতঃ সমস্ত ইন্দ্রিয়গণের সহিত পুলকিতান্তঃকরণে দেবহূতি ও কর্দ্দম ঋষিকে বলিতে লাগিলেন ;—

শ্রীব্রহ্মোবাচ—

ত্বয়া মেঽপচিতিস্তাত কল্পিতা নির্ব্যলীকতঃ।
যন্মে সংজগৃহে বাক্যং ভবান্ মানদ মানয়ন্॥
এতাবতেব শুশ্রূষা কার্য্যা পিতরি পুত্রকৈঃ।
বাঢ়মিত্যনুমন্যেত গৌরবেণ গুরোর্ব্বচঃ॥

পরম তত্ত্বজ্ঞ স্বয়ং ব্রহ্মা বলিলেন, বৎস কর্দ্দম! তুমি নিষ্কপট ভাবে আমার পূজা করিয়াছ, হে মানদ! যেহেতু তুমি আমার সম্মানরক্ষা করতঃ আমার বাক্য প্রতিপালন করিলে। দেখ! পিতামাতা প্রভৃতি গুরুজনের বাক্য অতি গৌরবের সহিত যে পালন করা তাহাই গুরুজনের পরিচর্য্যা বলিয়া কথিত হইয়া থাকে, আর সৎপুত্রে উহা করাও একান্ত কর্ত্তব্য। বৎস! আর তোমাকে যাহা বলিতেছি শ্রবণ কর;—

ইমা দুহিতরঃ সত্যস্তব বৎস সুমধ্যমাঃ।
সর্গমেতং প্রভাবৈঃ স্বৈর্ব্বৃংহয়িষ্যন্তিনৈকধা॥
অতস্ত্বমৃষিমুখ্যেভ্যো যথাশীলং যথারুচী।
আত্মজঃ পরিদেহ্যদ্য বিস্তৃণীহি যশোভুবি॥

হে বৎস! তোমার এই সুন্দরী কন্যাগণ নিজ নিজ প্রভাবের দ্বারাই আমার অভিপ্রেত এই সৃষ্টিকার্য্য অনেক প্রকারে বিস্তার করিবে, সুতরাং তুমি কালবিলম্ব না করিয়া আমার সহিত আগত মরীচি প্রভৃতি প্রধান প্রধান ঋষি-বৃন্দের যাহার যেরূপ চরিত্র ও যাহার সহিত যাহার মিলন সম্ভব হয় তাহা বিবেচনা পূর্ব্বক অদ্যই কন্যাগণকে তাহাদিগের করে সম্প্রদান করিয়া ভূমণ্ডলে অতুলনীয় কীর্ত্তি স্থাপন কর। হে মুনি! প্রাণীগণের বাঞ্ছনীয়বর প্রদানে সমর্থ এই অপূর্ব্ব দেহধারী নিজ শক্তির দ্বারা অবতীর্ণ আদি পুরুষ শ্রীনারায়ণ যে তোমার পুত্ররূপে কপিল নামে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাহা আমি বিশেষভাবে জ্ঞাত আছি। এক্ষণে তুমি আমার পূর্ব্বকথিতানুসারে কার্য্য করিয়া আমার বাসনা পূর্ণ কর।

অনন্তর দেবহূতির প্রতি দৃষ্টি করিয়া বলিলেন,—

জ্ঞানবিজ্ঞানযোগেন কর্ম্মণামুদ্ধরন্ জটাঃ।
হিরণ্যকেশঃ পদ্মাক্ষঃ পদ্মমুদ্রাপদাম্বুজঃ॥
এষ মানবি তে গর্ভং প্রবিষ্টঃ কৈটভার্দ্দনঃ।
অবিদ্যাসংশয়গ্রন্থিং ছিত্ত্বা গাং বিচরিষ্যতি॥

অয়ং সিদ্ধগণাধীশঃ সাংখ্যাচার্য্যৈঃ সুসম্মতঃ।
লোকে কপিল ইত্যাখ্যাং গন্তা তে কীর্ত্তিবর্দ্ধনঃ॥

অর্থাৎ হে মনুতনয়ে! পদ্মমুদ্রাঙ্কিত চরণ, পদ্মনেত্র, সুবর্ণকেশপাশ বিশিষ্ট তোমার এই বালকটী সামান্য নয়, ইনি শাস্ত্রজ্ঞান ও পরোক্ষ জ্ঞানরূপ উপায় দ্বারা জীবের কাম্য কর্ম্ম সমুদ্ভূত বাসনা সকল দূর করতঃ এই পৃথিবীতে বিচরণ করিবেন। এই কৈটভারী শ্রীহরি তোমার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া অবিদ্যা অর্থাৎ স্বরূপের অজ্ঞান এবং সংশয় অর্থাৎ মিথ্যাজ্ঞান রূপ যে তোমার হৃদয় গ্রন্থি তাহা ছিন্ন করিয়া জ্ঞানোপদেশ দ্বারা জীব সমূহের হৃদয়ান্ধকার দূর করিয়া পরমসুখে অবনিমণ্ডলে বিচরণ করিবেন। হে বৎসে। তোমার এই পুত্র সিদ্ধচারণগণের অধীশ্বর এবং সাংখ্যাচার্য্যদিগের গুরুরূপে পূজনীয় হইয়া তোমার অতুল যশ ও কীর্ত্তি বর্দ্ধন করতঃ জগতে "কপিল" এই নামে খ্যাত হইবেন। জগতগুরু, সৃষ্টি কর্ত্তা ব্রহ্মা দেবহূতিকেও কর্দ্দম ঋষিকে এইরূপ ভাবে উপদেশাদি দান করিয়া নারদাদি কতিপয় কুমারগণের সহিত হংসে আরোহণ পূর্ব্বক অত্যুত্তম সত্যলোকে গমন করিলেন। এদিকে ব্রহ্মাপ্রস্থান করিলে পর তাঁহার আজ্ঞাপ্রাপ্ত কর্দ্দমঋষি নিজের কন্যাগণকে মরীচি প্রভৃতি ঋষিগণের হস্তে যথাযোগ্য ভাবে সম্প্রদান করিলেন। কাহাকে কোন কন্যা সম্প্রদান করা হইয়াছিল তাহা বর্ণিত হইতেছে, যথাঃ—

মরীচয়ে কলাং প্রাদাদনসূয়ামথাত্রয়ে।
শ্রদ্ধামঙ্গিরসেহযচ্ছৎ পুলস্ত্যায় হবির্ভুবম্॥
পুলহায় গতিং যুক্তাং ক্রতবেচ ক্রিয়াং সতীম্।
খ্যাতিঞ্চ ভৃগবেহযচ্ছদ্ বশিষ্ঠায়াপ্যরুন্ধতীম্॥
অথর্ব্বণেহ দদাচ্ছান্তিং যয়া যজ্ঞোবিতন্যতে।
বিপ্রর্ষভান্ কৃতোদ্বাহান্ সদারান্ সমলালয়ৎ॥

অর্থাৎ মরীচিকে কলানাম্নী কন্যাদান করিলেন, অত্রিকে অনসূয়া, অঙ্গিরাকে শ্রদ্ধা, পুলস্তকে হবির্ভূনামক কন্যা, পুলহকে তদুপযুক্তা গতিনাম্নী, ক্রতুকে সুশীলা, ভৃগুকে খ্যাতি, বশিষ্ঠকে অরুন্ধতী, অথর্ব্বকে শান্তিনাম্নী কন্যা দান করিলেন এবং ঐ সকল বিবাহিত সস্ত্রীক ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠঋষিগণকে যথাসাধ্য যৌতুকাদি দ্বারা বিশেষ ভাবে সন্তুষ্ট করিলেন।

অনন্তর কৃত বিবাহ সেই মরীচি প্রভৃতি ঋষিগণ মহাতপা কর্দ্দমের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক সহর্ষে স্ব স্ব আশ্রমে গমন করিলেন। এদিকে কর্দ্দমঋষিও দেব

শ্রেষ্ঠ শ্রীবিষ্ণু পুত্ররূপে নিজ গৃহে অবতীর্ণ হইয়াছেন জানিয়া নির্জ্জনে একাকী ঐ সন্তানের নিকট গমন করতঃ প্রণাম পূর্ব্বক করযোড়ে বলিতে লাগিলেন।—

শ্রীকর্দ্দমোবাচ

অহোপাযানানাং নিরয়ে স্বৈরমঙ্গলৈঃ।
কালেন ভূয়সা নূনং প্রসীদন্তীহদেবতাঃ॥
বহুজন্মবিপক্কেন সম্যগ্ যোগসমাধিনা।
দ্রষ্টুং যতন্তে যতয়ঃ শূন্যাগারেষু যৎপদম্॥
সএব ভগবানদ্য হেলনং ন গণয্য নঃ।
গৃহেষু যাতোগ্রাম্যাণাং যঃ স্বানাং পক্ষ পোষণঃ॥
স্বীয়বাক্যামৃতং কর্ত্তুমবতীর্ণোসি মে গৃহে।
চিকীর্ষুর্ভগবন্ জ্ঞানং ভক্তানং মানবর্দ্ধনঃ॥

কর্দ্দম ঋষি কহিলেন; হায় হায় নিজ নিজ পাপরূপ আগ্নদ্বারা নরকে অতিশয় দুঃখপ্রাপ্ত জীবসমূহের মঙ্গলের জন্য বহুসময় পরেতে দেবগণ প্রসন্ন হইয়া থাকেন, মুনিগণ বহু বহুজন্মের অনুষ্ঠিত তপস্যাদি ভক্তিযোগ লব্ধ চিত্তের একাগ্রতাদ্বারা শোভিত হইয়া পবিত্র নির্জ্জন গিরিকন্দরে থাকিয়া যাঁহার চরণ দর্শন করিতে অভিলাষ করেন, সেই সৎস্বরূপ সচ্চিদানন্দময় শ্রীভগবান আজ নিজের গৌরবকে গণনা না করিয়া, অতি নীচ যে আমরা আমাদের গৃহে অবতীর্ণ হইয়াছেন, প্রভো! আপনি ভক্তের কুলবর্দ্ধক সুতরাং ভক্তেরবাঞ্ছা পূরণের জন্যই যে আপনার এই জন্ম স্বীকার করা হইয়াছে তাহাতে আর কিছুমাত্রও সন্দেহ নাই। হে ভগবন্! আপনি আশ্রিতগণের মানদাতা, আপনি নিজবাক্য অর্থাৎ "আমি তোমার গৃহে জন্মগ্রহণ করিব" এই সত্য রক্ষার জন্য এবং জ্ঞানোপদেশক সাংখ্য শাস্ত্রপ্রচার দ্বারা কলুষিত জীবের মোহদূর করিবার জন্য আমার গৃহে অবতীর্ণ হইয়াছেন, আরও ;—

তান্যেব তেঽভিরূপাণি রূপাণি ভগবংস্তব।
যানি যানি চ রোচন্তে স্বজনা নামরূপিণঃ॥
ত্বাং সূরিভিস্তত্ত্ববুভুৎসয়াদ্ধা সদাভিবাদার্হণ পাদপীঠম্।
ঐশ্বর্য্য বৈরাগ্য যশোঽববোধবীর্য্যশ্রিয়া পূর্ত্তমহং প্রপদ্যে॥
পরংপ্রধানং পুরুষং মহান্তং কালং কবিং ত্রিবৃতং লোকপালম্
আত্মানুভূত্যানুগতপ্রপঞ্চং স্বচ্ছন্দশক্তিং কপিলং প্রপদ্যে

অস্মাভি পৃচ্ছেহস্য পতিং প্রজানাংত্বংয়াবতীর্ণাসি উতাপ্তকামঃ।
পরিব্রজৎ পদবীমাস্থিতোহহং চরিষ্যেত্বা হৃদিযুঞ্জন্ বিশোকঃ॥

হে ভগবন্! আপনি স্বয়ং নাম রূপাদি বিবর্জ্জিত হইলেও আপনার ভক্তগণ ধ্যানাদি দ্বারা যে যে রূপ অভিলাষ করে, যে যেভাবে ডাকে বা যে যেরূপ চিন্তা করে আপনি ভক্তবাঞ্ছা পূরণার্থ সেই সেই রূপই স্বীকার করিয়া থাকেন। আত্মতত্ত্বজ্ঞানেচ্ছুক পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক যাঁহার পাদপদ্ম সর্ব্বদা সেবিত হয় আপনি সেই সর্ব্বপূজ্য এবং ঐশ্বর্য্য, বৈরাগ্য, যশ, জ্ঞান, বীর্য্য ও শ্রী প্রভৃতি ষড়ৈশ্বর্য্যশালী শ্রীভগবান। আপনার শক্তি স্বাধীন এবং আপনি প্রকৃতি স্বরূপ ও প্রকৃতির অধিষ্টাতা পুরুষ, আপনিই সেই মহত্তত্ব ও গুণক্ষোভক কাল স্বরূপ এবং ইন্দ্রাদি দিক্পালগণের অধীশ্বর ও নিজ-শক্তির দ্বারা এই নিখিল প্রপঞ্চকে আত্মাতে লয় করিয়া থাকেন সম্প্রতি কপিল নামে সমাজে প্রকাশ হইতে ইচ্ছা করিয়া আমার গৃহে আবির্ভূত হইয়াছেন। আমি সর্ব্বান্তকরণে আপনার আশ্রয় লইলাম। হে জগৎপালক! আপনি সকল জীবের একমাত্র পালনকর্ত্তা আমি আপনাকে কিঞ্চিৎ মাত্র নিবেদন করিতেছি। আমার গৃহে আপনি আবির্ভূত হওয়ায় আমি দৈবঋণ ও পৈত্রিক ঋণ হইতে মুক্ত হইলাম, এবং আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক, এবং আধিভৌতিক এই তাপত্রয় হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া সফল মনোরথ হইয়াছি এক্ষণে আমি সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ পূর্ব্বক আপনাকে হৃদয়ে ধ্যান করত নিরাশঙ্ক ভাবে ইতঃস্তত ভ্রমণ করিব ইচ্ছা করিয়াছি। আপনার যাহা অনুমতি হয় করুন।

কর্দ্দমঋষির এই সকল সকাতর প্রর্থনা-স্তুতি শ্রবণ করিয়া ভগবান কপিলদেব বলিতে লাগিলেন ;—

শ্রীভগবানোবাচ।

ময়াপ্রোক্তংহি লোকস্য প্রমাণং সত্য লৌকিকে।
অথাজনি ময়াতুভ্যং যদবোচমৃতং মুনে॥
এতন্মে জন্মলোকেস্মিন্ মুমুক্ষূণাং দুরাশয়াৎ।
প্রসংখ্যানায় তত্বানাং সম্পতায়াত্ম দর্শনে
এষ আত্ম পথোহব্যক্তো নষ্টঃ কালেন ভূয়সা
তং প্রবর্ত্তয়িতুং দেহমিমং বিদ্ধি ময়াভৃতম্॥

কপিলরূপী ভগবান বলিলেন হে মুনে! বৈদিক ও লৌকিক কার্য্যে আমার বাক্যই সত্য বলিয়া প্রমাণিত হয় সেই জন্যই আপনার পুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ

করিলাম। এই সংসারে স্থূল শরীর হইতে মুক্তি লাভেচ্ছুক মুনিগণের আত্মতত্ত্বজ্ঞানের প্রকাশক যে সাংখ্যশাস্ত্র তাহা প্রকাশ করিতেই আমার এই জন্ম পরিগ্রহ করা। এই সূক্ষ্মতত্ত্ব প্রকাশক জ্ঞান মার্গই প্রসিদ্ধ কিন্তু কাল বশতঃ এই জ্ঞানমার্গ নষ্ট প্রায় হইয়াছে পুনর্ব্বার উহা প্রচারের জন্যই আমি এই শরীর ধারণ করিয়াছি। আরও—

গচ্ছকামং ময়া পৃষ্টো ময়ি সংন্যস্ত কর্ম্মণা।
জিত্বা সুদুর্জ্জয়ং মৃত্যু মমৃতত্বায় মাং ভজ॥
মামাত্মানং স্বয়ং জ্যোতিঃ সর্ব্বভূত গুহাশয়ম।
আত্মন্যেবাত্মনবীক্ষন্ বিশোকোঽভয়মৃচ্ছসি॥
মাত্রেচাধ্যাত্মিকীং বিদ্যাং শমনীং সর্ব্বকর্ম্মণাম্
বিতরিষ্যে যয়া চাসৌ ভয়ঞ্চাতি তরিষ্যতি॥

হে মুনে! আমি আপনাকে অনুমতি প্রদান করিতেছি, আপনি যথা ইচ্ছা গমন করিতে পারেন, কিন্তু আমাতেই সমস্ত কর্ম্মফল অর্পণ করতঃ অতি দুর্জ্জয় যে মৃত্যু তাহাকে জয় করিয়া মোক্ষ লাভের জন্য আমাকেই ভজনা করুন। এবং আপন বুদ্ধির দ্বারা আত্মাতে সর্ব্বভূতের অন্তর্যামী স্বপ্রকাশ পরমাত্মা স্বরূপ যে আমি সেই আমাকে অবলোকন করতঃ শোক রহিত হইয়া মোক্ষ ফলকেই লাভ করিবেন। হে পিতঃ! আপনি সাংসারের সকল ঋণমুক্ত হইলেন আমিই মাতা দেবহূতিকে সমস্ত কর্ম্মবাসনা বিনাসক, উপাসনার পরাকাষ্ঠা স্বরূপ যে আত্মতত্ত্ব জ্ঞান তাহা প্রদান করিব। যে জ্ঞানলাভ করিয়া মায়ামুগ্ধ জীব অনায়াসে ভবনদী পার হইয়া পরমানন্দ লাভে সমর্থ হয়।

প্রজাপতি কর্দ্দমঋষি নিজ পুত্ররূপী শ্রীভগবান কপিলদেবের এই সকল উপদেশপূর্ণ বাক্যাবলী শ্রবণে, আহ্লাদিত হইয়া তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করতঃ অরণ্যাভিমুখে গমন করিলেন এবং বনে যাইয়া ভগবৎ পরায়ণ মুনিগণের আচরিত অহিংসাদি ব্রত সকল আচরণ করতঃ নিরাসক্ত হইয়া কাম্যকর্ম্ম হোমাদি এমন কি অগ্নি সংস্কার দ্বারা নিজের আহারাদির সংস্থান পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া পৃথিবীর নানা স্থানে বিচরণ করিতে লাগিলেন। তিনি সৎ ও অসৎ এই পরিচ্ছেদ শূন্য, নিত্য সত্য প্রাকৃত গুণবর্জ্জিত অথচ মধুরাদি গুণের প্রকাশক যে শ্রীভগবান, তাঁহাকে নির্ম্মল ভক্তির দ্বারা আত্মাতে অনুভব করিয়া তাঁহাতেই মনোনিবেশ পূর্ব্বক দেহাদিতে অহং ভাব শূন্য, গৃহ কলত্রাদিতে মমতা রহিত, শীত উষ্ণাদিতে অব্যাকুলচিত্ত, সর্ব্বত্র সমদৃষ্টি আত্মদর্শী ও অন্তর্ম্মুখা বৃত্তিদ্বারা

স্থিরচিত্ত ও মনস্বী হইয়া তরঙ্গহীন সমুদ্রের ন্যায় নিঃশব্দে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

সর্ব্বান্তর্য্যামী সর্ব্বজীব জীবন বিশ্বপালক ভগবান বাসুদেবেতে পরম ভক্তি ভাব দ্বারা আত্মসমর্পণ পূর্ব্বক নিখিল মায়া বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া সর্ব্বজীবেতেই শ্রীহরিকে, এবং সকল প্রাণীকেও শ্রীহরিতে দর্শণ করিতে লাগিলেন, এই প্রকার নানা ভাবে রাগ দ্বেষাদি রহিত সর্ব্বত্র সমদর্শী হইয়া প্রজাপতি কর্দ্দম ভগবদ্ভক্তি দ্বারা শ্রীভগবানের পার্ষদরূপ অপূর্ব্বগতি লাভ করিলেন।

ক্রমশঃ

ভালবাসা

মায়া দয়া ভক্তি প্রেম, ভালবাসার অঙ্গ।
সলিলের অঙ্গ যেমন বিবিধ তরঙ্গ॥

পরমকারুণিক পরমেশ্বর এই প্রপঞ্চ জগত পরিপালন জন্য ও জীবগণের উদ্ধারের নিমিত্ত, প্রত্যেক জীবেরই অন্তঃকরণে ভালবাসা জাগাইয়া রাখিয়াছেন। এই ভালবাসার গূঢ় তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিলেই জীব মায়াতীত ও মুক্ত হইয়া থাকে। ভালবাসা বলিতে সাধারণতঃ আমরা আত্মীয় স্বজন ও বিষয় সম্পত্ত্যাদির প্রতি মায়া, মমতা ও স্নেহ বলিয়া বুঝিয়া থাকি; কিন্তু কেবল তাহা নহে। তাহা অপেক্ষা আরও গুরুতর তত্ত্ব যে এই ভালবাসার মধ্যে নিহিত রহিয়াছে, তাহা আমরা বুঝিয়াও বুঝিতে পারি না। আমরা মায়া, মমতা ও স্নেহের বশীভূত হইয়া ক্রমশঃ নীচগামী হইয়া থাকি। সুতরাং উর্দ্ধের গূঢ় তাৎপর্য্য কিছুমাত্রই উপলব্ধি করিতে সমর্থ নয়। আত্মীয় স্বজন ও বিষয় বৈভবের উপর অনুরাগ বা আসক্তি কাটাইয়া ভালবাসা হইতে উত্থিত দয়া ও ভক্তির আর দুইটী ধারা দেখিতে পাইব। ঐ দুইটী ধারা ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত ও গাঢ় ভাবান্বিত অবস্থায় একত্র সংযুক্ত হইয়া যখন একধারায় পরিণত ও অধিকতর গাঢ়ভাব ধারণ করে, তখনই প্রেম নামে অভিহিত হয়। মায়ার ধারা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক দয়া ভক্তির ধারা ধরিয়া চলিলেই উর্দ্ধগামী হওয়া যায় ও ভালবাসার চরমস্থল যে প্রেম, তাহা লাভ হইয়া থাকে। এখন বুঝিতে হইবে যে, যেমন বিষ্ণু-

পাদোদ্ভবা পতিত পাবনী সুরধুনী গঙ্গা একই পদার্থ হইয়া স্থান বিশেষে মন্দাকিনী, ভাগিরথী ও ভোগবতী নামে অভিহিতা হইয়াছেন, সেইরূপ মায়া দয়া ভক্তি ও প্রেম সকল গুলিই এক ভালবাসার নামান্তর মাত্র। পিতা, মাতা, পুত্র, কলত্র, ভ্রাতা, ভগিনী, কন্যা প্রভৃতি আত্মীয় স্বজন ও ক্ষেত্র বিত্তাদির প্রতি যে ভালবাসা, তাহার নাম মায়া বা মমতা বা স্নেহ। সর্ব্বভূতে যে ভালবাসা, তাহার নাম দয়া। গুরু, উপদেশক, দেবতা ব্রাহ্মণ, শাস্ত্রাদি শ্রবণ ও অধ্যয়ন ও অপরাপর গুরুজনের প্রতি, উপদেশানুসারে যে ভালবাসা জন্মায়, তাহার নাম ভক্তি। আর এই মায়া, দয়া ও ভক্তিরূপা ভালবাসাকে চারিদিক হইতে গুটাইয়া লইয়া একমাত্র ভগবানে অর্পণ করিলে, অথবা জাগতিক নিখিল পদার্থকেই ভগবানের মূর্ত্তিজ্ঞানে, ভালবাসিতে পারিলেই, হইল প্রেম। প্রেমের নিকট প্রেমময় ভগবান ব্যতীত আর কিছুই অবস্থান করিতে পারে না। প্রেম ব্যতীত আর যে সকল ভালবাসা, তাহাদের নামই হইল কাম। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত বলেন "আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি-ইচ্ছা তারে বলিকাম। কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি-ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম॥" কামে নিরন্তর আত্ম প্রীতির ইচ্ছা বর্ত্তমান থাকে, আর প্রেমে নিরন্তর কেবল মাত্র ভগবৎ প্রীতির ইচ্ছাই বলবতী হইয়া থাকে, আত্ম-প্রীতির গন্ধ মাত্রও থাকে না। অতএব ভালবাসাই হইল, মায়া, দয়া, ভক্তি, প্রেম, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ ও সংসারের মূল। ভালবাসা না থাকিলে জগত চলিতে পারে না এবং জগতের জীবও জীবিত থাকিয়া কোন কার্য্যাদি করিতে সক্ষম হয় না।

বিশ্বস্রষ্টার সৃষ্টি মধ্যে কি মনুষ্য, কি পশু, কি পক্ষী, কি কীট, কি পতঙ্গ, কি বৃক্ষ, কি গুল্ম, কি লতা, ও কি তৃণাদি সকলকেই, অভিমান শূন্য হইয়া, ভালবাসিতে শিক্ষা করা আমাদের নিতান্ত আবশ্যক। অভিমান বশতঃ পণ্ডিত মূর্খ, সুরূপ, কুরূপ, ধনী দরিদ্র, বৃদ্ধ বালক, কুলীন অকুলীন, ভদ্র অভদ্র, শক্র মিত্র, রুগ্ন অরুগ্ন, ইত্যাদি বিচার করিয়া কাহাকেও ভালবাসিতে ও কাহাকেও ঘৃণা করিতে নাই। নিরভিমান হইয়া ব্রহ্মাদি তৃণ পর্য্যন্ত সকলকেই সমান ভাবে ভালবাসা কর্ত্তব্য। কারণ ভালবাসাই হইল ধর্ম্মের মূল, আর নরকের মূল হইল অভিমান। অতএব প্রাণপনে কখনও ভালবাসাকে পরিত্যাগ করিয়া, নরক মূল অভিমানকে প্রশ্রয় দেওয়া আমাদের উচিত নহে।

ভালবাসা প্রথমতঃ তরল পদার্থের ন্যায় নিম্নগা হইয়া থাকে। তখন ইহাকে

মায়া বলা যায়। এই মায়া হইতেই মায়াময় জগৎ পরিচালিত ও পরিপালিত হয়। আবার এই তরল ভালবাসাকে দুগ্ধের ন্যায় পাত্রে চড়াইয়া জাল দিতে দিতে ক্রমশঃ যত গাঢ় করা যায় ততই দয়া ভক্তি ও উভয়ের সংযোগে অবশেষে ক্ষীরবৎ প্রেমের উদয় হয়। এই প্রেমেরই অন্য নাম হইল ভগবৎ-ভক্তি বা প্রেম-ভক্তি। ভগবৎভক্তি বা প্রেমভক্তির উদয় হইলে, প্রেমময় ভগবানের চিন্ময় মূর্ত্তির দর্শন পাওয়া যায় ও তখন বিশ্ব-চরাচর সকলই সেই প্রেমময় ভগবানের মূর্ত্তি বলিয়া জ্ঞান হয়, অর্থাৎ তখন দিব্যচক্ষু লাভ হইয়া থাকে এবং মর্ত্ত্য চক্ষুর বিপর্য্যয় ঘটে। এই প্রেম বা অহৈতুকী ভক্তি আবার বাৎসল্য, সখ্য, দাস্যাদি করিয়া নানা রকমের আছে। পরন্তু সকল রসের নিকটই ভগবান প্রেমের বা ক্ষীরের পুত্তলিকার ন্যায় হইয়া থাকেন ও বাঁধা পড়েন। দেখুন, প্রেমের কি অসাধারণ শক্তি! যাঁর মায়াতে জগতের সকল জীব জন্ম জন্মান্তর ধরিয়া কত রকমের খেলা খেলিয়া বেড়ায় ও দারুণ বন্ধন যন্ত্রণা ভোগ করে, তাঁহাকেও প্রেমের নিকট নানা বিধ খেলা খেলিতে ও বন্ধন স্বীকার করিতে হয়। সকলেই জানেন ভক্তির সাক্ষাৎ মূর্ত্তি স্বরূপা মা যশোদা প্রেমময় ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বাঁধিয়া-ছিলেন। জগজ্জীবকে প্রেমভক্তি বা ভালবাসার অতি অপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত দেখাইবার জন্য শ্রীকৃষ্ণও বাঁধা পড়িয়াছিলেন। কেমন করিয়া ভগবানকে ভাল-বাসিতে হয়, তাহা জগজ্জীবকে লীলার ছলে শিক্ষা দিবার জন্যই ভগবানের রাসলীলা। কার্ত্তিকী পূর্ণিমা রজনীতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যমুনা পুলিনে বিহার করিতে করিতে অধর সংযোগে যখন মধুর মুরলী ধ্বনি করিতেছিলেন, তখন কৃষ্ণ-প্রেম-বিহ্বলা গোপবালাগণ আত্মহারা হইয়া স্ব স্ব গৃহকার্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক সেই ঘোরা যামিনীতেই সেই পুলিন-বিহারী মুরলীধরের নিকট সমাগতা হইল; তিনি ছলনার ছলে প্রথমতঃ তাঁহাদিগকে উপদেশ দিতে লাগিলেন—শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন-ঘোরাযামিনী, হিংস্র জন্তুগণ চারিদিকে বিচরণ করিতেছে, এমন সময়, তোমরা স্ত্রীলোক এ গহন বনে কেন আসিলে? আমার কথা শুন, গৃহে ফিরিয়া যাও, পতিপুত্রের শুশ্রূষা কর, বন্ধুবান্ধবেরা তোমাদের অন্বেষণ করিতেছে, তাহাদের মনে কষ্ট দিওনা। পূর্ণিমা রজনীতে কুসুমিতা কাননের সুন্দর মাধুরী দেখিলে, যমুনানিল-কম্পিত তরুবরের মন্দান্দোলন দেখিয়া প্রীত হইলে, এখন ঘরে গিয়া পতিসেবা কর, সন্তান-গণের পান ভোজন সম্পাদন কর। তোমরা স্ত্রীজাতি, এই গভীরা রজনীতে

পরপুরুষের নিকট আর অধিকক্ষণ থাকিও না। কেহ দেখিতে পাইলে, তোমাদিগকে কুলটা ও কলঙ্কিনী বলিয়া ঘোষণা করিবে।"

ত্রিভঙ্গের এই ব্যঙ্গোক্তি পূর্ণ রঙ্গ দেখিয়া গোপললনাগণ কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন; পরে পরস্পর পরস্পরের মুখ চাওয়াচায়ী করিয়া বিবিধ প্রকার বাক্‌চাতুর্য্য ও প্রণয় ভর্ৎসনে ভগবানকে বিমুগ্ধ করতঃ কহিলেন হে প্রেমময় গোপীকাকান্ত! আমরা তোমাকেই পতি, পুত্র, বান্ধব ও সংসারের সার বলিয়া জানি। পুরুষের মধ্যে তুমিই আপনার আর সকলই পর। তুমি পর নও পরাৎপর ও সকলেরই উপর। তোমার পর আর কিছুই নাই। হে জগৎপতে! তোমায় পতিরূপে লাভ করিবার জন্যই, ঘৃণা লজ্জা ও ভয় বিসর্জ্জন দিয়া কাল্পনিক পতি পুত্রাদি ও মায়াময় সংসার পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমরা তোমার নিকট উপস্থিত হইয়াছি; সুতরাং কলঙ্কের, ঘৃণার, পরপুরুষ সমাগমের লজ্জা ও হিংস্র জন্তুগণের ভয় আমাদের আর নাই। গোপীবল্লভ! জগতে পতিপুত্র, বন্ধু বান্ধব প্রভৃতি যা কিছু আছে, সে সকলই যে তুমি। তুমি ব্যতীত জগতের অস্তিত্বই থাকিতে পারে না। গৃহে থাকিয়া পতিপুত্র ও আত্মীয় স্বজনাদির সেবা শুশ্রূষা আমরা যাহা করি, তাহা ত তোমারই করিয়া থাকি। অতএব হে প্রাণবল্লভ। আমরা স্ত্রীজাতি, কুল, মান, লজ্জা, ভয়, পতিপুত্র ও সংসার প্রভৃতি সকলই পরিত্যাগ করিয়া, এই ঘোরা যামিনীতে যখন তোমার শরণাপন্ন হইয়াছি, তখন আমাদিগকে আর বঞ্চনা করিও না; তোমার ঐ অভয় চরণ প্রান্তে আমাদিগকে শরণ প্রদান করিয়া আমাদের মনোরথ পরিপূর্ণ কর অর্থাৎ আমাদিগকে তোমারই সেবা শুশ্রূষায় নিযুক্ত থাকিতে দাও। দেখুন, গোপীকাগণের ভগবানকে ভালবাসিবার কি অপূর্ব্ব উচ্ছ্বাস; জগৎস্বামীকে লাভ করিবার জন্য মন এককালে উধাও হইয়াছে। সংসারের বন্ধন খুলিয়া গিয়াছে। সমুদ্র সঙ্গমাভিলাষে বেগবতী নদীর ন্যায় সকল বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া, মন ভগবৎ-পাদ-পদ্ম অভিলাষে ছুটীয়াছে। লীলাময় ভগবান শ্রীকৃষ্ণও জীবগণকে প্রেমের এই অদ্ভুত মহিমা বুঝাইবার জন্য মুরলী বাজাইয়া ক্রীড়া করিতেছেন ও প্রেমিক সাধকগণকে গোপীগণের ন্যায় আকর্ষণ করিয়া লইতেছেন। এই ত গেল সাধারণ গোপললনাগণের ভগবানের প্রতি ভালবাসা। আবার গোপললনাগণের প্রধানা নায়িকা প্রেমময়ী শ্রীমতী রাধিকার ভগবানের প্রতি যে কি অসাধারণ প্রীতি, তাহা বর্ণনা করিবার শক্তি কাহারও নাই।

স্বয়ং ভগবানই রাধার প্রেমে অধৈর্য্য হইয়া, অপরাধীর ন্যায় দাস খত লিখিয়া দিয়াছেন এবং রাধারই ভালবাসার ঋণ শোধ করিবার জন্য রাধারই হাব ভাব ও কান্তি গ্রহণ করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ অবতারে শ্রীমতী রাধার নাম স্মরণ করিতে করিতে উন্মত্তবৎ কত নাচিয়াছেন, নাচাইয়াছেন; গাহিয়াছেন; হাসিয়াছেন, হাসাইয়াছেন ও কত কাঁদিয়াছেন এবং কাঁদাইয়াছেন। শুনা যায়, এক এক সময় বন্যার ন্যায় প্রেমের পাথারে জগৎ ভাসাইয়াছেন ও অধিকাংশ জীবকে সেই পাথারে সাঁতার কাটাইয়া আনন্দের উচ্ছ্বাসে হাবুডুবু খাওয়াইয়াছেন। কিন্তু যাহারা অভিমানের টঙ বাঁধিয়া উচ্চে বসিয়া ছিলেন, তাহারা কেবল মদ ও মাৎসর্য্য রূপ পঙ্কদ্বয় অবলম্বন করিয়া যন্ত্রণাময় সাগরে হাবুডুবু খাইয়াছেন।

শ্রীমতী রাধার প্রতি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের যে কি প্রকার অনুরাগ, এবং ভগবানের প্রতি শ্রীমতীরাধারই বা যে কি প্রকার অনুরাগ, তাহা বুঝিবার শক্তি জীবের নাই বলিয়াই, রাধাকৃষ্ণ এক হইলেও দ্বিধা হইয়া দুইটী ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তিতে শ্রীবৃন্দাবনধামে লীলা করিয়াছেন। ভগবান হইয়াছেন পুরুষ আর রাধা হইয়াছেন প্রকৃতি। এই পুরুষ-প্রকৃতি, অগ্নি ও অগ্নির দাহিকা শক্তির ন্যায় একই পদার্থ ও অভিন্ন সচ্চিদানন্দ মূর্ত্তি। ভিন্ন ভাবিলেই ভেদজ্ঞান উপস্থিত হয়। আধা রাধা ও আধা কৃষ্ণ, এই দুই অর্দ্ধেকের সম্মিলনে হইয়াছেন এক রাধাকৃষ্ণ। প্রকৃত পক্ষে রাধা কৃষ্ণ দুইটী পৃথক বস্তু নহে। কেবল জগজ্জীবকে ভালবাসার অলৌকিক পরিচয় দেখাইবার জন্য ও প্রেমতত্ত্ব শিক্ষা দিবার নিমিত্তই তাঁহার এই প্রেমময় ও প্রেমময়ী মূর্ত্তিতে আবির্ভাব। আমরা অজ্ঞতা নিবন্ধন বুঝিতে বা চিনিতে পারি নাই বলিয়া দুইটী স্বতন্ত্র জ্ঞান করিয়া থাকি। ফল-কথা আমাদের রাধাকৃষ্ণ তত্ত্ব জানা আর কেদার ঘোষের বিশ্বনাথ মতিলালকে চেনা, একই রকমের হইয়া দাঁড়াইয়াছে। একটী গল্প শুনুন :—

"কোন এক সমৃদ্ধ জনপদে কেদার ঘোষ নামে একটী লোক বাস করিত। লোকটী ইংরাজী ও বাঙ্গালা লেখা পড়া দস্তুর মত শিখিয়াছিল। কিন্তু প্রকৃত বিদ্যার অভাবে অন্তরটী একদম খালি থাকায় যেখানে সেখানে আড়ম্বর আস্ফালন ও বাক্ চাতুর্য্যাদি প্রগল্‌ভতার প্রচার দ্বারা সর্ব্বদাই আত্মশ্লাঘা করিয়া বেড়াইত। একদিন তত্রস্থ পল্লীর কোন একটী বাবুর বৈঠকখানায় বসিয়া, অনেকগুলি ভদ্রলোকের সমক্ষে আস্ফালন করিয়া বলিতেছেন; ভারতবর্ষের মধ্যে এমন বড়লোক নাই যে, যার সঙ্গে আমার আলাপ পরিচয় ও বিশেষ জানা শোনা

নাই। রাজা মহারাজাই বল, জমীদার তালুকদারই বল, বড় বড় ডাক্তার কবিরাজই বল, জজ ম্যাজিষ্টেরই বল, ব্যারিষ্টার উকীলই বল আর পেশ্‌কার মোক্তারই বল, সকলেই আমায় চেনে ও খাতির করে। অধিক কি বলিব, স্বয়ং লাট সাহেবই কতবার শেক্‌হ্যাণ্ড ক'রে পার্শ্বের আসনে বসিয়ে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ব্যাপার সম্বন্ধে কত কথাবার্ত্তা ক'য়েছেন ও পরামর্শ জিজ্ঞাসা করেছেন।" এইরূপ নানাবিধ আড়ম্বর আস্ফালন চলিতেছে আর ঐ আড়ম্বর আস্ফালন শুনিবার জন্য কত লোক জুটিতেছে। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ বিশ্বাস করিয়া কৌতূহলাক্রান্ত চিত্তে শুনিতেছে; আর কেহ কেহ, সকলই মিথ্যা জ্ঞানে, অবিশ্বাস করিয়া চলিয়া যাইতেছে। কিয়ৎক্ষণ পরে প্রায় সকল লোকেই যখন চলিয়া গেল, তখন একটী লোক ঐ কেদার বাবুর নিকটবর্ত্তী হইয়া নমস্কারপূর্ব্বক আত্ম-পরিচয় প্রদান করতঃ কহিলেন; "মহাশয়! আপনি যেরূপ দরের লোক, তাহাতে আপনার সম্মুখে দাঁড়াইয়া কথাবার্ত্তা কহিতে আমার সাহস হয় না, তবে আপনি দয়া করিয়া যদি আমার বিপদের কথা শুনেন, তাহা হইলে আপনার নিকট প্রকাশ করিয়া বলি ও আশা করি, আপনার দ্বারা বিশেষ উপকৃত হইতে পারিব। ঘোষ মহাশয় বলিলেন,—বিপদ! বলুন, বলুন কি বিপদ!! লোককে বিপদ হইতে উদ্ধার করাই হইল মনুষ্য-জীবনের শ্রেষ্ঠকর্ম্ম। বলুন কি হইয়াছে, ত্রই দণ্ডেই তাহার প্রতিকার করিব, চিন্তা কি। যাঁহার বিপদ, তিনি বলিলেন, "দেখুন যাঁহার জমীদারীতে আমি বাস করি, তিনি বিনাদোষে ও অকারণে, আমার বাস উচ্ছেদ করিবার জন্য আমার উপর নোটীশ জারী করিয়াছে। সেই নোটীশ অনুযায়িক সময় আর আট দশদিন মাত্র অবশিষ্ট আছে। অতএব, আপনি যদ্যপি একটু কষ্ট স্বীকার করিয়া, জমীদার বাবুকে দুই একটী কথা, আমার পক্ষ সমর্থন করিয়া বলেন, তাহা হইলে আমার বিশ্বাস যে, আমায় বাসচ্যুত হইতে হয় না। জমীদার হইতেছেন আপনাদের এই পল্লী নিবাসী বিশ্বনাথ মতিলাল। আপনার সঙ্গে নিশ্চয়ই বিশেষরূপ জানা শোনা ও সৌহার্দ্দ আছে সন্দেহ নাই।" ঘোষজ মহাশয় তখন ঈষৎ বিরক্ত ভাবে কহিলেন, জানা শোনা ও সৌহার্দ্দ ওদের সঙ্গে আমার বিলক্ষণই আছে; তবে আপনি যা বলিতেছেন তাহা বোধ হয় হবে না। কারণ আমি বেশ জানি, ও দুটোর একটাও ভাল মানুষ নয়। ও বিশ্বনাথও যেমন মতিলালও তেমনি। দুটোর একটাও যদি একটু ভাল মানুষ হ'তো, তা হলেও না হয় চেষ্টা ক'রে একবার দেখ্‌তুম। যেখানে কথা রক্ষা হবে

না, সেখানে কথা কহিতে নাই, জানেন ত।" বিপন্ন ব্যক্তি এই পর্য্যন্ত শুনিয়াই বলিলেন—"আপনি দুজন কি বলিতেছেন। বিশ্বনাথ মতিলাল যে এক ব্যক্তির নাম, বিশ্বনাথ হইল নাম আর মতিলাল হইল উপাধি, তবে বোধ হয়, আপনি উহাকে চেনেন না।" ঘোষ মহাশয় তখন লজ্জিত হইয়া অধোবদনে প্রস্থান করিলেন। আর ঐ বিপন্ন ব্যক্তিকে লইয়া অপরাপর কয়েকটী ভদ্রলোক উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিতে লাগিলেন।" এখন বিচার করিয়া দেখুন—আমাদের রাধাকৃষ্ণকে জানা আর ঘোষ মহাশয়ের বিশ্বনাথ মতিলালকে চেনা ঠিক্ একই রকমের কিনা।

ঘোষ মহাশয় লেখা পড়া শিখিয়াও, বিদ্যার অভাবে, কেবল আড়ম্বর আস্ফালনেই, বিশ্বনাথ মতিলালকে চিনিতে না পারিয়া যেমন হাস্যাস্পদ ও অপদস্থ হইয়াছেন—রাশি রাশি গ্রন্থ পাঠ করিয়া, পণ্ডিতাভিমানী ব্যক্তিগণও, ভালবাসা বা প্রেমের অভাবে, কেবল পাণ্ডিত্য প্রকাশেই, গ্রন্থ-প্রতিপাদ্য বিশ্বনাথ নন্দলালকে জানিতে না পারিয়া, সেইরূপ পরিহাসাস্পদ ও অপদস্থ হইয়া থাকেন, সন্দেহ নাই। অতএব, লেখাপড়া শিক্ষা ও শাস্ত্র গ্রন্থাদি পাঠ করিবার পূর্ব্ব হইতেই হউক বা তাহার সঙ্গে সঙ্গেই হউক, আমাদের কর্ত্তব্য হইতেছে সকলকেই সমানভাবে ভালবাসিতে শিক্ষা করা। ভালবাসা গাঢ় না হইলে প্রেম হয় না। প্রেমের সহিত গ্রন্থাদি পাঠও ব্যাখ্যা এবং ভগবত গুণানুবাদ শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণাদি না করিলে স্থূল তুষাব-ঘাতীর ন্যায় শ্রম বিফল হয়। ফল কিছু মাত্রও পাওয়া যায় না। মহাত্মা তুলসী দাস বলিয়াছেন,—

> "পুথি পড়ি পড়ি জগমুয়া, পণ্ডিত ভেয়া না কোয়।
> একৈ অক্ষর প্রেমকা পড়ে, সোজন পণ্ডিত হোয়॥"

অর্থাৎ পুথি পড়িতে পড়িতে যুগ যুগান্তর যাপন করিলেও পণ্ডিত হওয়া যায় না; পরন্তু একটী মাত্র অক্ষর পাঠ করিয়াও যাঁহার প্রেমের উদয় হয়, তিনিই প্রকৃত পণ্ডিত। অতএব প্রেমের মূল যে ভালবাসা, সেই ভালবাসা যাহাতে আমরা ভাল করিয়া শিক্ষা করিতে পারি, প্রাণপণে তাহারই চেষ্টা করা, আমাদের সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। ভালবাসা শিক্ষা করিতে না পারিলে, আশা মরীচিকার ন্যায় কুআশার ঘোরে ঘুরিতে ঘুরিতে প্রাণ যায়। ভালবাসাও লাভ হয় না আর ভালবাসাও পাওয়া যায় না। ভাড়াটিয়া বা ঠিকা প্রজার মত কেবল

দুইদিন সেখানে, পাঁচদিন এখানে ও দশদিন ওখানে এই করিয়া ঘুরিতে হয়। নিশ্চিন্ত হইয়া বাস করিতে পাওয়া যায় না।

ভালবাসা এমন একটী স্বতঃসিদ্ধ পদার্থ যে, জন্মগ্রহণ করিলেই আপনা-আপনি জীবের হৃদয়ে আসিয়া উপস্থিত হয়। জীব কিন্তু অবিদ্যায় আচ্ছন্ন হইয়া, ভালবাসার প্রকৃত পাত্র নিরূপণ করিতে না পারায়, অন্ধের ন্যায় ঘুরিতে ঘুরিতে অন্ধকূপে পতিত হয়। আর যদি সাধুসঙ্গ লাভ হয়, তবে সেই সদ্‌গুরুর কৃপায় বা সাধুসঙ্গের মহিমায়, বিদ্যার আলোকে, অবিদ্যার অন্ধকার দূর হয় এবং ভালবাসার পাত্র নিরূপিত হইয়া যায়; অর্থাৎ অজ্ঞান বশতঃ যে দেহকে জীব ভালবাসার পাত্র ভাবিয়া ভালবাসিতে থাকে, সেই দেহকে ভালবাসা যাহার জন্য, জ্ঞানোদয়ে জীব তখন ভালবাসার পাত্র যে দেহাভ্যন্তরস্থ আত্মা, তাহা জানিতে পারে। জানিতে পারিলেই জীব নিম্নগা মায়া হইতে আপনাকে উদ্ধার করিয়া, উর্দ্ধগামী ধারায় পতিত করে ও অবিলম্বেই প্রেমময় ভগবানের সুশীতল পাদপদ্মে আশ্রয় প্রাপ্ত হয়, সন্দেহ নাই।

নিম্নগা মায়া হইতে উর্দ্ধগামী ধারায় উঠিতে হইলে, জীবকে বহু ক্লেশ সহ্য করতঃ বিশেষরূপে বীরত্বের পরিচয় প্রদান করিতে হয়। সহজে উঠিতে পারে না। রাজার সুবিশাল রাজ্য বশে আনিতে ও যোদ্ধার তুমুল যুদ্ধে জয়লাভ করিতে, যেরূপ অসাধারণ বুদ্ধি কৌশল ও প্রভূত বীরত্বের আবশ্যক; নিম্নগা মায়া হইতে মনের প্রবল বেগকে আকর্ষণ করিয়া, উর্দ্ধগামী ধারার সহিত সংযোগ করিয়া দিতে, তদপেক্ষা অধিক বুদ্ধি কৌশল, প্রচুর বল বিক্রম ও অসীম বীরত্বের প্রয়োজন। অর্থাৎ মন যখন মায়ার স্রোতে মিশিয়া ছুটিতে থাকে, তখন মনের বশে চলিলে চলিবে না। মনকে বশে চালাইতে হইবেক। যাঁহারা মনকে বশীভূত করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহাদের বীরত্ব, বুদ্ধি কৌশল ও বল বিক্রম, সুবিশাল রাজ্যবশকারী রাজা ও ভীষণ যুদ্ধে জয়ী যোদ্ধার বুদ্ধি কৌশল, বল বিক্রম, ও বীরত্ব অপেক্ষা অধিক প্রশংসনীয়। মহাত্মা তুলসী দাস বলেন,—

"রাজা করে রাজ্য বশ, যোদ্ধা করে রণজই।
আপনা মনকো বশ্ যো করে সব্‌কো সেরা অই॥"

অতএব মনের বশীভূত না হইয়া, মনকে বশীভূত করিতে পারিলেই, ভালবাসার উর্দ্ধগামী ধারা ধরিতে পারা যায় ও দয়া, ভক্তি এবং প্রেমের যে কি অনির্ব্বচনীয় মহিমা ও অতুলনীয় মাধুরী, তাহা তখন জানিতে ও বুঝিতে পারা যায়। এই

সম্বন্ধে একটী উপন্যাস আছে। কোন কোন মহাত্মা, এইরূপ স্থলে ঐ উপন্যাসটী উদাহরণরূপে ব্যবহার করিয়া থাকেন। উপন্যাসটী স্ত্রীলোকদের কথিত রাজারাণীর উপকথার মত নহে। তত্ত্বকথা বলিলেও বলিতে পারা যায়। যাহা হউক, শুনিবার পূর্ব্বেই উপেক্ষা না করিয়া শুনুন :—

এক নগরে ধীরেশ্বর ও বীরেশ্বর নামে দুইটী সহোদর বাস করিতেন। ধীরেশ্বর জ্যেষ্ঠ এবং বীরেশ্বর কনিষ্ঠ। উভয়েই অর্থাদি উপার্জ্জনক্ষম ও একান্নভুক্তছিলেন। ধীরেশ্বর জ্যেষ্ঠ বলিয়া কনিষ্ঠ বীরেশ্বর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকেই পিতার ন্যায় সম্মান করিতেন এবং উপার্জ্জিত অর্থাদিও তাঁহার হস্তেই প্রদান করিতেন। পৈতৃক সম্পত্তি, উভয়ের উপার্জ্জিত অর্থাদি এবং সংসার সকলই ধীরেশ্বরের কর্ত্তৃত্বাধীনে পরিচালিত ও পরিপালিত হইত। ধীরেশ্বর নিঃসন্তান ছিলেন। বীরেশ্বরের একটী মাত্র পুত্রসন্তান ছিল। ধীরেশ্বরের বয়ঃক্রম যখন ষাট বৎসর, তখন তিনি বীরেশ্বরকে তাঁহার ন্যায্য অর্দ্ধেক সম্পত্তি দানপত্র লিখিয়া দিয়া সস্ত্রীক কাশীবাস করেন। বীরেশ্বর একাকী পূর্ণ সম্পত্তির অধিকারী হইয়া সুখ স্বচ্ছন্দে থাকেন এবং সময়ে সময়ে আবশ্যক মত, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকেও অর্থাদি পাঠাইয়া দেন। বীরেশ্বর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার প্রদত্ত অর্দ্ধেক সম্পত্তি লাভ করিয়া অবধি অতি ধীরভাবে দয়া ও ধর্ম্মের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া এবং আবালবৃদ্ধ-বনিতা সকলকেই সমভাবে সমাদর করিয়া ও ভালবাসিয়া চারি পাঁচ বৎসরের মধ্যেই চতুর্গুণ সম্পত্তি বৃদ্ধি করিয়া ফেলিলেন। স্বতঃপরতঃ উদ্যম ও চেষ্টায়, আট দশ বৎসরের মধ্যেই তাঁহার ঐশ্বর্য্য ও সুখসম্পত্তির আর সীমা রহিল না। এইরূপে ঐশ্বর্য্যশালী হইয়া, ধৈর্য্য সহকারে, বীরেশ্বর পরমানন্দে কালযাপন করিতে লাগিল। অকস্মাৎ একদিন তিনি মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, সুখ যথেষ্টই হইয়াছে, কিন্তু শুনিয়াছি ইহা অপেক্ষাও বহু বহু সুখ আছে, যাহা কখন দেখি নাই বা ভাবিয়াও স্থির করিতে পারি নাই। কথিত আছে তপস্যার অসাধ্য কিছুই নাই। তপস্যায় সিদ্ধ হইতে পারিলে, সেই অচিন্তনীয় ও আশাতীত সুখও লাভ করিতে পারা যায়। অতএব, আমি ভগবান শ্রীহরির তপস্যা করিব এবং যাহাতে সেই অভাবনীয় ও আশাতীত সুখসমূহ এককালে ভোগ করিতে পারি—তপস্যায় শ্রীহরিকে সন্তোষ করিয়া তাহাই করিব। এই অসাধারণ অধ্যবসায় ও দৃঢ়সঙ্কল্পে সঙ্কল্পিত হইয়া পুত্রের প্রতি সমস্ত সম্পত্তি ও সংসারের ভারার্পণ করতঃ বীরেশ্বর বীরত্বের পরিচয় প্রদান করিতে শুভদিনে তপস্যায় যাত্রা করিলেন।

হিমালয়ের নিকটবর্ত্তী কোন এক পর্ব্বতের জনশূন্য কন্দরে আসন করিয়া ঐকান্তিক ভক্তির সহিত অনশনে বীরেশ্বর কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিলেন। অতি অল্পকালের তপস্যাতেই ভগবান শ্রীহরি প্রসন্ন হইলেন ও বরদ-মূর্ত্তিতে বীরেশ্বরের নিকট আবির্ভূত হইয়া কহিলেন, "বৎস বীরেশ্বর! তোমার কঠোর তপস্যায় আমি পরম সন্তোষ লাভ করিয়া তোমায় বরপ্রদান করিতে আসিয়াছি, অভিলাষিত বর গ্রহণ কর।" বীরেশ্বর সম্মুখাগত দয়াময় ভগবান শ্রীহরিকে দর্শন করিয়া কহিলেন, প্রভো! যদ্যপি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে এই বর প্রদান করুন যে, আমি যেন এককালে সমস্ত ঐশ্বর্য্য ভোগ করিতে পারি।

ভগবান কহিলেন, "বৎস বীরেশ্বর! এ তোমার অসম্ভব প্রার্থনা। তুমি যে প্রার্থনা করিতেছ, তাহা ষড়ৈশ্বর্য্যশালী এক ভগবান ভিন্ন কেহই ভোগ করিতে পারে না। যাহা হউক, তোমার তপস্যায় যখন আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি তখন যাহাতে তুমি ক্রমে ক্রমে সকল ঐশ্বর্য্য ভোগ করিতে পার, তাহার উপায় স্বরূপ একটী শান্তশিষ্ট ও অক্লিষ্টকর্ম্মা ভৃত্য আমি তোমায় প্রদান করিতেছি। সেই ভৃত্যটীর অতি আশ্চর্য্য ও অদ্ভুত গুণ এই যে, তাহাকে যখন যাহা করিতে বলিবে, সে তাহাই, অতি অসম্ভব ও দুঃসাধ্য হইলেও, বিনা ওজর আপত্তিতে তদ্দণ্ডেই সাধন করিয়া দিবে। এক মুহূর্ত্তের জন্যও বসিয়া থাকিবে না। কিন্তু তোমাকে সাবধান করিবার জন্য বলিতেছি যে, ভৃত্যটীকে সর্ব্বদাই কার্য্যে নিযুক্ত রাখিবে তাহা হইলেই ভৃত্য তোমার বশে থাকিবে, আর কাজ না দিতে পারিলেই তোমাকে উহার ভৃত্য হইতে হইবেক। তখন ভৃত্য তোমার উপর আধিপত্য ও কর্ত্তৃত্ব বিস্তারপূর্ব্বক সর্ব্বদাই তোমাকে খাটাইয়া খাটাইয়া, ঐশ্বর্য্যহীন, বিপথগামী ও ঘোরতর বিপদগ্রস্ত করিয়া তুলিবে। এখন এই ভৃত্যটী লইয়া যাও এবং অতি সাবধানে, যাহা বলিয়াদিলাম স্মরণ রাখিয়া অভিলষিত ভোগ বাসনাদি, এই ভৃত্যটী দ্বারায় সম্পাদন করাইয়া সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করতঃ সুখ স্বচ্ছন্দে বাস করিতে থাক।" এই বলিয়া ভগবান অন্তর্দ্ধান হইলেন এবং বীরেশ্বরও ভগবদ্দত্ত সেই ভৃত্যটীকে সঙ্গে লইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

তপঃসিদ্ধ বীরেশ্বর গৃহে প্রত্যাগমন করিয়াই ঐ ভৃত্যটী দ্বারায় অতি অলৌকিক ও অদ্ভুত অদ্ভুত কার্য্যসমূহ সম্পাদন করাইতে লাগিলেন। সুখ-সম্পত্তির ইয়ত্তা রহিল না। সুন্দর অট্টালিকা, নন্দন-কাননবৎ মনোহর

উদ্যান, সুদীর্ঘ ও সুস্বাদু জল পরিপূর্ণ, কুমুদ-কহ্লাদ ও হংসকারণ্ডাদি শোভিত দীর্ঘিকা, গোশালা, অশ্বশালা, হস্তিশালা ও বিচিত্র সেনানিবাস প্রভৃতি দেখিলে বোধ হয় দেবরাজ ইন্দ্রের ঐশ্বর্য্যও বীরেশ্বরের ঐশ্বর্য্যের নিকট লজ্জা পায়, কিন্তু হইলে কি হইবে, বীরেশ্বর ভৃত্যকে কখন কোন কার্য্যে নিযুক্ত রাখিবে, এই চিন্তাতেই সতত এত চিন্তিত যে, ঐশ্বর্য্য ভোগ করা দূরে থাক, একবার অবকাশ পান না। ভৃত্যকে কাজ দিতে না পারিলে, ভৃত্যের ভৃত্য ও ঐশ্বর্য্যচ্যুত হইতে হইবেক, এই ভীষণ চিন্তার এবং কখন কোন্ কার্য্যে ভৃত্যকে নিযুক্ত করিবেন, তাহার ভাবনায় বীরেশ্বর আহার নিদ্রা পরিত্যাগ পূর্ব্বক এককালে জীর্ণশীর্ণ হইয়া অর্দ্ধদগ্ধকাষ্ঠবৎ কালিমাচ্ছন্ন কলেবরে একটী অতি নিভৃত অন্ধকার গৃহে অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং সকল কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া কেবল ভৃত্যের কার্য্য নির্দ্ধারণের বন্দোবস্তে সততই আপনাকে নিযুক্ত করিয়া রাখিলেন। এইরূপে বীরেশ্বর অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইয়াও অতিদীনহীনের ন্যায় অতিজীর্ণ শীর্ণও কালিমাচ্ছন্ন কলেবরে মুমূর্ষুবৎ কালাতিপাত করিতে লাগিলেন।

এদিকে বীরেশ্বরের জ্যেষ্ঠভ্রাতা ধীরেশ্বর কনিষ্ঠভ্রাতা বীরেশ্বর তপস্যায় হরিকে সন্তোষ করিয়া মর্ত্তলোকে স্বর্গ-সুখ ভোগ করিতেছে এই সুসংবাদ লোকপরম্পরায় শ্রবণ করিয়া দেখিবার নিমিত্ত একদিন পৈতৃক ভবনোদ্দেশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আসিয়া দেখেন যে, সে পৈতৃক বাসস্থান নাই। তাহার স্থলে বহুমূল্য প্রস্তর বিনির্ম্মিত মনোহর অট্টালিকা। অট্টালিকার দ্বারদেশে উন্মুক্ত তরবারি হস্তে দৃঢ়কায় পাহারা। আর অট্টালিকার চতুঃপার্শ্বে প্রস্তর ও ইষ্টক নির্ম্মিত বিবিধ আকারেরও বিবিধ প্রকারের অতিশয় সুদৃশ্য সেনানিবাস। বহুদূরব্যাপী বিচিত্র উদ্যান ও বিমল সলিল পরিপূর্ণ পঙ্কজ ও দ্বিজগণ শোভিত অতিশয় দীর্ঘ ও প্রশস্ত জলাশয় সমূহ। জলাশয়ের চতুর্দ্দিকে সুচারু কারুকার্য্য মণ্ডিত নয়নানন্দ দায়ক ও চিত্তমুগ্ধকারী বিচিত্র দেবমন্দির সকল স্থাপিত রহিয়াছে। ধীরেশ্বর এই সমস্ত অদ্ভুত ব্যাপার নিরীক্ষণ করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন এবং জনৈক প্রহরীর নিকট আত্মপরিচয় প্রদান করিয়া বীরেশ্বরকে সংবাদ দিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। প্রহরী তাহার প্রভুর নিকট, তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতার আগমন সংবাদ নিবেদন করিলে, বীরেশ্বর সম্মানের সহিত তাঁহাকে প্রবেশ করাইতে আদেশ করিলেন।

ক্রমশঃ

শ্রীভূপতিচরণ বসু।

বাসনা

যে দিন হ'ল তোমায় আমায় প্রথম পরিচয়,
ফেল্‌লে দূরে যে দিন তোমার সকল আবরণ।
সেদিন হ'তে তোমার গুণে আমার পরাজয়,
সেদিন আঁখি হেরিল 'রূপ' বিশ্ববিমোহন ॥

সঙ্গোপনে চুপে চুপে ডাক্‌লে আমায় যবে,
মন ভুলায়ে মোহনরূপে প্রথম আলাপনে।
অসীম কাজের ভীষণ বোঝা ফেলে দিয়ে ভবে,
ছুট্‌ছি আমি তোমার-ই পাশে তোমার আলিঙ্গনে ॥

আমার যত খেলার সাথী খেল্‌ছে কত তারা,
সাধ্য কিযে বাঁধবে মোরে মোহ মায়ার পাশে,
ডাক্ দিয়েছ তাই চলেছি হ'য়ে সঙ্গীহারা,
তোমার দরশ আশে, শুধু তোমার পরশ আশে ॥

এস প্রভো! এস আমার কণ্ঠমণি হার,
যাও কেন আর সরে' সরে' দাও এতই যাতনা।
তোমারি ডাকে তোমারি পাছে ছুট্‌ছি অনিবার,
লওগো মোরে তোমার পাশে এইত বাসনা ॥

শ্রীচুণিলাল চন্দ্র বি-এ।

দীক্ষাগ্রহণের আবশ্যকতা

* * * * * পূর্ব্বে বহুবার আমরা গুরুকরণ সম্বন্ধে অনেক নিবেদন করিয়াছি। গুরুকরণ বলিতে গুরুর স্থানে দীক্ষাগ্রহণ। চলিত কথায় ইহাকে মন্ত্র লওয়া বলে।

দীক্ষাপদ্ধতি প্রকার ভেদে সকল ধর্ম্ম-সম্প্রদায়েই প্রচলিত আছে। বৈদিক যুগে ইহা হিন্দুদের সংস্কারের মধ্যে ছিল। গায়ত্রী দীক্ষাই দ্বিজাতির উপনয়ন সংস্কার। এখন যে হিন্দু সমাজে গুরুকরণ-পদ্ধতি প্রচলিত, উহা তান্ত্রিক যুগের ব্যাপার। হিন্দু-স্মৃতি তন্ত্রবিধিকে আয়ত্ত করিয়া সংস্কারের শীর্ষদেশে স্থান দিয়াছেন।

ফল কথা তান্ত্রিক বৈদিক সকল যুগেই ঋষিরা দীক্ষার আবশ্যকতা মানিয়া লইয়াছেন। স্মৃতিও দীক্ষার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার না করিয়া পারেন নাই। দীক্ষাগ্রহণের কর্ত্তব্যতা সম্বন্ধে শাস্ত্রে বহুল প্রমাণ পাওয়া গিয়া থাকে। সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে যাহা বিধিসঙ্গত বলিয়া মীমাংসিত, সে বিষয়ে কাহারও ইতস্ততঃ করা উচিত নহে। হিন্দু হইতে হইলে, উপনয়ন, উদ্বাহের মত দীক্ষাগ্রহণও নরনারীর অবশ্যকর্ত্তব্য জানিতে হইবে।

আমাদের দেশে বাবুর দলে এখন অনেকেরই এই দীক্ষা গ্রহণে ঔদাস্য দেখা গিয়া থাকে। উকীল, ডাক্তার, মোক্তারের ভিতর অনেক বাবুই মন্ত্র লওয়াটা বাজে কাজ মনে করেন। থান কতক ইংরাজী কেতাব, আর রামায়ণ, গীতা, মহাভারতের এখানে সেখানে এক একবার চক্ষু বুলাইয়া তাঁহারা তাঁহাদের ধর্ম্মশিক্ষা পর্য্যাপ্ত বোধ করিয়া থাকেন। এই সকল ধর্ম্মপুস্তকের শ্বেতাঙ্গ-অনুবাদকেরা যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাই তাঁহাদের শিরোধার্য্য। দেশের মহা-মহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণের কথাও বাবুদের কাছে শ্রোতব্য নহে। তাহা না হইলে হিন্দু সমাজে আজ এত উচ্ছৃঙ্খলতা ঘটিবে কেন?

হিন্দুকে হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিতে হইলে, ধর্ম্মসাধন বিনা উপায় নাই। হিন্দু ধর্ম্মপ্রধান জাতি, অশনে বসনে স্বপনে হিন্দুর ধর্ম্মভাব মাখামাখি। তেজঃশূন্য অগ্নি যেমন ভস্মরাশি, ধর্ম্মশূন্য হিন্দু তেমনই গজভুক্ত কপিত্থ বিশেষ। ধর্ম্মই হিন্দুর সর্ব্বস্ব, ধর্ম্মই হিন্দুর জাতীয় সৌধের প্রস্তরভিত্তি। দীক্ষাগ্রহণই এই ধর্ম্মানুষ্ঠানের শুভ আরম্ভ। অতএব ইহার উপযোগিতা ও আবশ্যকতা সম্বন্ধে বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ ব্যক্তিদের বেশী বলা নিষ্প্রয়োজন। গুরুবিমুখী অনেকে এখন ভগবত্তত্ত্ব অজ্ঞেয় বলিয়াই পিছাইয়াছেন। একজন ঈশ্বর আছেন, এই পর্য্যন্তই ইহাদের অভিসন্ধি। হায় এইরূপ না হইলে, এত দিনের প্রাচীন হিন্দুজাতি এখন এমন আত্মমর্য্যাদায় জলাঞ্জলি দিতে বসিয়াছে! এ সকলই কালের মাহাত্ম্য—কলির প্রভাব।

পাশ্চাত্য শিক্ষার সূচনায় অনেকেই ধর্ম্মের বক্ষে আঘাত দিয়া জাতিনাশ

করিবার উপক্রম করিয়াছিলেন। কেহ খ্রীষ্টান, কেহ ব্রাহ্ম, কেহ আর্য্যসমাজী হইয়া হিন্দুধর্ম্মের মূলসূত্র ছিন্নভিন্ন করিতে উদ্যম করেন! বৌদ্ধ আমলে সনাতন ধর্ম্মে যেরূপ একটা দারুণ ধাক্কা লাগিয়াছিল, অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে ততটা না হউক একটা প্রচণ্ড বেগে হিন্দুধর্ম্মটাকে উলট পালট করিবার উদ্‌যোগ চলিয়াছিল। কিন্তু হিন্দুধর্ম্ম সনাতন, ইহার রক্ষক স্বয়ং ভগবান; এজন্য এখন সেই বেগ অন্তর্মুখী হইয়াছে। এখন তাই বিলাত প্রত্যাগত ভ্রষ্টাচারীরাও প্রায়শ্চিত্ত করিয়া স্বধর্ম্মের পদতলে আশ্রয় লইতে, হীনতা দীনতা স্বীকার করিতেছেন। এই সব উন্মার্গীর দ্বারা সন্মার্গীর গৌরব বৃদ্ধি করাই বিশ্বন্তরের অভিপ্রায়। যিনি অমাবস্যার অন্ধকার সৃষ্টি করিয়া রজতশুভ্র চন্দ্রিকার গৌরব বৃদ্ধি করেন, তিনি ভিন্ন অপধর্ম্মের অপসারণ ও প্রকৃত ধর্ম্মের অভ্যুদয় অন্যে কে ঘটাইতে পারে?

এখন অনেকের হিন্দুধর্ম্মের প্রতি আগ্রহ যত্ন দেখিয়াই আমরা দীক্ষাগ্রহণের প্রসঙ্গ উত্থাপিত করিয়াছি। হিন্দুর সম্প্রদায়-পঞ্চকের মধ্যে বৈষ্ণব ধর্ম্মই সর্ব্বোত্তম ও পরমোদার। আচণ্ডালের পক্ষে ইহার দ্বার উন্মুক্ত দেখিয়া অনেকেই এই দিকে ছুটিয়াছেন। কিন্তু এই সব ধাবমান ব্যক্তিদের স্মরণ রাখা উচিত যে, বৈষ্ণবধর্ম্ম অবৈদিক বা অহিন্দু ধর্ম্ম নহে। এই কল্পতরুর ছায়াতলে বসিয়া বাঞ্ছাপূর্ণ করিতে হইলে, বৈষ্ণব-গুরুর কাছে শিক্ষা ও দীক্ষা-গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। শ্রদ্ধাসহকারে উপদেশ লইলে, তাঁহার স্বভাব চরিত্র বৈষ্ণবোচিত না হইয়া পারে না। অহঙ্কার গর্ব্ব পরিত্যাগ করিয়া দীক্ষিত হইয়া দেখ, বৈষ্ণব গুরুদের উপদেশগুলি কত ফলপ্রদ। একবার ভক্তিভরে আপনহারা হইয়া দীক্ষাগ্রহণ করিয়া দেখ দেখি—সেই কৃপাময় তোমার প্রাণে শান্তিধারা ঢালিয়া দেন কি না!

অদ্বয় জ্ঞানের নামই তত্ত্ব। দীক্ষাগ্রহণ না করিলে, সেই অদ্বয় জ্ঞান লাভের দ্বিতীয় পথ নাই। গুরু দীক্ষা দিয়া তোমার যে ইষ্টমূর্ত্তির পরিচয় দিয়া দেন, তাহাতেই ক্রমশঃ সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন তত্ত্ব বিকশিত হয়। সাধন-পথে প্রবৃত্ত হইতে গেলেই অগ্রে গুরুকরণ, তৎপরে ভক্ত-সঙ্গ, ভক্তের কৃপায় ভক্তির উদয় এবং ভগবানের সাক্ষাৎকার। তারপর না তাঁহার অবতার ও শক্তিত্রয় জ্ঞান হইয়া থাকে? গুরুকরণ না করিয়া ধর্ম্মাচরণ করিতে গেলে "শিরোনাস্তি শিরঃপীড়া" হইয়া পড়ে। প্রকৃত প্রস্তাবে গৌড়ীয়-বৈষ্ণব ধর্ম্মের জন্য কাহারও প্রাণ কাঁদিয়া থাকিলে, তিনি অবিলম্বে যোগ্য গুরুর কাছে দীক্ষা গ্রহণ

করুন। দীক্ষাগ্রহণ না করিয়াধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা বা প্রবন্ধ লিখিলে, সম্প্রদায়ের অনিষ্ট ব্যতীত ইষ্ট নাই। কারণ অদীক্ষিত ব্যক্তির তত্ত্বজ্ঞান নাথাকায় তাঁহার রচনা সম্প্রদায়ে উচ্ছৃঙ্খলতা আনায়ন করিবেই করিবে। যিনি স্বয়ং অন্ধ, তিনি অপরকে পথ দেখাইতে গেলে পতন অবশ্যম্ভাবী। শাস্ত্রে তাই শত সহস্র স্থানে দীক্ষাগ্রহণের আবশ্যকতা পুনঃপুনঃ কীর্ত্তিত হইয়াছে।

(পল্লীবাসী)

দীক্ষা-গ্রহণ

আমরা পুনঃ পুনঃ দীক্ষা-গ্রহণের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিতেছি, কেহ যেন মনে না করেন, ইহাতে আমাদের কোন স্বার্থ আছে। আমরা গুরুব্যবসায়ী নহি। শিষ্য জুটাইবার আমাদের কোন চেষ্টা নাই। যাহা না হইলে সাধন ভজন সব পণ্ড, সে কথাটা অবশ্যই বলিতে হয়। দীক্ষাগুরুর নিতান্ত প্রয়োজন বলিয়াই সম্প্রদায়গুলি ক্রমে এমন গুরু-মুখী হইয়া পড়িয়াছে।

শাস্ত্রে উপদেশের অভাব নাই। গুরুর কাছে দীক্ষা না লইয়া, সে গুলির আলোচনা করিলে, তত্ত্বে পৌছিতে গোল বাধে। প্রয়োজন, অভিধেয় ও সম্বন্ধ জ্ঞান না হইলে শাস্ত্রোপদেশ কাজে লাগে না। বিবিধ তত্ত্বে বুদ্ধি বিক্ষিপ্ত হইয়া শেষকালে বুদ্ধিহারা হইতে হয়। আমার চাই কি, আমার ধারণা করিতে হইবে কি এবং সেই সকলের সঙ্গে সম্পর্ক কি, না জানিলে অনন্ত-শাস্ত্রের কুল পাইবার উপায় নাই।

একে ত আমাদের দেশে ধর্ম্মশিক্ষা উঠিয়া গিয়াছে বলিলেই হয়। সে কালের মত শিশুকাল হইতে পিতা মাতারা তনয়গুলির ধর্ম্মোন্নতির দিকে তাকান না। কষ্টেসৃষ্টে অর্থকরী বিদ্যাটার একটু যোগ্য করিয়া তুলিবার জন্য যাহা কিছু যত্ন করেন। স্কুল কলেজে যে সকল পাঠ্য পুস্তক নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহাতে হিন্দুধর্ম্মের নামগন্ধও নাই। তাই বি-এ, এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াও হিন্দু যুবকেরা ধর্ম্মবিষয়ে চিরজীবন অজ্ঞ থাকিয়া যান।

গতবারে শ্রীধাম বৃন্দাবনে এক এম, এ উপাধিধারী বৈষ্ণবের দর্শন পাইয়াছিলাম। তিনি এ দেশে কোন সন্ন্যাসীর কাছে দীক্ষা লইয়া ব্রজে গিয়া বাস করিয়াছেন। কালীয়দহবাসী গোলোকগত জগদীশ দাস বাবাজী মহারাজকে

তিনি দীক্ষাগুরু পদে বরণ করিয়াছিলেন। তাঁহারই কৃপায় এম, এ উপাধি-ধারী বাবুটী এখন অধিকারী বৈষ্ণব হইয়াছেন। সদালাপ কালে কথায় কথায় ইনি দরবিগলিত নেত্রে কহিয়াছিলেন, মহাশয় বি, এ, এম, এ পড়িতে গিয়া আমি বৃথা কালক্ষেপ করিয়াছি। ঐ সকলে আমার ধর্ম্মের বর্ণ পরিচয় পর্য্যন্ত হয় নাই। তবে ঐ সকলে বুদ্ধিটার যে যৎকিঞ্চিৎ মার্জ্জনা হইয়াছিল, তাহাতে তত্ত্বাবগতির অনেকটা আনুকূল্য হইয়াছে মাত্র।

সম্প্রদায়নিষ্ঠ গুরুর কাছে শিক্ষাদীক্ষা ব্যতীত শুদ্ধ কলেজী শিক্ষায় যে আমাদের সনাতন ধর্ম্ম যাজনের সুবিধা হয় না, এ কথা দেশের অবস্থা দেখিয়াই অনায়াসে বুঝা যাইতে পারে। যে দিন হইতে দেশবাসী নিজেদের আত্মীয় স্বজনগুলিকে ধর্ম্মশূন্য শিক্ষা-মন্দিরে সমর্পণ করিয়াছেন, সেই দিন হইতেই দেশে অনাচার উপধর্ম্মের উৎপত্তি। এখনও আমাদের্ দেশের পণ্ডিতেরা কলেজী শিক্ষিত বাবুদের বিদ্বান্ বলিতে রাজী নহেন। এখনও তাঁহাদিগকে তাঁহারা পণ্ডিত বলিয়া সম্বোধন করেন না। যে বিদ্যায় তত্ত্ব সন্ধান নাই, ধর্ম্ম-প্রাণ আর্য্যসন্তান তাহাকে বিদ্যা না বলিয়া অবিদ্যা বলিয়া ধারণা করেন। তবে যাই দেশের দুই দশ জন উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া আর্য্যধর্ম্মের মহিমা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন, তাই রক্ষা। স্বর্গীয় ভূদেব বাবুর মত ব্যক্তিরা আর্য্য-ধর্ম্মের গৌরব-শঙ্খ নিনাদিত না করিলে, না জানি দেশে এত দিন আরও কত কি কাণ্ড হইয়া যাইত।

ধর্ম্মশূন্য শিক্ষায় যুবকদের মস্তিস্ক বিকৃতভাবাপন্ন হইয়া পড়ে। সেই অবস্থায় তাঁহারা মুদ্রিত ধর্ম্মগ্রন্থ নিজে নিজে পাঠ করিলে সেগুলি তাঁহারা বিকৃত ভাবেই আয়ত্ত করিয়া বসেন। এইরূপ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণেই সনাতন ধর্ম্মের গূঢ়রহস্য ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে। আজ বাজারে এখন ধর্ম্মপুস্তকের ছড়াছড়ি। এক গীতারই এখন বোধ হয়, পঞ্চাশ রকম সংস্করণ। অবশ্য ইহার ভিতর যে দুই চারি খানি খাটি জিনিষ নাই তাহা নহে। কিন্তু সেই শত নকলের ভিতর হইতে আসল কসিয়া বাহির করিয়া দেয় কে? কোন খানি প্রকৃত কোনখানি বিকৃত, সে মীমাংসা কাহায় কাছে পাওয়া যায়? পক্ষান্তরে বিকৃতভাবাপন্ন যুবকদের বিকৃত ব্যাখ্যাগুলি বেশ রুচিকর হওয়ায়, দেশ লণ্ডভণ্ড হইবার উপক্রম হইয়াছে। প্রায় ষাট বৎসর হইতে দেশে এই দুর্দ্দিনের সূত্রপাত। তখন হইতে রোগ ধরিতে পারিলে, এখন ঔষধের জন্য এত দৌড়া-দৌড়ি করিতে হইত না। এখনও ধাত-ছাড়া হয় নাই, ভালরূপ চিকিৎসা

হইলে, বাঁচিয়া যাইবার খুবই আশা। সনাতন আর্য্যধর্ম্ম এই অল্পকালের ধাক্কায় চিরকাল আত্মরক্ষা করিয়া আসিয়াছে।

যতই বিদ্বান্ হও, যতই উচ্চ উপাধি লাভ কর, প্রকৃত হিন্দু বা প্রকৃত বৈষ্ণব হইতে হইলে, শাস্ত্রের আদেশমত দীক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে। দীক্ষা না হইলে যত বড় হওনা কেন, প্রকৃত হিন্দু তোমায় হিন্দু বলিয়া গণনা করিবে না। তবে দীক্ষাটা দেখিয়া শুনিয়া লওয়া দরকার। গুরুর মত গুরু না হইলে, তোমার ভক্তি হইবে না। তুমি বিদ্বান্, বুদ্ধিমান্ জড়ীয় ব্যাপারে প্রভুত জ্ঞানী, তোমার পক্ষে চৈতন্যতত্ত্ববিদের প্রয়োজন। সেরূপ গুরু দুর্ল্লভ দুষ্প্রাপ্য বটে। কিন্তু তোমরা অনুসন্ধান করিলে, হতাশ হইবে না। ভগবানের প্রিয় লীলাস্থল ধর্ম্মক্ষেত্র ভারতে গুরুর অভাব নাই। তুমি শ্রদ্ধাসহকারে একবার ব্যাকুল ভাবে তাকাও দেখি, নিশ্চয়ই উপযুক্ত গুরুর দর্শন পাইবে। তর্কের তপ্ত ইক্ষুচর্ব্বণে তোমার রসনা দগ্ধ হইয়া গিয়াছে, তুমি একটু শান্ত হও। গুরু পদাশ্রয় করিয়া দেখ, তুমি যে শাস্ত্র যে দৃষ্টিতে দেখিতেছ, সেই শাস্ত্রই তখন তোমার কত মধুর হইতে মধুরতর লাগে।

(পল্লীবাসী)

কে তুমি জননী

সৃষ্টি মূল তত্ত্ব, স্বরূপ শকতি
পরমোজ্জ্বল বরণা,
মায়াময়ী শ্যামা রূপেতে জগতে
অনন্ত ভাবের ঝরণা।
পরমা বৈষ্ণবী, ষড়ৈশ্বর্য্যময়ী,
মায়ার অতীতে বসিয়া,
হ্লাদিনী, জননী, হাস্যময়ী, মরি,
আপনার লীলা দেখিয়া।
ঘোরা, দিগম্বরা, অট্ট হাসে ধরা
কম্পিত করি শ্মশানে,
ভয়ঙ্করা রূপে শিব দলি পদে,
অশিব দলিয়া কৃপাণে।

শৌর্য্য বীর্য্য-বিদ্যা　　ঋদ্ধি সিদ্ধি প্রসূ,
আমরি,—গণেশ জননী ;
মাতঙ্গী, বগলা,　　কভু বা কমলা,
ষোড়শী ভুবন-মোহিনী ।
পরা ও অপরা　　অবিদ্যা রূপেতে
ত্রিধা কীর্ত্তিতা পুরাণে ;
সন্ধিনী, সম্বিতা,　　নিত্য জ্ঞানরূপা,
সদা সুখময়ী স্মরণে ।
প্রণমি মাতুল চরণে ॥

শ্রীরবীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ।

ভালবাসা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

ধীরেশ্বর সসম্মানে নীত হইয়া, যখন কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিরেশ্বরকে দেখিলেন, তখন তাঁহার দুঃখের সীমা রহিল না। সত্বর সমাগম-সময়োচিত বাক্যালাপ ও ঐশ্বর্য্য সম্বন্ধীয় কথোপকথন অতি সংক্ষেপে শেষ করিয়া কহিলেন,—ভাই! অচিন্তনীয় ও অভাবনীয় এই অনুপম ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর হইয়া কি দুঃখে জীর্ণ শীর্ণ ও মলিন দেহে এই নিভৃত অন্ধকার গৃহে একাকী বাস করিতেছ? যদি বলিবার কোন বাধা না থাকে, তবে সত্বর প্রকাশ করিয়া আমার কৌতূহল নিবারণ কর। বীরেশ্বর কহিলেন, দাদা! সে দুঃখের কথা আর আপনাকে কি বলিব, দয়াময় ভগবান্ দয়া করিয়া ভৃত্যটী দিয়াছেন সত্য, কিন্তু ভৃত্যটীকে সর্ব্বদাই কাজে ব্যস্ত রাখিতে না পারিলে, আমাকে ভৃত্যের ভৃত্য ও ঐশ্বর্য্যবিহীন হইতে হইবে, নিরন্তর এই চিন্তাই আমার সকল দুঃখের মূল কারণ। ভৃত্যটীকে যত অসম্ভব ও দুঃসাধ্য এমন কি অসাধ্য কার্য্য করিতে দিলেও সে তৎক্ষণাৎ তাহা সম্পাদন করে; সুতরাং সে কার্য্যের পর যে কি কার্য্য করিতে দিব তাহা ভাবিবারও সময় পাই না। ঐশ্বর্য্য হইয়াছে কেবল শুনিতে পাই মাত্র, একবার দেখিবার অবকাশও ভৃত্যটীর জন্য পাই না। ধীরেশ্বর, ধীর ধীশক্তি ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব বলে কনিষ্ঠ ভ্রাতা বীরেশ্বরের দুঃখ মোচনের উপায় নিরূপণ

করিয়া কহিলেন "আচ্ছা আমি তোমার ভৃত্যের কার্য্যের বন্দোবস্ত তোমায় বলিয়া দিতেছি, তুমি তদনুযায়ী তোমার ভৃত্যকে কার্য্যে নিযুক্ত কর, তোমার দুঃখের অবসান ও সুখ-ভোগের অবকাশ হইবে। ভৃত্যটী এবার আসিলে তাহাকে বল যে, একশত আটটী পর্ব্ব বিশিষ্ট একটী বংশ খণ্ড আনিয়া সেইটি, এই প্রাঙ্গণে প্রোথিত বা বন্ধনাদি না করিয়া, সংস্রব শূন্য ভাবে দাঁড় করাইয়া রাখুক। দাঁড় করান হইলে পর যতক্ষণ তুমি অন্য কার্য্যে ব্যস্ত থাকিবে, ততক্ষণ তোমার ভৃত্যকে ক্রমাগত এই বংশের উপর উঠিতে ও নামিতে বল। পরে যখন তোমার অবকাশ হইবে ও ভৃত্যকে অন্য কোন কার্য্যাদির আবশ্যক বিবেচনা করিবে, তখন সেই কার্য্যে ভৃত্যকে নিযুক্ত করিবে, আবার কার্য্য শেষ হইলে, ঐরূপ ঐ বংশে ক্রমাগত উঠিত ও নামিতে বলিবে।

জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতার উপদেশ অনুসারে বীরেশ্বর তাহাই করিতে লাগিল এবং ক্রমশঃ ভৃত্যকে সাংসারিক কার্য্যে নির্লিপ্ত রাখিয়া ভ্রাতার উপদেশ মত কার্য্যে লিপ্ত রাখিয়া দয়া ও ভক্তির ধারা অবলম্বন পূর্ব্বক চলিতে চলিতে অবশেষে প্রেমানন্দে ডুবিয়া এককালে সকল ঐশ্বর্য্য ভোগ করিতে লাগিল। বীরেশ্বরের দুঃখ ও দুঃখজনিত জীর্ণ শীর্ণতা ইতি পূর্ব্বেই দূরীভূত হওয়ায়, সে পূর্ব্বাপেক্ষা সবল ও সুস্থকায় হইয়া অপরূপ রূপ লাবণ্যে বিভূষিত হইয়াছিল। ধীরেশ্বরও কিছুদিন তথায় বাস করিয়া পুনরায় স্বধাম ৺কাশীধামে গমন করিয়াছিলেন।

এই উপন্যাসটীর গূঢ় তাৎপর্য্য বা তত্ত্ব কথা হইতেছে এই যে, জীব বহু কষ্টে অতি কঠোর তপস্যাদি করিয়া যখন সুদুর্লভ মনুষ্যজন্ম লাভ করেন, তখন ভগবান জীবের তপস্যাদিতে সন্তুষ্ট হইয়া পরম সুখে রাখিবার জন্য অতি অক্লিষ্টকর্ম্মা ও বশতাপন্ন একটী ভৃত্য অর্থাৎ মনকে মনুষ্যের জন্ম গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই দিয়া থাকেন এবং ভৃত্যের সঙ্গে কি প্রকার ব্যবহার করিতে হইবে, তাহাও বিশেষ করিয়া বলিয়াদেন। পরন্তু জীব সংসারে আসিয়াই সেই ভগবদ্দত্ত ভৃত্য ও ভগবানের কথিত সতর্ক বাক্য সকলই বিস্মৃত হইয়া এই মনকে বশে রাখিতে না পারিয়া মনের বশে ভালবাসার নিম্নগা স্রোতে আকৃষ্ট হইয়া কোন সুখই পায় না। দুঃখ ও কষ্টে জীর্ণ-শীর্ণ ও বিবর্ণ হইয়া বিনাশ প্রাপ্ত হয়। ধীরেশ্বরের ন্যায় সদ্‌গুরুর কৃপা হইলে মানুষ মনকে বশে রাখিতে সমর্থ হয়, অর্থাৎ মনের দ্বারায় বীরেশ্বরের ন্যায়, গুরুর উপদেশ অনুসার, সাংসারিক

সকল কার্য্যও সম্পাদন করাইয়া লয় ও সাংসারিক কার্য্যের অবকাশ পাইলে অষ্টোত্তর শত জপ মালায় মনকে নিযুক্ত রাখিয়া (একশত আটটী পর্ব্ব বিশিষ্ট বংশে ওঠা নামার ন্যায়) পারমার্থিক কার্য্য ও ভগবানে ভালবাসা লাভ করিতে সমর্থ হয়। অতএব মনকে বশে রাখাই হইতেছে মনুষ্য জীবনের একটী প্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম। কারণ মন বশে থাকিলে, ভালবাসার নিম্নগা ধারা মায়া ও উর্দ্ধগা ধারা দয়া, ভক্তি, প্রেম সকল ধারা ধরিয়াই জীব ইচ্ছামত বিচরণ করিতে পারে ও পরম সুখে স্বচ্ছন্দে মনুষ্য-জীবন যাপন করিয়া অন্তে ভগবানের পাদপদ্মে আশ্রয় প্রাপ্ত হয়, সন্দেহ নাই।

শ্রীভূপতিচরণ বসু

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবতার

(২)

আমরা পুনঃ পুনঃই বলিতেছি যে, তর্ক দ্বারা বিষয় নির্দ্দেশ কঠিন "নৈষা তর্কেণ মতিরাপনীয়া প্রকৃতই তাই।" বিশ্বাসে মিলায় বস্তু তর্কে বহু দূর" এই অমোঘ বাক্য ভুলিয়া বৃথাতর্ক দ্বারা "হাঁ কে না করা ও নাকে হাঁ করা" মূর্খতার পরিচায়ক। যাক্ আমরা আর তর্ক তুলিয়া বক্তব্য বিষয়ের বিস্তৃতি আনিতে চাই না।

শ্রীগৌরাঙ্গ ভগবানই হউন আর ভক্তই হউন তিনি যে অবশ্য ভজনীয় তাহা তাঁহার জীবনচরিত আলোচনা করিলেই বেশ বুঝিতে পারা যায়।— গৌরাঙ্গ শুধু বৈষ্ণবের নয়, তিনি শৌর, শাক্ত, শৈব, গাণপত্য প্রভৃতি সকল উপাসকেরই উপাস্য। সমগ্র হিন্দু জাতি—শুধু হিন্দুজাতিকেন সমগ্র মানব জাতি শ্রীমন্মহাপ্রভুকে কোন না কোনও কারণে ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি দিতে বাধ্য। শ্রীগৌরাঙ্গ আমার প্রেমিকের প্রাণ, পাষণ্ডের ত্রাণ, ভক্তের জীবন, অভক্তের পাবন, সাধুর আনন্দ আবার পাপীর আশা ভরসাস্থল; এককথায় কবির সুরে সুর মিলাইয়া বলিতে হয়—

"গোরার তুলনা গোরা অতুল ভূতলে।
জাহ্নবী পূজন যথা জাহ্নবীর জলে॥"

তার্কিক! এ সকল শুনিয়া অমনি তোমার নাসিকা কুঞ্চিত হইল কেন? তোমার আমার অপেক্ষা শত সহস্র গুণে শ্রেষ্ঠ, তৎকালিক ভারতের সর্ব্বপ্রধান তীর্থদ্বয় শ্রীপুরুষোত্তম ও ৺কাশীধামের পণ্ডিত শিরোমণি শ্রীবাসুদেব সার্ব্বভৌম ও শ্রীপ্রকাশানন্দ সরস্বতী উভয়েরই সুস্পষ্ট সাক্ষ্য দিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের ভগবত্তা প্রতিপাদক শাস্ত্রসমূহ প্রকাশ করিয়াছেন, উদ্ধতস্বভাব ত্যাগ করিয়া করুণাবতার পতিতের বন্ধু অগতির গতি দাতা শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের সর্ব্ব দুঃখহারী বিরিঞ্চিবাঞ্ছিত চরণকমলে আশ্রয় লও, তাঁহার কৃপায় শ্রীগৌরাঙ্গ লীলার মহামহীয়সী ভাব লাভে ধন্য কৃত-কৃতার্থ হইয়া যাইবে। তুমি যদি বৃথা তর্ক ভুলিয়া বিশ্বাস না কর তবে আমাদের শত প্রবন্ধে বা বক্তৃতায় কিছুই হইবে না। বিশ্বাস কর, শ্রীগৌরাঙ্গলীলারস মধু পানে ধন্য হও।

"অদ্যাপিও সেই লীলা করে গৌর রায়।
কোন কোন ভাগ্যবান্ দেখিবারে পায়॥"

অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়া, বন্ধুপরিজনপরিবৃত থাকিলে এ ভাগ্যবান্ হওয়া যায় না। এ ভাগ্যবান্ বলিতে ভগবদ্বিশ্বাসী, ভক্তিমান্ প্রেমিককেই বুঝাইবে, তা সে অট্টালিকাতেই থাকুক আর পর্ণকুটীরেই থাকুক। তাই পুনঃ পুনঃ বলি কপটতা ছাড়িয়া সরলপ্রাণে শ্রীগৌরলীলারসনিমগ্ন ভাগ্যবান্ ভক্তের শরণাপন্ন হও, দেখিবে তোমার হৃদয়ের যাবতীয় অসদ্ভাব দূর হইয়া যাইবে তুমি পূর্ণকাম হইয়া পরমানন্দে থাকিবে।

যোগ্যপাত্রে ঈশ্বরাবতারত্ব অশাস্ত্রীয় বা অসঙ্গত নয়। আর এক কথা—বাঙ্গালী জাতি কি এমনই অভিশপ্ত যে, এ জাতিতে ঈশ্বরের অবতার হইতে নাই? হিন্দুর দর্শন, বিজ্ঞান কি একেবারে ঠিক করিয়া রাখিয়াছেন যে, বাঙ্গালীর ছেলে হইয়া—বাঙ্গালীর মত আকৃতি প্রকৃতি লইয়া শ্রীভগবান্ কখনও আসিবেন না? হায়! হায়! পূর্ণব্রহ্ম স্বয়ং ভগবানকে আমাদের মধ্যে অনন্ত আত্মারূপে পাইয়াও বিদেশীর বিকট উপদেশে তাহাকে পর করিয়া দিতেছি, ভাই! ইহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি হইতে পারে?

আর না, যাহা হইবার হইয়াছে আর প্রলোভনে পড়িয়া আত্মপ্রতারিত হইও না এমন অমূল্যরত্ন দূরে ফেলিয়া শূন্যঅঞ্চলে গ্রন্থি দিয়া আর ঠকিও না, মোহবশে অধর সংলগ্ন সরসসুধাপাত্র দূরে ফেলিয়া কুটিল কালকূট ভক্ষণে জীবনকে নষ্ট করিও না। ঐ শুন তোমাদের সৌভাগ্য কীর্ত্তন করিয়া কবি উচ্চৈঃস্বরে বলিতেছেন—

জান না বাঙ্গালি ! তুমি কত ভাগ্যবান,
উদিত তোমারি ঘরে স্বয়ং ভগবান।
তোমারি বাঙ্গালীরূপে, তোমারি ধরণে,
তোমারি মতন ধুতি চাদর পরণে।
শ্রীঅঙ্গে তোমারি মত কোঁচার বাহার,
শ্রীপদে তোমারি মত চটী ব্যবহার !
শ্রীমুখে বাঙ্গালী-বুলি তোমারি মতন ;
ভাব-ভঙ্গি তোমারি—তোমারি আচরণ-
তোমারি মতন ঠিক তেলে জলে নেয়ে
তোমারি মতন ঠিক শাক ভাত খেয়ে,
বিকাশি বাঙ্গালী-রূপ—বাঙ্গালী শ্রীছাঁদ
ধরিলা বাঙ্গালী নাম শ্রীগৌরাঙ্গচাঁদ !

২

এ হ'তে বাঙ্গালি ! তব সৌভাগ্য কি আর
তব নবদ্বীপে সপ্তদ্বীপার উদ্ধার !
তোমারি "স্বজাতি"নরজাতি ত্রাণকারী,
জন্মিলা তোমারি কুলে অকুল কাণ্ডারী
ধন্য ধন্য বাঙ্গলার পুণ্য পুরস্কার,
বিরিঞ্চি-বাঞ্ছিত নিধি বঙ্গের কুমার !
দেখুক ভুবনবাসী ভক্তি আঁখি মেলে,
দেবের দুর্ল্লভ ধন বাঙ্গালীর ছেলে।
বাঙ্গালায় জগতের শুভ-আশীর্ব্বাদ
বাঙ্গালী "জগন্নাথের"-ঘরে জগন্নাথ !
দেখে আসি ভালবাসি যদি ভাগ্য খোলে
যশোদা-দুলাল দোলে শচীমা'র কোলে !

৩

সত্য-ত্রেতা-দ্বাপরের যোগীন্দ্র জীবন,
কলিতে বাঙ্গালিনীর যাদু-বাছাধন !
যুগ তপস্যায় যোগী যে পায় না পায়,
শচীমা সে রাঙ্গাপায় হলুদ মাখায় !
নাহেন নদীয়া গঙ্গা-নীরে গোরারায়,
নিজ পদোদক দেন নিজেই মাথায় !
কমলা-কোলে যে পদ কমল-সুন্দর,
সে পদ এ নদীয়ায় ধূলায় ধূসর।
কালো বাঙ্গালীর কোলে গৌরাঙ্গ সুন্দর
কলিতে শ্রীরাধাকান্ত রাধা-কান্তিধর !
গহন মোহন গৌরলীলা-তত্ত্ব-বোধ,—
প্যারীর পরম-প্রেম-ঋণ-পরিশোধ।

৪

কলিতে স্বল্পায়ু নর, অল্পবুদ্ধি-বল,
তাইসে অল্পেতে হয় সাধন সফল।
অনায়াসে অল্পকালে সিদ্ধির বিধান—
করুণায় করিলেন করুণানিধান।
বিশেষ অশেষ-কৃপা-কৌমুদী বিতরি,
গৌরচন্দ্ররূপে বঙ্গে অবতীর্ণ হরি !
হরিনাম —হরিনাম—হরিনাম সার,
নাই নাই নাই গতি কলিকালে আর।
গোলকবিহারি হরি গৌরহরি সেজে,
দিলা হেন হরিনাম আচণ্ডালে যেচে।
নিতাই-অদ্বৈত সঙ্গে নিত্য নবরঙ্গে,
ভাসাইলা বঙ্গ হরি-প্রেমের তরঙ্গে !

৫

বহু তপস্যায় যায় জনম-মরণ,
দু-অক্ষরে কলিতে এ দুয়েরি হরণ !
সেই দু-অক্ষর শুধু "হরি" নাম-ধ্বনি,—
বিলাইলা বাঙ্গালার গৌর-গুণমণি।
দুর্ল্লভ হরিনামের সুলভ সাধন,
শিখিলা বাঙ্গালা হতে জগতের জন !
বাঙ্গালীর শিষ্য হল সর্ব্বদেশী লোক ;
বঙ্গ-ঋণে বদ্ধ হল সমগ্র ভূলোক !

এক গৌর-রূপে—আর এক হরিবোলে
আদরে বসিল বঙ্গ বসুধার কোলে!
সে বঙ্গের কোলে বসি বঙ্গ সুতগণ!
জাগাও শ্রীহরি-ধ্বনি—জাগাও ভুবন!

৬

তুচ্ছ ক্ষুদ্র বঙ্গদেশ প্রান্তে পৃথিবীর,
প্রেমলীলা ক্ষেত্র হল পৃথিবী-পতির!
কলিকালে বঙ্গ ভালে কি সৌভাগ্য যোগ
হারাওনা বঙ্গবাসি! এ স্বর্ণসুযোগ!
অশিলক্ষ যোনি ভ্রমি মানব হ'য়েছে,
কর্ম্মভূমি এ ভারতে জনম পেয়েছ;
তাহে গৌর লীলা-ক্ষেত্র বঙ্গদেশে ঘর;
বাঙ্গালীর কি সৌভাগ্য আছে এর পর?
তাই বলি হে বাঙ্গালি! সব দুঃখ ভুলে,
গৌর-প্রেমানন্দে মজ মনোপ্রাণ খুলে।
শ্রীকৃষ্ণভজনে কভু এ কলি দুর্দ্দিনে,
কারো না হইবে শক্তি গৌরভক্তি বিনে

৭

তাই বলি হে বাঙ্গালি! গৌরাঙ্গ-স্বজাতি
গৌরপ্রেমে মজ—গৌর ভজ দিবারাতি
ভক্তিভরে ধর করে করতাল খোল,
গৌর-প্রেমানন্দে গাও হরি-হরি-বোল!
গৌর ভেবে গৌরভাবে হইয়ে বিভোল,
গৌর-প্রেমানন্দে গাও হরি-হরি-বোল!
গৌরহরি-ভাবে ভবে দেও সবে কোল,
ভাব হরি, জপ হরি, ব'ল হরিবোল!
গৌরহরি ধরি ধন্য বাঙ্গালার কোল;
বাঙ্গালি! হওহে ধন্য বলে হরিবোল!
গৌরহরি হয়ে হরি বলে হরিবোল,
হরি সহ অহরহ বল হরিবোল।

ভগবদুপাসনাসিদ্ধির শক্তি যে ভক্তি, একথা স্বীকার করিতে বোধহয় কোন দেশের কোন জাতিই আপত্তি করিবে না। এই যে ভক্তি ইহারই পরম পরাকাষ্ঠা চরমাদর্শ অনুপম অসাধারণ উদাহরণ আমার শ্রীগৌরাঙ্গের মহামহিমা-ময় জীবনে স্তরে স্তরে সংন্যস্ত। শ্রীগৌরাঙ্গের জীবন-চরিত সাধক সাধারণেরই হৃদয়ের ধন, বৈষ্ণবের তো কথাই নাই; সৌর শাক্ত শৈব গাণপত্য এই চতুঃ সম্প্রদায়ও যদি দলাদলি ভুলিয়া নিষ্কিঞ্চনভাবে গ্রহণ করেন তবে শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর শিক্ষার মধ্যে স্ব স্ব সম্প্রদায়ের উপাসনার অনুকূল শিক্ষালাভ করিতে পারিবেন।

শ্রীগৌরাঙ্গের শিক্ষা দীক্ষা শক্তি প্রেম ভক্তি, ভাব ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্য এক কথায় সমস্ত প্রভাবই অসাধারণ ও অনুপম, তাই জাতি ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে মানবাত্মার স্বাভাবিক ও সাধারণ সম্পত্তি ভগবদ্ভজন লক্ষ্য করিয়া ভাবে ভাবে অকুণ্ঠিতচিত্তে বলিতে পারা যায় যে "করুণাময় শ্রীগৌরাঙ্গের মধুর চরিতকথা সাধন-নন্দনের কল্পলতা, আর ইহাতে সর্ব্বসম্প্রদায়ের ধার্ম্মিকগণই মুগ্ধ" শ্রীগৌরাঙ্গ-চরিতা-লোচন-ব্যপদেশে পাশ্চত্যশিক্ষিত কোনও বড় কবি বলিয়াছেন, "ভারতের শ্রীগৌরাঙ্গ জগতের ভূমি।"

মহাকবি ব্যাসদেবের শ্রীমদ্ভাগবতে ত্রিপাদ ধর্ম্মময় দ্বাপরযুগের শ্রীকৃষ্ণচরিত আলোচনা-প্রসঙ্গে যে সকল ভক্তিতত্ত্বের লোকোত্তর লীলা দেখিতে পাওয়া যায় এই পাদধর্ম্মবিশিষ্ট কলিযুগে কলিকলুষনাশন কলিজীবের অহেতুক বন্ধু শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দরের অমিয় মধুর চরিতালোচনায় যেন তাহাও অতিক্রম করিয়া যায়। কোনযুগে কোনকালে যাহা কেহ দেওয়া দূরে থাকুক কল্পনাও করিতে পারে নাই, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভু আমার সেই জিনিষ এক অভিনবভাবে জীবের সম্মুখে ধরিয়াছেন; গৌরলীলায় প্রত্যক্ষদর্শী পরমভাগবত শ্রীল রূপগোস্বামী তাঁহার বিদগ্ধমাধব গ্রন্থের বন্দনায় তাই বলিয়াছেন—

"অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্।
হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতিকদম্বসন্দীপিতঃ
সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ॥

প্রসঙ্গক্রমে অনেক দূর আসিয়া পাঠকগণের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটাইতেছি। আর বিস্তার করিব না। আর করিবই বা কি করিয়া! মানুষের তেমন ভাষা সংযোজনের শক্তি নাই আর ভাষার মধ্যেও তেমন শব্দ নাই বা শব্দার্থ প্রকাশক শক্তি নাই যাহাদ্বারা পূর্ণব্রহ্ম শ্রীগৌরাঙ্গের বিষয় সম্যক্‌রূপে বর্ণনা করা যায়। তাই শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের ভুবনমঙ্গল নামের জয় দিয়া পাঠকগণের নিকট বিদায় লইলাম—প্রভুর ইচ্ছা থাকিলে আবার এ বিষয় আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। জয় শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর—জয় শ্রীগৌরভক্তবৃন্দ।

দুইটী বৈরাগী

অদ্ভুত ব্যাপার! কলিকাতা সহরে মহাপ্রদর্শনী, অর্থাৎ নানা দিগ্‌দেশ হইতে আনীত অতি অপূর্ব্ব ও মনোহর দ্রব্যসমূহের একত্র সমাবেশ। এ সমাবেশবৃত্তান্ত বর্ণনাতীত। ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবানের অপরূপ রূপ বর্ণনে বেদব্যাসাদি মহা মহা ঋষি ও মুনিগণ যেমন অসমর্থ, এই প্রদর্শনীর অপূর্ব্বরূপ শোভা বর্ণনেও আমি সেইরূপ অসমর্থ। পুণ্যশীল ভগবদ্ভক্তগণ ভগবানের রূপ দর্শন করিতে করিতে, ভগবৎ-অঙ্গের যখন যে অংশে নয়ন পাতিত করেন, তখন সেই অংশ হইতে অন্য অংশ দেখিবার নিমিত্ত যেমন নয়নকে সহজে

সঞ্চালিত করিতে পারেন না; এই সুসজ্জিত প্রদর্শনীর এক একটী দ্রব্য সমাবেশের সৌন্দর্য্য দেখিতে দেখিতে অন্য দ্রব্যাদির সৌন্দর্য্য দেখিতে হইলে নয়নকে সেইরূপ সহজে স্থানান্তরিত করিতে পারা যায় না। যে দ্রব্য শোভায় নয়ন পড়ে, ইচ্ছা হয় সেই শোভাই নিরন্তর নয়ন ভরিয়া দেখি। মোট কথা, বহুদিন ধরিয়া বহুবার দেখিলেও, এ প্রদর্শনীর শোভা সন্দর্শনে দর্শনলোলুপ নয়নযুগলকে চরিতার্থ করিতে পারা যায় না। সুতরাং এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া নয়ন মন সফল করিবার জন্য পৃথিবীর নানা দিগ্‌দেশ হইতে বালক বালিকা, যুবক যুবতী, প্রৌঢ় প্রৌঢ়া, বৃদ্ধ বৃদ্ধা প্রভৃতি করিয়া সকলেই কৌতূহলাক্রান্তচিত্তে পঙ্গপালের ন্যায় কলিকাতা সহরাভিমুখে অবিরামগতিতে যাত্রা করিয়াছিলেন। কে কিরূপ দেখিয়াছিলেন, তাহা তাঁহারাই বলিতে পারেন।

এই প্রদর্শনী দর্শনোপলক্ষে কোন পল্লীগ্রামনিবাসী একটী যুবক বহু অর্থ ব্যয় করিয়া বহুবার কলিকাতায় যাতায়াত করিয়াছিলেন। কিন্তু শেষবার যখন নিজ যুবতী সহধর্ম্মিণীকে দেখাইবার জন্য নির্ব্বন্ধাতিশয় প্রকাশ করেন, তখন সুশীলা পতিব্রতা পত্নী যথাসঙ্গত বাক্য দ্বারা নানাবিধ আপত্তি উত্থাপন করিয়া বলেন যে, আপনি মনের বশীভূত হইয়া যাহা করিয়াছেন, তাহাতে কোন কথা বলিবার আমার কোন অধিকার নাই। কারণ পতি কোন নিন্দিত কার্য্য করিলেও পতিকে নিন্দা করা বা পতির কার্য্যে বিরক্ত হওয়া সাধ্বী স্ত্রীর উচিত নহে। পরন্তু যে কার্য্যে পতির নিন্দা ও বিপদ হইবার সম্ভাবনা সে কার্য্য হইতে পতিকে রক্ষা করা পতিপ্রাণা কামিনীর অবশ্য কর্ত্তব্য। অতএব আমি ঐ বহুজনতাপূর্ণ ও বিপদসঙ্কুল স্থান প্রদর্শনীতে অতি অপ্রয়োজনীয় তুচ্ছ জিনিষ দেখিয়া নয়ন মনকে কলুষিত করিবার নিমিত্ত কদাচই যাইতে পারিব না। যাইলে আপনি বিপদগ্রস্ত হইবেন; আমারও সর্ব্বনাশ ঘটিবেক। আপনি প্রদর্শনী দর্শনের নিমিত্ত যেরূপ ব্যস্ত ও চঞ্চল অবস্থায় অবস্থিত দেখিতেছি তাহাতে কাহাকে সামলাইবেন বলুন দেখি? আপনার উচ্ছৃঙ্খল মনকে সামলাইবেন, না আমায় সামলাইবেন? আমায় সামলাইতে গেলে, আপনার মনের মনোরথ পূর্ণ হইবে না। আবার মনের মনোরথ পূর্ণ করিতে গেলে আমায় সামলাইতে পারিবেন না। অতএব অসংযতচিত্ত পুরুষগণের নারী সঙ্গে লইয়া নরনারীপূর্ণ কোন সমারোহ ব্যাপারে উপস্থিত হওয়া যে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ তাহাতে অনুমাত্রও সন্দেহ নাই।

আমার অবিবাহিতাবস্থায়, আমি আমার পিতার গুরুদেবের মুখে শুনিয়া

ছিলাম যে, "স্ত্রীলোকদিগের কোন উৎসবেই উপস্থিত হওয়া যুক্তিসঙ্গত ও উচিত নহে। পতিপরায়ণা সাধ্বীস্ত্রীর পতিসেবাকেই নিত্য উৎসব ও পরমানন্দ-জ্ঞানে সকল প্রকার বার ব্রত উপবাস ও উপাসনাদি হইতে বিরত হওয়াই শাস্ত্রানুমোদিত।" তিনি সময়ে সময়ে যে সমস্ত উপদেশ দিতেন, তন্মধ্যে স্ত্রীধর্ম্মসম্বন্ধে একদিন যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার কতক কতক অদ্যাপি আমার স্মরণ আছে। তিনি বলিয়াছিলেন—স্ত্রীজাতি, সধবাই হউক আর বিধবাই হউক, সতত অবগুণ্ঠনাবৃত হইয়া থাকিবে। যখন চলিবে তখন অত্যন্ত ভীতার ন্যায়, এমন কি যেমন প্রতি পদবিক্ষেপ সর্পের মস্তকে প্রদান করিতেছে ভাবিয়া, পদক্ষেপণ করিবেন। বাক্য এত মৃদুভাবে প্রয়োগ করিবেন যে, যেন তাঁহার নিজের শ্রবণেন্দ্রিয়ের অতীত স্থানে গমন না করে। সাধ্বী স্ত্রীগণ বিভবের মূলস্বরূপ স্বামীরই সর্ব্বদা সেবা করিবে। কুলকামিনীগণের পতিই পরম বন্ধু এবং দেবতাস্বরূপ; অধিক কি, পতিব্রতাগণের পতি ভিন্ন অন্য কোন উপায়ই নাই। পরম সম্পত্তিস্বরূপ পতিই গতিদাতা মূর্ত্তিমান্ দেবতা। ধর্ম্ম, সুখ, সর্ব্বদা প্রীতি, নিরন্তর শান্তি, সম্মান এবং মানদাতা পতিই নারীগণের মান্য এবং প্রণয়কোপের শান্তিকারক। সংসারে যে কিছু সার বস্তু আছে তাহার মধ্যে বন্ধুগণের সৌহার্দ্দবর্দ্ধক পতিই সার এবং রমণীগণের বন্ধু বর্গের মধ্যে ভর্ত্তা অপেক্ষা অন্য বন্ধু আর দৃষ্টিগোচর হয় না। পতি, কামিনীগণের ভরণহেতু ভর্ত্তা, পালন হেতু পতি, শরীরের ঈশ্বর বলিয়া স্বামী, অভিলাষ সাধক বলিয়া কান্ত, সুখ বর্দ্ধন করেন বলিয়া বন্ধু, প্রীতি প্রদান করেন বলিয়া প্রাণনাথ, রতিদান হেতু রমণ প্রভৃতি নামে প্রসিদ্ধ হন। পতি হইতে প্রিয় আর কেহই নাই। এই প্রিয়ের শুক্র হইতে পুত্রের উৎপত্তিহেতু পুত্রও প্রিয় হয়। পতি কুলকামিনীগণের সর্ব্বদাই শত পুত্র অপেক্ষাও প্রিয়তম হন। অসৎকুলপ্রসূতা নারী কান্তকে না জানিয়া অসৎপথ অবলম্বন করে। সর্ব্ব-তীর্থে স্নান, সর্ব্বযজ্ঞে দীক্ষা, পৃথিবী প্রদক্ষিণ, সকল প্রকার তপস্যা, সকল প্রকার ব্রত, সকল প্রকার মহাদান, বিশ্বমণ্ডলে পুণ্যদিনে উপবাসাদি, গুরু বিপ্র ও দেবসেবা প্রভৃতি যত প্রকার কৃচ্ছ্রসাধ্য পুণ্য কর্ম্ম আছে, সে সকলই স্বামি সেবার ষোড়শ কলার এক কলারও সমান নহে। মনুষ্যগণের যে প্রকার সকল গুরু অপেক্ষা বিদ্যাদাতা গুরু পূজ্য, কুলস্ত্রীগণেরও সেইরূপ গুরু বিপ্র এবং ইষ্টদেব প্রভৃতি সকল অপেক্ষা পতিই গুরুতর। যে রমণী অসদ্বংশ হইতে উৎপন্ন এবং যাহার চিত্ত নিরন্তর পর পুরুষকে অভিলাষ করিয়া থাকে, সেই

দুষ্টচেতা কামিনীই পতিনিন্দা করিয়া থাকে। আর যে রমণী যথার্থ সাধ্বী, তিনি—পতি পতিতই হউন বা রোগীই হউন, দুষ্টই হউন আর নির্ধনই হউন এবং গুণহীনই হউন বা যুবাই হউন অথবা বৃদ্ধই হউন কোনক্রমে তাঁহাকে ক্ষণকালের জন্য ত্যাগ করেন না। নিরন্তর তাঁহারই সেবা করিয়া থাকেন। যে অসতী রমণী, সগুণ নির্গুণই হউন, বিদ্বেষবশতঃ পতিকে ত্যাগ করিয়া থাকে, চন্দ্র সূর্য্য বিদ্যমান থাকিতে সে কালসূত্র হইতে কিছুতেই নিষ্কৃতি লাভে সমর্থা হয় না। অনন্ত কাল তাহাকে নরক মধ্যে থাকিয়া ভয়ানক শকুন তুল্য কীটগণের অসহ্য দংশনযন্ত্রণা সহ্য করিতে হয়। ক্ষুধার সময় মৃত ব্যক্তির পচা মাংসেই ক্ষুধার শান্তি এবং পিপাসার সময় মূত্রপানেই পিপাসা দূর করিতে হয়। ইহাতেই পতি দ্বেষিনী অসতী কামিনীর যন্ত্রণার শেষ হয় না। সেই হতভাগ্য অসতীকে এই প্রকারে নরকভোগের পরও পুনরায় সহস্রকোটি জন্ম গৃধ্র হইয়া অনির্ব্বচনীয় যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়; পরে সেই কুলটা শতবার শূকর শতবার শ্বাপদরূপে জন্মলাভ করিয়া পরিশেষে যদিও নিজ পূর্ব্বসঞ্চিত শুভকর্ম্ম বলে মানব জন্ম লাভ করে, তথাপি সে নিশ্চয় বিধবা ধনহীনা ও চিররোগিণী হয় ইহাতে আর সন্দেহ নাই।" অতএব আমি কুলকামিনীগণের কর্ত্তব্য কর্ম্ম ও অবগুণ্ঠনীয় ধর্ম্ম উপেক্ষা করিয়া, কুল কলঙ্কিনী কুলটাগণের পন্থা, কর্ম্ম ও ধর্ম্মাবলম্বনে ওরূপ-শাস্ত্রনিষিদ্ধ কর্ম্মে কদাচই অগ্রসর হইতে পারিব না। আধুনিক কুলমহিলাগণের, নিমন্ত্রণে, উৎসবে, রঙ্গালয়ে ও পতি বিদ্যমান থাকিতে তীর্থাদি দর্শনে গমন করাকেও আমি, স্ত্রীজাতির পক্ষে, সম্পূর্ণ বিধিবিরুদ্ধ ও গর্হিত জ্ঞান করিয়া থাকি। আর যে পুরুষ এই সমস্ত কার্য্য অনুমোদন করেন, তিনি, প্রকৃতপক্ষেই স্ত্রীজাতিকে প্রশ্রয় দিয়া নিজের অনিষ্ট নিজেই করিয়া থাকেন সন্দেহ নাই। স্ত্রীজাতি কি বাল্য, কি যৌবন, কি বৃদ্ধ কোন অবস্থাতেই স্বাধীনা নহে। তবে যে, কোন কোন নারী স্বাধীনভাব অবলম্বন করেন, সে কেবল—আমার অনুমান হয়—পুরুষের অবিবেচনা ও দমনশক্তির দোষে। স্ত্রীজাতিকে অধীনে রাখাই পুরুষশক্তির একটী সাধারণ লক্ষণ আর মনকে অধীনে রাখাই হইল বিশেষ বা উৎকৃষ্ট লক্ষণ। এই উভয় লক্ষণই যে, পুরুষের নাই, তাহার পরিণাম ফল যে কতদূর শোচনীয় ও বিষময় হয়, তাহা সেই পুরুষই জানিতে পারেন। অতএব আপনার নিকট আমার সানুনয় নিবেদন এই যে, আপনি অগ্রেই মনকে বশীভূত করিবার জন্য যত্নবান হউন। মনকে বশ করিতে

পারিলেই সাধারণ লক্ষণ বিনা চেষ্টাতে নিশ্চয় প্রাপ্ত হইতে পারিবেন।

যুবক পত্নীর এই সমস্ত নীতিপূর্ণ উপদেশ শ্রবণ করিয়া অভিমানভরে মন বশীভূত করণের উপায় অনুসন্ধানার্থ গৃহ পরিত্যাগ করিয়া চলিল। মনের আশায় নিরাশ হওয়াতেই হউক বা কোন ভাবান্তর উপস্থিত হওয়াতেই হউক, যুবকের চক্ষে জল আসিল। অশ্রুপূর্ণনেত্র মার্জ্জনা না করিয়াই গমন করিতে করিতে ক্রমশঃ গ্রাম ছাড়াইয়া অতি বিস্তৃত একটী মাঠে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং অতি দূরে একটী কৃষক ক্ষেত্র-কর্ষণ করিবার উদ্যোগ করিতেছে দেখিয়া নিকটস্থ একটী বৃক্ষতলে উপবেশন করিল।

পতিব্রতার অসাধারণ শক্তিমাহাত্ম্যে, এই স্থান হইতেই যুবকের বৈরাগ্যের সঞ্চার হয় ও মনের সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন ঘটে। সে অতি অপূর্ব্ব ঘটনা পাঠক শ্রবণ করুন।

যুবক বৃক্ষতলে উপবেশন করিয়া দেখিল—কিশোরবয়স্ক একটী কৃষক ক্ষেত্র কর্ষণের যন্ত্র হলে অর্থাৎ লাঙ্গলে দুইটী বৃষকে যোজনা করিবার জন্য প্রাণ-পণে চেষ্টা করিতেছে. কিন্তু বৃষ দুইটী কোনক্রমেই স্কন্ধে যোয়াল স্পর্শ করাইতে দিতেছে না। প্রাণ-পণ চেষ্টা বারংবার বিফল হওয়ায় কৃষক অতিশয় বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হইয়া, যেমন বৃষদ্বয়কে প্রহার করিতে উদ্যত হইল, অমনি উহারা যোয়াল-সংলগ্ন বন্ধন রজ্জু ছিন্ন করিয়া দৌড়াইতে আরম্ভ করিল। কৃষকও উহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যষ্টিধারণ করিয়া ধাবিত হইতে লাগিল। বৃষদ্বয় প্রহারের ভয়ে ঐ বিস্তৃত মাঠের চারিদিকে উর্দ্ধপুচ্ছ হইয়া সবেগে দৌড়াইতে লাগিল। কৃষকও প্রহার দ্বারা উহাদিগকে বশীভূত করিবার মানসে উহাদের পশ্চাতে ধাবিত হইতে হইতে যখন অত্যন্ত ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িল, তখন রোষ ও বিমর্ষে অধীর হইয়া অশ্রুপূর্ণনয়নে পূর্ব্বোক্ত যুবক যে বৃক্ষতলে উপবেশন করিয়াছিল, সেই বৃক্ষতলেই আশ্রয় গ্রহণ করিল। কিয়ৎক্ষণ পরে যখন শ্রম কথঞ্চিৎ দূর হইল, তখন কৃষিকার্য্যকে নিন্দা করিতে করিতে ঐ যুবকের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিল, যুবকের চক্ষেও অশ্রুবিন্দু সংলগ্ন রহিয়াছে। কৃষক কৌতূহল নিবারণের নিমিত্ত জিজ্ঞাসা করিল, মহাশয়! আপনার চক্ষে জল কেন? আপনি কি আমার দুঃখে দুঃখিত হইয়া রোদন করিতেছেন? না আপনার শারীরিক বা মানসিক কোন কষ্ট এই অশ্রু-জলের কারণ? যদ্যপি প্রকাশ করিতে কোন বাধা না থাকে, তবে বলিয়া আমার কৌতূহল নিবারণ করুন।

যুবক বলিল, ভাই! তুমি যেমন ক্লেশ-তাপিত-কলেবরে তোমার কৃষিবৃত্তিকে নিন্দা করিতে করিতে দুঃখ প্রকাশ করিতেছ; আমিও তোমারই ন্যায় মনঃ-ক্ষোভে কাতর হইয়া সংসারকে নিন্দা করিতে করিতে অভিমানভরে সংসার হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছি এবং অবশীভূত মনের জন্য লাঞ্ছিত হওয়ায় রোদন করিতেছি।

কৃষক বলিল, জগতের আশ্চর্য্য ও বিচিত্র ব্যাপার বুঝিয়া উঠা ভার। আপনারা সৎকুলসম্ভূত ও ভোগৈশ্বর্য্যে সতত পরিতৃপ্ত হইয়াও যখন অতি দুঃখিতের ন্যায় সংসারের নিন্দা করিতেছেন; তখন পণ্ডিতগণ সংসারকে যে দুঃখের আগার বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন তাহা ত মিথ্যা নয়! তাঁহারা সংসারকে দুঃখের আগার বলিয়া ব্যাখ্যা করিবার পরই আবার বলিয়া থাকেন যে, "যদি এই দুঃখময় সংসার হইতে পরিত্রাণ পাইবার ইচ্ছা থাকে, তবে নিরন্তর ভক্তিসহকারে ভগবানের নাম উচ্চারণ কর, তাঁহাকে ডাক ও তাঁহার শরণাপন্ন হও। নচেৎ এই সংসার হইতে পরিত্রাণের কোন উপায় নাই।" অতএব পণ্ডিতগণের উপদেশ ব্যাখ্যানুযায়ীক আসুন দেখি আমরা দুইজনে ভগবানকে একবার ডাকিয়া দেখি। যুবক বলিল তাঁহাকে ডাকিতে কোন বাধা নাই এবং ডাকিবার জন্য আমার মনও যেন অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়াছে বলিয়া বোধ হইতেছে। কিন্তু এমন কি পুণ্য আমাদের সঞ্চিত আছে যে তাঁহাকে ডাকিবামাত্রই, তিনি দেখা দিয়া আমাদের সংশয় মোচন করিয়া দিবেন। শুনিয়াছি কত যুগ-যুগান্তর-ব্যাপী কঠোর তপস্যা করিয়াও যোগী ঋষিগণ তাঁহার দর্শন পান না।

উভয়ে এইরূপ কথোপকথন হইতেছে এমন সময় একটী বৃদ্ধ কৃষক নব নব দুর্ব্বা ঘাসের একটী মুটরী ও দক্ষিণ হস্তে একটী জলাধার (বাল্তী বিশেষ) লইয়া অতি মৃদু-পদ-সঞ্চারে হঠাৎ ঐ বৃক্ষতলে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং বাল্তী ও দুর্ব্বার মুটরী বৃক্ষতলে রাখিয়া, মুহূর্ত্তমাত্র বিশ্রামের পর জিজ্ঞাসা করিল—বাপু! তোমরা কি কথোপকথন করিতেছ? তোমাদের মুখের ভাব ও চক্ষের লক্ষণাদি দেখিয়া বোধ হইতেছে যে যেন তোমরা দুইজনেই কোন মানসিক কষ্টভোগ করিতেছ ও কষ্টদূর করিবার মানসে সর্ব্বদুঃখহারী হরিকে ডাকিবার জন্য যত্ন করিতেছ। ভাল, তোমাদের দুঃখের কথা আমি একবার শুনিতে পাইব কি?

যুবক ও কিশোর কৃষক উভয়েই ঐ বৃদ্ধ কৃষকের এই প্রকার অদ্ভুত

অনুমানশক্তি দেখিয়া অতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইল এবং উহাঁকে মহাপুরুষজ্ঞানে ভক্তিসহকারে নতমস্তকে নমস্কার ও যথোচিত সম্মানাদি দ্বারা সম্মানিত করিয়া, একে একে দুইজনেই স্বস্ব দুঃখের কারণ অকপটে আদ্যোপান্ত বর্ণনা করিতে আরম্ভ করিল। একে একে যখন উভয়েরই বলা শেষ হইল, তখন ঐ বৃদ্ধ কৃষক কিশোর কৃষককে বলিল, আচ্ছা, তোমার কর্ষণযন্ত্র ও বৃষ কোথায় আছে আমায় দেখাইয়া দাও। আমি তোমার বৃষদ্বয়কে ধারণ করিয়া তোমার কর্ষণযন্ত্রে যোজনা করিয়া দিতেছি। কিশোর কৃষক ঐ বৃদ্ধ কৃষকের আদেশমত নিকটস্থিত তাহার হল ও বহুদূরে বিচরণ-কারী বৃষদ্বয়কে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ দ্বারা দেখাইয়া দিল। বৃদ্ধ কৃষক দেখিয়া অতি আগ্রহের সহিত তাহার মুটরী হইতে বড়গোছের এক আঁটী দুর্ব্বাঘাস দক্ষিণ হস্তে এবং জলপূর্ণ বাল্‌তীটী বামহস্তে লইয়া প্রথমতঃ ঐ বৃষদ্বয়ের দিকে গমন করিতে লাগিল। অল্পে অল্পে ঐ বৃষদ্বয়ের নিকটবর্ত্তী হইয়া ঐ ঘাস ও জল বৃষদ্বয়কে দেখাইতে লাগিল। পরিশ্রান্ত বৃষদ্বয় তাহাদের খাদ্য ও পানীয় ঘাস জল দেখিয়া অতিক্রুতগতিতে ঐ কৃষকের দিকে গমন করিতে লাগিল। বৃদ্ধও ঘাস জল দেখাইতে দেখাইতে ক্ষেত্রস্থ কর্ষণ যন্ত্রের নিকটে উহাদিগকে ক্রমশঃ আনয়ন করিতে লাগিল। উহারা কর্ষণযন্ত্রের নিকটস্থ হইলে, ঘাস ও জল ভোজন-পানার্থ উহাদিগকে প্রদান করিল এবং উহাদের গাত্রে হাত বুলাইতে বুলাইতে যখন দেখিল যে উহাদের ভক্ষণ করা শেষ হইয়াছে, তখন আস্তে আস্তে উহাদিগকে হলে যোজনা করিয়া দিয়া দুইহস্তে দুই মুষ্টি দুর্ব্বা লইয়া উহাদিগকে খাওয়াইতে খাওয়াইতে বৃদ্ধ কৃষক ঐ যন্ত্রের অগ্রে অগ্রে গমন করিতে লাগিল। আর কিশোর কৃষক হল চালাইতে লাগিল। এইরূপে দুই তিন পাক কর্ষণের পর বৃদ্ধ কৃষক নিরস্ত হইয়া বলিল আর ভয় নাই; এখন উহারা বশে আসিয়াছে; অতএব শীঘ্র শীঘ্র তোমার কার্য্য শেষ করিয়া লও। কিশোর কৃষকও তখন বিনা পরিশ্রমে অবিলম্বেই নিজ কার্য্য শেষ করিয়া ফেলিল এবং ঐ বৃষ দ্বয়কে হল হইতে মোচন করিয়া ঐ বৃদ্ধ কৃষকের নিকট গমনপূর্ব্বক অতি বিনীতভাবে পাদবন্দনাদি দ্বারা ঐ বৃদ্ধ গোচালকের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে লাগিল। বৃদ্ধ কৃষক কিশোর কৃষককে ঐরূপভাবেই প্রত্যহ, গো দুইটীকে হলে যোজনা করিয়া কর্ষণ করিতে এবং দিনান্তে এক একবার অবসর বুঝিয়া অতিশয় অদম্য গোরূপী মনকে সাধন-ভজন-রূপ কর্ষণ কার্য্যে নিযুক্ত করিতে উপদেশ দিয়া যুবককে বলিল—বাপু! এই যে প্রণালী দেখাইলাম—

তোমার হৃদয় ক্ষেত্রকেও এইরূপ প্রণালীতে কর্ষণ করিতে হইবেক। তোমার মনরূপ বৃষ আজ যোয়াল ভাঙ্গিয়া মাঠে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে; অতএব এখন তোমাকেও ঘাস জল অর্থাৎ ধুপ, দীপ, নৈবেদ্য, নব নব দুর্ব্বা, তুলসী, পুষ্প, অনুলেপন, পানীয়, আচমনীয় ও তাম্বুল প্রভৃতি দ্রব্যাদির দ্বারা তোমার মনরূপ দুর্দ্দান্ত বৃষকে এবং ঐ মনের অধীন আর যে কএকটী গো আছে তাহাদিগকেও ভগবৎ-ভজন-রূপ কর্ম্ম-যোয়ালে যোজনা করিয়া, আবর্জ্জনা-পূর্ণ হৃদয়কে কর্ষণ করিয়া ফেলিতে হইবে। প্রত্যহ ঐরূপ নিয়মে তোমার অদম্য গো সমূহকে ভগবৎ আরাধনায় প্রবৃত্ত রাখিও; দেখিবে মন ও তাহার অনুচরবর্গ ক্রমশঃ বশীভূত হইয়া আসিবে। আর হৃদয়ক্ষেত্রও ক্রমশঃ পরিস্কার ও উর্ব্বরা হইয়া সোণা ফলাইয়া দিবে। ইহারই নাম উপাসনা, সাধন, ভজন বা ভগবৎ আরাধনা। ইহা প্রকৃষ্টরূপে অনুষ্ঠিত হইলেই প্রবৃত্তি নিবৃত্তি হইবে, বাসনার বীজ নষ্ট হইয়া যাইবে, বৈরাগ্যের উদয় হইবে এবং ব্রজধামের সেই কাল সোণাকে পর্য্যন্ত পাইতে পারিবে। যাঁহাকে পাইলে আর কোন অভাবই থাকিবে না। সকলই ভাবে পরিণত হইয়া যাইবে। অতএব এখন তোমরা স্ব স্ব গৃহে গমন কর। আমিও আমার নির্দ্দিষ্ট স্থানে গমন করি। কিন্তু, সাবধান! যেন রিপু ও ইন্দ্রিয় দমনের উপযোগী স্থান গৃহস্থাশ্রম ত্যাগ করিও না। যেরূপ প্রণালী দেখাইয়া দিলাম ও বলিলাম সেইরূপ প্রণালীতে কার্য্য করিতে করিতে যদি তোমাদের কাহারও কখন কোন প্রকার অশান্তি উপস্থিত হয়, তবে এই বৃক্ষতলে আসিয়া আমার জন্য অপেক্ষা করিও; আমি আসিয়া অশান্তি দূর করিয়া দিব।

যুবক ও কিশোর কৃষক উঁহাকে পরম গুরু জ্ঞানে ভক্তিপূর্ব্বক অবনীলুণ্ঠিত মস্তকে প্রণাম করিয়া প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক স্ব স্ব গৃহাভিমুখে গমন করিল। পাপ তাপ-কর্ষণকারী কৃষক-বেশধারী শ্রীকৃষ্ণও এক নূতন লীলা প্রকাশ করিয়া সেই স্থান হইতেই অন্তর্দ্ধান হইলেন।

ভক্তাধীন হরি-ভক্তের জন্য করিতে পারেন না এমন কোন কার্য্যই নাই। তাঁহার ভক্ত পাণ্ডবদিগের জন্য এক এক সময় তিনি যে কি বিস্ময়কর ব্যাপারই সম্পাদন করিয়াছেন ও কি অঘটনই ঘটাইয়াছেন, তাহা যাহারা স্ত্রী, শূদ্র ও দ্বিজ-বন্ধুগণের পাঠ্য পঞ্চম বেদস্বরূপ "মহাভারত" গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহারা বিশেষরূপ জানেন। অতএব এখানে কৃষকের বেশে ঘাসের বোঝাও জলের বাল্‌তী বহন করা, তাঁহার পক্ষে যে একটী অসম্ভব ও মানহানীর কার্য্য;

তাহা যেন কেহ না মনে করেন। তাঁহার কাজই হইল এই। ভক্তবৎসল ভগবান ভক্তকে বাড়াইয়া নিজে ছোট হইয়া থাকেন। তাই তিনি নিজে নিজ সখা পার্থকে বলিয়াছিলেন :—"অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তোমাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে। তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্॥" (গীতা। নবম অধ্যায়। ২২ শ্লোক।) এই শ্লোকেরই "বহাম্যহম" কথাটীর "বহা" বর্ণদ্বয় কাটিয়া "দদা" করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি তাহারই ভক্ত অর্জ্জুন মিশ্রকে কি অদ্ভুত রূপে ছলনা ও শিক্ষা দিয়াছিলেন তাহাও সকলেই জানেন। সম্ভব অসম্ভব সকলই করিতে সক্ষম বলিয়া তিনি সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর। তাঁহারপক্ষে কৃষক সাজিয়া বা বোঝা বহন করিয়া তাঁহারই ভক্তকে মোক্ষ প্রদান করা কখনই অসম্ভব হইতে পারে না। এখন দেখা যাউক যুবক ও কিশোর কৃষক অতঃপর কি ভাবে কার্য্য করিল।

গুরূপদিষ্ট প্রণালী অনুসারে কার্য্য করিতে করিতে যুবকের মন ক্রমশঃ বশীভূত হইয়া আসিতে লাগিল। ইন্দ্রিয়গণের নেতা মনের সঙ্গে সঙ্গে ইন্দ্রিয়গণও স্বতই সংযত হইতে লাগিল ; সুতরাং বিষয় ভোগের স্পৃহা ক্রমশঃ হ্রাস ও ভগবৎ ভজনের অনুরাগ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিল। এইরূপে ভগবৎ কৃপায় যুবক সংসারে থাকিয়াও উত্তরোত্তর বৈরাগ্যকে আশ্রয় করিয়া অবশেষে পরম বৈরাগী হইয়া উঠিল। ভোজন আচ্ছাদন, শয়ন, উপবেশন প্রভৃতি কিছুতেই ভাল মন্দের বিচার রহিল না। সুখেও সন্তোষ দুঃখেও সন্তোষ ; সন্তোষেই সকল অবস্থায় কালযাপন করিতে লাগিল। যুবকের পতিপরায়ণা সাধ্বী স্ত্রীও স্বামীর ঐ ভাবের সাহায্য ও উদ্দীপনকারিণী হইয়া পরম আনন্দের সহিত ঐ ভগবৎ ভাবাক্রান্ত স্বামীর সেবা করিতে করিতে পরম সুখে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিল। অশান্তির লেশ মাত্রও রহিল না।

এদিকে কিশোর কৃষকও প্রথমতঃ বৃষদ্বয়কে ও তৎপরে বৃষরূপী মনকে ঐ গুরুপদিষ্ট প্রণালী অনুসারে ক্রমশঃ নিজ আয়ত্তাধীনে আনয়ন পূর্ব্বক বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক উভয় প্রকার কৃষিকার্য্যই এমন সুচারুরূপে সুসম্পন্ন করিতে লাগিল যে, অত্যল্প কাল মধ্যেই ঐ কৃষক একজন ক্ষেত্রজ্ঞ, তত্ত্বজ্ঞ ও আত্মজ্ঞ হইয়া উঠিল। এক ভগবৎ ভজন ভিন্ন আর কিছুতই আশক্তির লেশমাত্রও রহিল না। পূর্ণ বৈরাগ্যকে অবলম্বন করিয়া সংসারীর ভাবে প্রকৃত ভাবকে আচ্ছাদিত রাখিয়া সংসারেই বাস করিতে লাগিল। সকল পবিত্রকারী পাবকের সংস্পর্শে যেমন কয়লার ময়লা দূর হয় ; ক্ষণমাত্র সাধুসঙ্গে অর্থাৎ সৎগুরু জ্ঞানো-

পদেশে সেইরূপ মলিন চিত্তের ময়লাও পরিষ্কার হইয়া যায়। এখানে সাধ্বী পবিত্রতার শক্তি সঞ্চারে যুবকের পবিত্রতা আর যুবকের পবিত্রতাগুণে কিশোর কৃষকের ভগবৎ তত্ত্বের স্মৃতি ও সৌভাগ্যের উদয় ইহাই বুঝিতে হইবে।

যাহা হউক ঐ যুবক ও কৃষক গুরুরূপী বৃদ্ধ কৃষকের উপদেশ শিরোধার্য্য করিয়া সংসারাশ্রমে থাকিয়াই কাল যাপন করিতে লাগিল। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, জন সমাজে উহারা সতত এরূপ প্রচ্ছন্নভাবে উহাদের ঐ অপ্রাকৃত ভাবকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিত যে, বাহ্যিক লক্ষণ বা চিহ্নাদি দেখিয়া সাধারণ লোকের মধ্যে কেহই সাধু বা বৈরাগী বলিয়া চিনিতে বা জানিতে পারিত না। পরন্তু উহাদের ঐ অতুলনীয় চরিত্র ও দেববৎ আচরণ দৈবাৎ সৌভাগ্যক্রমে একবারমাত্র যাহাদের অন্তরদর্পণে প্রতিবিম্বিত হইত, তাঁহারাই উহা অবশ্যই অনুকরণীয় জ্ঞানে অতি আগ্রহ ও শ্রদ্ধার সহিত আলোচনা করিয়া উহাদের সঙ্গলাভে কৃতার্থজ্ঞান করিত ও জনম সফল করিতে সমর্থ হইত। সাধুর বেশে অসাধুতাকে ঢাকিয়া লোককে বঞ্চনা করা আর নিজ চরিত্রকে সুগঠিত না করিয়া, অন্যের চরিত্রগঠণের জন্য উপদেশ দেওয়া কদাচই যুক্তি সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। কারণ ইহার ফল প্রায়ই সুফলে পরিণত না হইয়া কুফলেই পরিণত হয়। উপদেশ হৃদয়ে লাগে না, যেন কোথায় ভাসিয়া যায়। বলা বাহুল্য এইরূপ ভাবের শিক্ষা দীক্ষাদির দোষেই আজকাল ধর্ম্মভাবের এত অভাব হইয়া পড়িতেছে যুবক ও কৃষক তাই বৈরাগী সাজিয়া ধার্ম্মিক বলিয়া পরিচয় দিতেন না এবং কাহাকেও কোন উপদেশও দিতেন না। উহাদের হৃদয়ে এই দৃঢ় বিশ্বাস বদ্ধমূল হইয়াছিল যে "জগতে উপদেষ্টা এক কিন্তু উপদেশের জিনিসে এই জগৎ সতত পরিপূর্ণ। এক সর্ব্বান্তর্য্যামি সর্ব্বব্যাপী হরিই গুরুরূপে জগজ্জীবকে শিক্ষা দিতেছেন। যাহার সৌভাগ্যের উদয় হয়, তিনি বিনা চেষ্টাতেই উপদেষ্টা ও উপদেশ লাভ করিয়া থাকেন।"

এইরূপ ভাবে ঐ দুইটী বৈরাগী বাস করেন—একদিন মধ্যাহ্নকালে প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডতাপে তাপিত হইয়া একটী সৌম্যমূর্ত্তি অতি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ অকস্মাৎ ঐ কৃষকের বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কৃষক ঐ আগন্তুক ব্রাহ্মণকে প্রণামান্তে অতি সম্মানের সহিত আসনে উপবেশন করাইয়া ব্যজনাদি দ্বারা শ্রমোপনোদন পূর্ব্বক আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। ব্রাহ্মণ বলিলেন কিছু যাচ্ঞা করিবার অভিলাষে তোমার নিকট আগমন করিয়াছি। যদি

প্রত্যাখ্যান না কর, প্রকাশ করিয়া বলি। কৃষক উত্তর করিলেন—সাধ্যায়ত্ত বিষয়ের মধ্যে ব্রাহ্মণকে অদেয় কিছুই নাই। আপনি অসঙ্কুচিত চিত্তে প্রকাশ করিয়া বলুন; কি আপনার আবশ্যক। ব্রাহ্মণ বলিলেন—এই ধনধান্য পূর্ণ গৃহ ও ক্ষেত্রাদি যাহা তোমার আয়ত্তের অন্তর্গত ও অধিকারে বর্ত্তমান সে সমস্তই আমি যাচ্ঞা করিতেছি; আমায় দান কর। কৃষক অতি আনন্দের সহিত ভক্তি-গদগদ বাক্যে "দিলাম" বলিয়া মনে মনে আপনাকে ধন্য ও কৃতার্থ জ্ঞান করতঃ বলিতে লাগিলেন—"দেব! আজ আমার জনম সফল হইল এবং আমি ধন্য হইলাম। কারণ উপযুক্ত পাত্রেই আমি এই সমস্ত সম্প্রদান করিয়া সুখী হইলাম। এক্ষণে আমায় অনুমতি করুন, আমি স্থানান্তরে গমন করি এবং আশীর্ব্বাদ করুন যেন আমি আমার জীবনের অবশিষ্ট সময় নির্ব্বিঘ্নে ভগবৎ আরাধনায় যাপন করিয়া তাঁহার অনুগ্রহলাভ করিতে সমর্থ হই। ব্রাহ্মণ ঈষৎ হাস্যের সহিত বলিলেন, "বাপু! তাহাই হইবে। যাহার যেরূপ ভাবনা, ভগবান তাহাকে তদ্রূপ সিদ্ধিই দান করিয়া থাকেন। যাহা হউক, আমি শুনিয়াছি, এই গ্রামেই তোমার ন্যায় আর একটী বিষয়ানুরাগবিহীন বৈরাগী বাস করেন। তাঁহার নিকট হইতেও কোন বিষয় যাচ্ঞা করিবার আমার অভিলাষ আছে। আমি এক্ষণে তাহার আলয়ে গমন করিব; কিন্তু তোমাকেও আমার সমভিব্যাহারে গমন করিতে হইবে। কৃষক "যে আজ্ঞা" বলিয়া তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব্বোক্ত সেই যুবকের আলয়ে উপস্থিত হইলেন। যুবক ঐ সৌম্য মূর্ত্তি অতি তেজীয়ান অথচ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে দেখিয়া আদর অভ্যর্থনা ও যথোচিত আতিথ্য সৎকার দ্বারা ব্রাহ্মণকে সন্তোষ ও সুস্থ করণানন্তর আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে পর, ব্রাহ্মণ বলিলেন বাপু! অতিশয় বৃদ্ধ হইয়াছি—সেবা শুশ্রূষার জন্য লোকের অত্যন্তই অভাব। অতএব তোমার এই পত্নীটীকে আমার সেবার জন্য যাচ্ঞা করিতেছি। অবিচলিত চিত্তে প্রদান করিয়া আমার সম্মান রক্ষা কর। নচেৎ অভিসম্পাত প্রদান করিব।

যুবক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের এই অভিলষিত যাচ্ঞার বিষয় শ্রবণ করিয়া আনন্দাভিশয়ে অতীব বিহ্বল হইয়া প্রেমাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে তাহার অনুগতা প্রিয়বাদিনী সহধর্ম্মিণীর বদন সুধাকরের প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক কহিলেন—ভদ্রে, শুনিয়াছি এই নশ্বর জগতে উপকার করা অপেক্ষা কর্ত্তব্য কর্ম্ম ও বিহিত ধর্ম্ম আর নাই। পরোপকারের নিমিত্তই সাধুগণ জীবন ধারণ করিয়া থাকেন।

বিশেষতঃ ব্রাহ্মণের উপকার। যে ব্রাহ্মণের পাদপদ্ম ভগবান স্বয়ং বক্ষে ধারণ করিয়া জগজ্জীবকে শিক্ষার ছলে জানাইয়াছেন যে, ব্রাহ্মণের সম্মান রক্ষা ও প্রার্থনা পরিপূর্ণ করিতে কেহ যেন কখনও পরাঙ্মুখ না হয়। অতএব এই ব্রহ্মণ্যদেবের সেবিকারূপে তুমি এই মুহূর্ত্ত হইতেই উহাঁর সঙ্গে গমন কর ইহাই আমার সম্পূর্ণ অভিলষিত ও অনুমোদিত। ইহাতে তোমার অভিপ্রায় কি জানিতে ইচ্ছা করি। যুবক-পত্নী অতি মৃদু ও মধুর বাক্যে বলিলেন— স্বামিন্! আমি আপনার একান্ত অনুগতা ও আজ্ঞানুবর্ত্তিনী সহধর্ম্মিণী, আপনি আমায় যখন যে কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতে আদেশ করিবেন, তখন সেই কার্য্য সম্পাদনার্থ আপনার আদেশ অবহেলা না করিয়া অতি আদর, আনন্দ ও যত্নের সহিত প্রতিপালন করাই আমার অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম ও একমাত্র ধর্ম্ম। অতএব, আমি আপনার আদেশ প্রতিপালনার্থ ব্রাহ্মণের সেবায় নিযুক্ত থাকিতে কিছুমাত্র অসন্তুষ্ট বা কুণ্ঠিত নহি; প্রত্যুত ইহাকে আমি পরম সৌভাগ্যের বিষয় বলিয়াই জ্ঞান করিয়া থাকি। সুতরাং আপনি অকুণ্ঠিত চিত্তে ব্রাহ্মণের সম্মান রক্ষা করতঃ আমায় প্রদান করুন। যুবক পত্নীর এই প্রকার ধর্ম্মানুগত ও শ্রবণ-সুখকর বাক্যে পরম প্রীতিলাভ করিয়া ব্রাহ্মণকে কহিলেন— দেব! আপনার সেবার জন্য আমি আমার পত্নীকে আপনার পাদপদ্মে সমর্পণ করিলাম। কিন্তু ভ্রম বা প্রমাদ বশতঃ আপনার সেবার যদি কখন কোন প্রকার ত্রুটী হয়, তবে তাহা মার্জ্জনা করিয়া যাহাতে আপনার সেবা সুচারুরূপে সম্পাদন করিতে পারে, অনুগ্রহপূর্ব্বক তাহাই আপনার এই সেবিকাকে শিখাইয়া দিবেন। ইহাই আপনার চরণ কমলে আমার করপুটে নিবেদন ও বিনীত প্রার্থনা।

যুবক ও তাহার পত্নীর ঈদৃশ অলৌকিক সরলতা ও অমায়িকতায় ব্রাহ্মণ যারপরনাই সন্তোষলাভ করিয়া যুবকের পত্নীকে বলিলেন—মা পতিব্রতে! তবে তুমি তোমার পরম দেবতা পতির নিকট বিদায় লইয়া অবিলম্বেই আমার সঙ্গে আইস। আর যুবককে বলিলেন—বাপু! তোমাকেও আমার সমভিব্যাহারে কিয়দ্দূর গমন করিতে হইবে। কৃষিকর্ম্মোপজীবী এই সন্তানটী আমায় উহার ধনধান্য পরিপূর্ণ গৃহ ও ক্ষেত্রাদি সকলই দান করিয়াছে। গৃহ দেখিয়া আসিয়াছি, কিন্তু ক্ষেত্রগুলি একবার দেখিয়া লইতে ইচ্ছা করি। অতএব তোমরা সকলেই অর্থাৎ তুমি তোমার পত্নী এবং গৃহ-ক্ষেত্র দাতা এই বৈশ্য সন্তান, তিনজনেই ঐ প্রদত্ত ক্ষেত্রের সন্নিধান পর্য্যন্ত আমার সঙ্গে আইস।

ব্রাহ্মণের আজ্ঞা প্রতিপালনার্থ উহারা তাহাই করিল—অর্থাৎ ক্ষেত্রের সন্নিহিত স্থান পর্য্যন্ত গমন করিল। ব্রাহ্মণ, বৈশ্য প্রদত্ত ক্ষেত্রগুলী সন্দর্শন করিয়া যে বৃক্ষ-তলে ঐ যুবক ও কৃষক প্রথমে সেই গুরুরূপী বৃদ্ধ কৃষকের সাক্ষাৎ লাভ করিয়া-ছিল, সেই বৃক্ষতলে উহাদিগকে উপবেশন করিতে আজ্ঞা করিয়া নিজে উহাদের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন, আমি তোমাদিগের বিদ্যা ও অবিদ্যা পরীক্ষা করিবার জন্যই এই বৃদ্ধব্রাহ্মণের বেশে তোমাদের নিকট আসিয়া গৃহ, ক্ষেত্র ও সেবিকা যাচ্ঞা করিয়াছিলাম, আমি তোমাদের পূর্ব্বপরিচিত সেই বৃদ্ধ কৃষক; এই আমার পূর্ব্বরূপ অবলোকন কর। যুবক ও কৃষক দেখিল—সৌম্যমূর্ত্তি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ আর নাই, সেই পূর্ব্বপরিচিত বৃদ্ধ কৃষকের বেশধারী গুরু-দেব, মস্তকে সেই দুর্ব্বাঘাসের বোঝা এবং হস্তে সেই জলের বাল্‌তি। এই অমানুষিক ব্যাপার নয়নগোচর করিয়া উহারা তিনজনেই অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হইল এবং ইনি যে সাক্ষাৎ পরমেশ্বর তাহাতে আর অনুমাত্রও সন্দেহ রহিল না। তখন উহারা তিন জনেই এককালে উহাঁর পদতলে দণ্ডের ন্যায় পতিত হইয়া স্তব স্তুতি করিতে লাগিল এবং উহাঁর সেবা করিবার মানসে তিনজনেই উহার সঙ্গী হইবার নিমিত্ত বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিল। পরন্তু ঐ কৃষক-বেশধারী জগৎগুরু হরি উহাদিগকে নিষেধ করিয়া বলিলেন তোমাদের পার্থিব কর্ম্ম এখনও শেষ হয় নাই, শেষ হইলেই এই অনিত্য সংসার পরিত্যাগ করিয়া আমার নিত্যধামে গমন করিবে তজ্জন্য কোন চিন্তা নাই। এখন তোমাদের অবশিষ্ট কর্ম্মের ব্যবস্থা আমি করিয়াদিতেছি শুন—এই বলিয়া তিনি ঐ যুবকের পতিব্রতা পত্নীর ছায়া হইতে ঐ পতিব্রতার সমগুণশালিনী এক অতি রূপবতী যুবতী কামিনী সৃজন করিলেন এবং উহার নাম রক্ষা করিলেন "ছায়াময়ী"। ঐ ছায়াময়ীকে ঐ বৈশ্য সন্তানের হস্তে সম্প্রদান করিয়া বলিলেন, এই কামিনীই তোমার সহ-ধর্ম্মিণী। ইহার গর্ভে তোমার ঔরসে একটি মাত্র সত্বগুণ প্রধান অতিধার্ম্মিক ও বুদ্ধিবল সম্পন্ন বিদ্বান পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করিবে। যথা সময়ে সেই সন্তান উপযুক্ত হইলে তাহাকে সংসারে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাহার হস্তে সংসার ন্যস্ত করিয়া, যখনই আমার নিত্যধামে আসিতে ইচ্ছা হইবে তখনই এই কল্পবৃক্ষ মূলে উপবেশন করিবে করিবামাত্রই আমার নিত্যধাম দেখিতে পাইবে এবং অনায়াসে এই মনুষ্যদেহেই তথায় গমন করিতে সমর্থ হইবে। যুবককে বলিলেন এই সাধ্বী পতিব্রতা পত্নী হইতে তুমিও অতি শান্ত, দান্ত ও সুলক্ষণাক্রান্ত কুল-

গৌরব বর্দ্ধনকারী দুইটি পুত্র সন্তান লাভ করিবে। কালে উহারা উপযুক্ত হইলে, উহাদের হস্তে সমস্ত ন্যস্ত করিয়া ইচ্ছামত এই বৃক্ষমূলে সমাগত হইলেই আমার নিত্যধামে গমন করিবে। তোমাদের পত্নীদ্বয়ও কর্ম্মান্তে সকায়ায় তোমাদের সহগমনে সমর্থা হইবে। ইহাই আমি স্থির করিয়া দিলাম। অত-এব তোমরা এই লক্ষ্মী স্বরূপা জায়া সমভিব্যাহারে লইয়া স্ব স্ব গৃহে গমন পূর্ব্বক সুখস্বচ্ছন্দে কাল যাপন কর। আমার যাচিঞা কেবল পরীক্ষা মাত্র।

এই কথা শুনিয়া যুবক ও যুবকপত্নী এবং কৃষক ও কৃষকপত্নী উহাঁর পদ-তলে দণ্ডের ন্যায় পতিত হইয়া পুনরায় স্তবস্তুতি করিতে লাগিল এবং করযোড়ে অতি বিনীতভাবে এই প্রার্থনা করিতে লাগিল যে, আপনার আদেশ মত সংসারে প্রবৃত্ত হইতে প্রস্তুত আছি কিন্তু আপনার কৃপায় সংসারের ভাব যেন আমাদিগকে স্পর্শ না করে। কৃষক বেশধারী হরি তাহাদের কৃত সৎকার ও স্তবস্তোত্রে পরম সন্তুষ্ট হইয়া তথাস্তু বলিয়া তথা হইতে অন্তর্হিত হইলেন। উহারাও স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক তাঁহার আদেশ মত কার্য্য করিতে লাগিল।

এই উপখ্যানের সার মর্ম্ম হইল এই যে,মন বশীভূত হইলেই, বিবেক বৈরাগ্য ও অকিঞ্চনতা গুণে অকিঞ্চন গোচর ভগবান বশীভূত হইয়া থাকেন, কারণ ভগ-বানই হইলেন জীবের মন ও চৈতন্যস্বরূপ। একথা ভগবান স্বয়ংই জগজ্জীবকে শিক্ষাদিবার জন্য অর্জ্জুনকে উপলক্ষ করিয়া বলিয়াছেন—

"ইন্দ্রিয়ানাং মনশ্চাস্মি ভূতানামস্মিচেতনা।" (গীতা দশম অঃ)

বিত্তৃষা

"মূঢ় জহীহি ধনাগম তৃষ্ণাম্।
কুরু তনুবুদ্ধে মনসি বিতৃষ্ণাম্॥
যল্লভসে নিজ কর্ম্মোপাত্তম্।
বিত্তং তেন বিনোদয় চিত্তম্॥"

মূঢ়! ধন লোভ তৃষ্ণা কর পরিহার। অল্পমতি! কর মনে বৈরাগ্য সঞ্চার॥
আপনার কর্ম্মফলে লভিবে যে ধন। তাহাতেই কর নিজ চিত্ত-বিনোদন॥"

ধন লোভ-তৃষ্ণা প্রাণ ঘাতক বারি তৃষ্ণা অপেক্ষা যে অধিক অনিষ্টকারী তাহা বোধহয় জ্ঞানবান ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করিতে কোন অংশে কুণ্ঠিত নয়। জল পিপাসা উপস্থিত হইলে, জলপানে তাহার শান্তি হয়; কিন্তু ভীষণ

ধনলোভ পিপাসা যখন উপস্থিত হয়, তখন আশাতীত ধনলাভেও তাহার শান্তি না হইয়া প্রত্যুত উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই হইয়া থাকে। প্রমাণ শাস্ত্রবাক্য যথা :—

"নিঃস্বোপ্যেক শতং শতীদশ শতং লক্ষং সহস্রাধিপো।
লক্ষেশ ক্ষিতিপালতাং ক্ষিতিপতিঃ চক্রেশতাং বাঞ্ছতি ॥
চক্রেশ সুররাজতাং সুরপতি ব্রহ্মাস্পদং বাঞ্ছতি।
ব্রহ্মা শিবপদং শিববিষ্ণু পদং তৃষ্ণাবধি কো গতঃ ॥"

অর্থাৎ--দরিদ্র ব্যক্তি প্রথমে শত মুদ্রা ইচ্ছা করে, শত মুদ্রা হইলেই হাজারের অভিলাষ হয়, সহস্রপতি হইলে লক্ষপতি হইতে ইচ্ছা করে, লক্ষেশ্বর হইলে রাজ্য ইচ্ছুক হয়, রাজা হইলে চক্রেশ্বর হইতে ইচ্ছা করে, চক্রেশ্বর হইলে, ইন্দ্রত্ব লাভের ইচ্ছা হয়, ইন্দ্রত্ব প্রাপ্ত হইলে ব্রহ্মপদ বাঞ্ছা করে, ব্রহ্মা শিবপদ, শিব বিষ্ণুপদ আকাঙ্ক্ষা করে, এইরূপ তৃষ্ণা বাড়িয়াই যায়। তৃষ্ণার শেষ কোন্ ব্যক্তি প্রাপ্ত হইয়াছে?

সামান্য ধন-লোভ তৃষ্ণার শেষ না হওয়ায়, মূঢ়তা নিবন্ধন জীবের চৈতন্য লোপ হয়, ঐশ্বর্য্য মদে অন্ধ লইয়া যায় ও ন্যায় অন্যায় বিচারে অসমর্থ হইয়া প্রতি পদেই যথেষ্ট অনিষ্ট সাধন করিতে থাকে। এমন কি নর নারী কুৎসিত পাপ কার্য্য সমূহও সম্পাদন করিতে ভীত বা কুণ্ঠিত হয় না। অবশেষে ঐ সমস্ত গর্হিত কার্য্যের ফলে বিবিধ প্রকারে বিপন্ন হইয়া ঐশ্বর্য্যচ্যুত হইতে থাকে ও ক্লেশরাশি ভোগ করিতে করিতে ইহকাল ও পরকালের সুখ হইতে বঞ্চিত হয়। অতএব অর্থ উপার্জ্জন করিবার সময়ে, অর্থ যে সকল প্রকার অনর্থের মূল তাহা বিবেচনা করিয়া ন্যায়ত যাহা উপার্জ্জিত হয়, তাহাতেই বৈরাগ্যের সহিত সন্তোষ লাভ করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণ অর্থ তত্ত্ব আলোচনা করিয়া ক্লেশমূল অর্থকে ধিক্কার দিয়া তাই বলিয়াছেন যে—

"অর্থনামর্জ্জনে ক্লেশস্তথৈব পরিরক্ষণে।
নাশে দুঃখং ব্যয়ে দুঃখং ধিগর্থান ক্লেশকারীনঃ ॥"

যে অর্থের উপার্জ্জন করিতে দুঃখ পাইতে হয়; উপার্জ্জিত হইলে, রক্ষা করিতে দুঃখ পাইতে হয়, কষ্টে রক্ষা করিতে করিতে নষ্ট হইলে দুঃখ পাইতে হয়; এমন কি ব্যয়ের নিমিত্ত যে অর্থের উপার্জ্জন আবশ্যক, সেই অর্থ ব্যয় করিতেও যখন কষ্ট বোধ হয় তখন সকল ক্লেশের মূল অর্থকে ধিক্।

অতএব লোভ পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্ব স্ব কর্ম্মফলানুযায়ী জীবন যাপনোপযোগী অর্থলাভেই চিত্ত বিনোদন করা আমাদের উচিত। জীবিকা নির্ব্বাহের

নিমিত্ত বা সুখ বিলাসিতা বৃদ্ধির জন্য অধর্ম্মাচরণ পূর্ব্বক অর্থ উপার্জ্জন ও সঞ্চয় করা কদাচই বিধেয় নহে। অধিক কি বলিব বিবেচনা করিয়া দেখিলে গ্রাসাচ্ছাদনোপযোগী বিত্তের নিমিত্তও আমাদের চিন্তা করিবার আবশ্যক নাই। কারণ দেখিতে পাওয়া যায় যে, এই জগতে গমনাগমনে অক্ষম নিশ্চেষ্ট তরুলতাদি উদ্ভিদগণও জীবিত আছে এবং অর্থ উপার্জ্জনে অসমর্থ গ্রাম্য ও বন্য, পশু পক্ষী কীট পতঙ্গাদি জীবজন্তুগণও সুখ স্বচ্ছন্দে আহার বিহারাদি করিয়া বিচরণ করিতেছে। সুতরাং উহাদের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট জ্ঞান বিশিষ্ট জীব মানব সমূহের অভাবমোচনকারী বৈরাগ্যকে অবলম্বন করিয়া ধনলোভ তৃষ্ণা পরিহার পূর্ব্বক জীবন যাপন করা কি কর্ত্তব্য নহে? অবশ্যই কর্ত্তব্য। ভোজন আচ্ছাদনের জন্য বৃথা চিন্তা করিবার কোনই প্রয়োজন নাই। কারণ যিনি বিশ্বম্ভর নাম ধারণ করিয়া প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড সমূহের জীব সকলকে ভরণ পোষণ করিতেছেন, তিনি কি বৈরাগ্যগুণ বিশিষ্ট জীব শ্রেষ্ঠ মনুষ্যকে ভরণ করিবেন না? অবশ্যই করিবেন। করিবেন কেন—ভরণ করিতেছেন তিনিই, পরন্তু অহঙ্কার অর্থাৎ অবিদ্যা সম্ভুত দেহাত্ম বুদ্ধিতে অভিভূত হইয়া আমরা তাহা বুঝিয়াও বুঝিতেছি না। কৃতজ্ঞতা সহকারে দিনান্তে একবারও মুহূর্ত্তের জন্য মনোনিবেশ পূর্ব্বক তাঁহাকে স্মরণ করিতেছি না। নিরন্তর কেবল বিষয় আন্দোলনেই কালযাপন করিতেছি। কাজে কাজেই বিষয়-তৃষ্ণার শান্তি কিছুতেই হইতেছে না।

"ভোজনাচ্ছাদনে চিন্তাং বৃথা কুর্ব্বন্তি বৈষ্ণবাঃ।
যোঽসৌ বিশ্বম্ভরো দেবঃ স কিং ভক্তানুপেক্ষতে॥"

অতএব বিশ্বম্ভর শ্রীভগবানে অকপটে ও সরল প্রাণে সকল ভার অর্পণ পূর্ব্বক স্ব স্ব কর্ম্মফল-লব্ধ বিত্ততেই চিত্তকে সন্তুষ্ট রাখিয়া ধনলোভ তৃষ্ণাকে পরিহার করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

বর্ণানুক্রমিক শ্রীকৃষ্ণ-স্তোত্র

অক্ষয় অব্যয় কৃষ্ণ করুণা নিধান।
অনাদি অনন্তরূপী স্বয়ং ভগবান॥
আদিত্য মণ্ডলে যিনি সূর্য্য নাম ধরি।
আঁধার বিনাশ করেন খ-কর বিতরি॥

ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা দেব হৃষীকেশ।
ইন্দ্রদর্প খর্ব্বকারী দৈত্যারি রমেশ॥
ঈশানের ইষ্টদেব যিনি সর্ব্বময়।
ঈক্ষণে যাঁহার হয় সৃষ্টি স্থিতি লয়॥

উদর হইতে যাঁর ব্রহ্মাণ্ড নিচয়।
উদয় হইয়া পুনঃ তাতে হয় লয়॥
ঊর্দ্ধ অধঃ দশ দিকে যাঁহার বিভূতি।
ঊর্দ্ধরেতা সাধুগণ যাঁরে করে স্তুতি॥
ঋত ঋদ্ধ রূপে যিনি পালেন জগৎ।
ঋষি মুনি সবে যাঁর নমে দণ্ডবৎ॥
ৠরূপে যিনি সর্ব্ব মঙ্গলের আলয়।
ৠরূপে যিনি শেষে বিশ্ব করেন লয়॥
ঌর সহ নদাদি সাগর সমুদয়।
ৡলাবৎ লীলাময় দেহে হয় লয়॥
এর সহ সর্ব্বভূত করিয়া সৃজন।
এ হইয়া পুনঃ সর্ব্ব করেন পালন॥
ঐ হইয়া শেষে যিনি করেন সংহার।
ঐ প্রকার সৃষ্টি স্থিতি লয় বারেবার॥
ও হইয়া হন যিনি সৃষ্টির কারণ।
ঔরূপে জগতে পুনঃ দেন দরশন॥
কর কায়মনোবাক্যে কৃষ্ণে নমস্কার।
করুণাসাগর যিনি প্রকৃতির পার॥
খলতা ত্যজিয়া ঋজু হও শীঘ্রকরি।
খলে দয়া কভু নাহি করেন শ্রীহরি॥
গণ্ডগোলে পণ্ডশ্রম করি বার বার।
গলেতে মায়ার ফাঁস কেন পর আর॥
ঘন ঘন যাতায়াতে ক্লান্ত না হইয়া।
ঘনশ্যাম রাধাকান্তে ডাক না বসিয়া॥
ঙয়ার লাগিলা ঙয়া দিয়াছ ছাড়িয়া।
ঙয়া যে কুণ্ডলী কৃষ্ণ গিয়াছ ভুলিয়া॥
চরমের চতুরতা বিষয়ে বিরাগ।
চতুর সে জন যাঁর কৃষ্ণে অনুরাগ॥
ছাড়ি দারাপত্য বিষ বিষয়ে বিলাস।
ছলনা ত্যজিয়া কর কৃষ্ণ পদে আশ॥

জনম হইলে আয়ু ক্ষয় দিনে দিনে।
জীবন বিফল হয় কৃষ্ণ সেবা বিনে॥
ঝঙ্কারী ঝঞ্ঝাট ভোগ সংসারের তরে।
ঝাপ দাও শীঘ্র কৃষ্ণ-করুণা সাগরে॥
ঞতে স্বধর্ম্ম ভ্রষ্ট দ্রষ্টব্য অভিধানে।
সব ত্যজি ভজ কৃষ্ণ গীতার প্রমাণে॥
টল টলে আয়ু পদ্ম পত্রাম্বু সমান।
টেনে টুনে শীঘ্রকৃষ্ণ পদে কর দান॥
ঠিক ক'রে মন প্রাণ কৃষ্ণতে গছিলে।
ঠিক জেনো ঠকিতে না হয় কোন কালে
ডর নাহি রবে কিছু শমন শঙ্কার।
ডরিবে শমন মন দর্শনে তোমার॥
ঢাল খাঁড়াধারী কত দূত তব সাথে।
ঢঙ্গেতে চলিবে তব রক্ষা হেতু পথে॥
ণত্ব ষত্ব শুদ্ধাশুদ্ধ বিচার না করি।
নত ভাবে ভজিলে ভজিবেন শ্রীহরি॥
তাই বলি ভাবে কৃষ্ণ করহ ভজন।
তরাবেন অন্তে দিয়া অভয় চরণ॥
থাকিতে সময় মন ডাক কৃষ্ণ বলি।
থেকনা অলস হ'য়ে আসিয়াছে কলি॥
দিবা নিশি নাম জপ নাম কর সার।
দানধ্যান যজ্ঞাদিতে গতি নাহি আর॥
ধন জন যৌবনাদি ক্ষণেকের জন্য।
ধন্য হও নাম ল'য়ে সার করি দৈন্য॥
নামের মহিমা কভু বলা নাহি যায়।
নামে দৃঢ়া মতি হ'লে নামী পাওয়া যায়॥
পাইলে নামীকে হয় সংসারের ক্ষয়।
পাপতাপ ঘুচে মন সুনির্ম্মল হয়॥
ফল্গুবৎ হয় জ্ঞান দেহাদি স্বজন।
ফলাকাঙ্ক্ষা যায়, ঘোচে সংসার বন্ধন॥

ব্রহ্ম পদ তুচ্ছ হয় মুক্তি হয় শুক্তি।
ব্রজভাবে কৃষ্ণ ভজনের হয় শক্তি ॥
ভজ মন ভগবানেশুদ্ধা ভক্তি দিয়া।
ভব সিন্ধু হবে পার গোষ্পদ ভাবিয়া ॥
মদন মোহন কৃষ্ণ রাস-লীলা ছলে।
মথিল কন্দর্প দর্প অতি অবহেলে ॥
যদি মন স্মর-শর চাহ এড়াইতে।
যতন করহ কৃষ্ণ পিরীতি পাইতে ॥
রাখ রাধা-রমণ চরণে রতিমতি।
রবেনা দুর্গতি শুদ্ধা হবে ভ্রষ্টা মতি ॥
লোভ মোহ আদি করি রিপু ছয় জন।
লইয়া না যাইবেক কুপথে কখন ॥
বদনেতে সদা ভাই কৃষ্ণ কৃষ্ণ বল।
বলিতে বলিতে ব্রজ-পথ পানে চল ॥
শান্তিময় কৃষ্ণ সর্ব্ব শান্তির আকর।
শ্যামল সুন্দর রূপ অতি মনোহর ॥
ষড়ৈশ্বর্য্যশালী কৃষ্ণ মুরলী বদন।
ষড়্দরশন যার করে অন্বেষণ ॥
সদানন্দ সদানন্দে থাকে যার নামে।
সেবিলে যাঁহার পদ সুখ পরিণামে ॥
হর হরি এক করি ভজ সদা মন।
হবে সৎগতি দুঃখ হইবে মোচন ॥

ক্ষণ-প্রভা সম এই জীবন যৌবন।
ক্ষয় না করিয়া কর কৃষ্ণের ভজন ॥
বর্ণ অনুক্রমে কৃষ্ণ স্তোত্র হ'ল সায়।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বল মন দিন বৃথা যায় ॥
আদি বর্ণ স্বর, তার সাহায্য ব্যতীত।
ব্যঞ্জন যেমন নাহি হয় উচ্চারিত ॥
তেমতি জানিবে এই বিশ্ব চরাচর।
কৃষ্ণের অস্তিত্বে হয় নয়ন গোচর ॥
কৃষ্ণময় জগৎ দেখিতে যদি চাও।
ভক্ত্যাঞ্জন গাঢ় করি নয়নে লাগাও ॥
ভক্তি বিনা কলিযুগে নাহি গত্যন্তর।
ভক্তি ভাবে কৃষ্ণ নাম জপ নিরন্তর ॥
শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তম ভকত যেমন।
সংসারে আর কেহ নাহিক তেমন ॥
ব্রহ্মা শিব সঙ্কর্ষণ শ্রীপর্য্যন্ত করি।
ভক্তের সমান জ্ঞান না করেন হরি ॥
আত্মাও তাঁহার তত প্রিয়তম নয়।
উদ্ধবে শ্রীকৃষ্ণ স্পষ্ট করিয়া কহয় ॥
অতএব জেনো মন কৃষ্ণাশ্রয় বিনে।
কোথাও নিবৃত্তি নাহি এ তিন ভুবনে ॥
এই নিবেদন কৃষ্ণ তোমার নিকটে।
কর ত্রাণ ভূপতিরে এ ভব সঙ্কটে ॥

শ্রীভূপতিচরণ বসু।

উপরোক্ত পদ্যস্থিত কতিপয় দুরূহ শব্দ ও অক্ষরের আভিধানিক অর্থ।

স্বকর=নিজ কিরণ। ঋত=পরব্রহ্ম। ঋদ্ধ=বিষ্ণু। ৠ=শিব। ৠ=সংহার কর্ত্তা, মহাদেব। এ=বিষ্ণু। ঐ=রুদ্র। ও=ব্রহ্মা। ঔ=অনন্ত। ঙ=বিষয় স্পৃহা। ভাবে=অনুরাগে। দৈন্য=কাতরতা। ফল্গুবৎ=অসারবৎ। গোষ্পদ= গরুর ক্ষুর দ্বারা খনিত গর্ত্ত। স্মর-শর=কন্দর্পের বাণ। ক্ষণপ্রভা=বিদ্যুৎ। ব্যঞ্জন=ব্যঞ্জনবর্ণ।

"রাখে হরি ত মারে কে!"

ঐই কথাটী ধ্রুব সত্য। গত কয় দিবস পূর্ব্বে যে ঘটনাটী ঘটিয়াছে তাহাতে ইহার সম্যক উপলব্ধি হয়। 'শিউচরণ সাউ' একজন গাড়োয়ান, সে গরুর গাড়ী হাঁকে, তাহার বাটী উত্তর পশ্চিম প্রদেশের মৃজাপুর জেলায়। সে এদেশে অন্যান্য গাড়োয়ানের সঙ্গে একটী খোলার ঘর ভাড়া করিয়া থাকে। খোলার ঘরেরই একপাশে একটী একচালার মতন আছে তাহাতে তাহার বলদ জোড়াটী থাকে, গাড়ী কখন সদর রাস্তার ধারে কখন বা নর্দ্দামায় পড়িয়া থাকে। প্রাতে উঠিয়া সে তাহার গাড়ী লইয়া তাহার বাসা হইতে বাহির হয়, সারাদিন ভাড়া খাটিয়া রোজগার করে, সন্ধ্যাবেলা আবার সে তাহার সেই খোলার ঘরে ফিরিয়া আসিয়া প্রথমে তাহার বলদের জাব দেয়, তারপর নিজে রন্ধনাদি করিয়া আহার করে। কোন দিন কোন সঙ্গী আসে ত কিছুক্ষণ দেশের গল্প করে, না হয় আহারাদির পর তাহার সেই ছারপোকা যুক্ত চারপাইএর উপর শয়ন করিয়া সেই সুদূর পশ্চিম প্রদেশের একটী গ্রামের একটী কুটীরের স্বপ্ন দেখিয়া রাত্রি প্রভাত করে। এদেশে তার দেশের ২।৪ জন লোক ব্যতীত আপনার জন বলিতে কেহই নাই। গত ৫।৬ দিবস হইতে সে এক ব্যক্তির পাঁজা ভাঙ্গিয়া ইট বহিবার ঠিকা লয়, পাঁজাটী নিকটস্থ জলার মাঝে। সেখান হইতে সে নিজেই পাঁজা ভাঙ্গিয়া গাড়ীতে ইট বোঝাই করে, পরে গাড়ী হাঁকাইয়া গ্রামের মধ্যে সেই ব্যক্তির বাটীতে খালাস করিয়া আবার সেই ইটের জন্য জলায় যায়। গত কল্য বেলা ৮টার সময় সে গাড়ী লইয়া জলায় যায়, সেখানে গরুগুলি ছাড়িয়া দিয়া গাড়ী পাঁজার নিকট রাখিয়া ইট ভাঙ্গিতে আরম্ভ করে। সবেমাত্র একখানি ইট টানিয়াছে এমন সময়ে হাতের আঙ্গুলে সেই পাঁজার ভিতর হইতে ভয়ানক সর্প দংশন করে। দংশন মাত্রেই সে তাড়াতাড়ি তাহার চাবুকের চামড়া দিয়া হাতের কব্জীতে নিজেই একটী বাঁধন দেয়, তাহার উদ্দেশ্য যে সর্পবিষ যাহাতে তাহার সমস্ত শরীরের ভিতর ব্যাপ্ত হইতে না পারে। বাঁধন দিয়া সে তৎক্ষণাৎ তাহার গাড়ীতে গরু জোড়াটী জুড়িয়া গাড়ী লইয়া গ্রামের মধ্যে আসিবার জন্য গরু হাঁকাইয়া দেয়। কিন্তু কতকদূর আসিয়া তাহার শরীর এত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে যে, সে গাড়ীতেই শুইয়া পড়ে। সেখানে গ্রামের ২।৩ জন বালক উপস্থিত ছিল,

তাহারা হঠাৎ গরুর গাড়ীতে বসিয়া বসিয়া গাড়োয়ানকে ঢলিয়া পড়িতে দেখিয়া গাড়ীর নিকট উপস্থিত হয় ও গাড়োয়ানকে কারণ জিজ্ঞাসা করে, সে অতি কষ্টে উত্তর দেয় যে, তাহার আঙ্গুলে সর্প দংশন করিয়াছে। এই বলিয়াই শিউচরণ তাহার গাড়ীর উপর একেবারে ঢলিয়া পড়ে। বালকেরা তখন পরামর্শ করিতে থাকে যে, কোন্ উপায়ে একজন সর্পচিকিৎসক রোজা পাওয়া যায়, কিন্তু এ প্রকারের লোক যেখানে সেখানে পাওয়া যায় না। কাজেই বালকেরা ইতস্ততঃ করিতেছিল। বালকদিগের পরোপকার বৃত্তি বৃদ্ধদিগের অপেক্ষা প্রবল, কিন্তু তাহাদের ত আর প্রবীনদের ন্যায় অভিজ্ঞতা নাই সুতরাং চট্ করিয়া একটা মীমাংসায় তাহারা উপনীত হইতে পারিতেছিল না। কিন্তু এদিকে সময়ও সংক্ষেপ, অধিকক্ষণ বিলম্বে রোগীর প্রাণনাশের সম্ভাবনা। ভগবান যাহাকে রক্ষা করেন, তাহার বিনাশ কোথায়? যখন বালকদের ঐ অবস্থা, শিউচরণ গাড়ীর উপর অচেতন, তখন সেই স্থানে একজন লোক আসিয়া উপস্থিত হইল। লোকটীকে দেখিতে সামান্য লোকের ন্যায়। একখানি আধময়লা উড়ানি কাঁধের উপর এবং পায়ে চটী জুতা ও হাতে একটা ছাতা, ছাতাটী তখনও খোলা হয় নাই বগলেই রক্ষিত। সে আসিয়াই গাড়োয়ানের অবস্থা বুঝিয়াছিল যে ইহাকে সর্পদংশন করিয়াছে, সে তৎক্ষণাৎ ঐ বালকদিগের দ্বারা গাড়োয়ানকে নিচে একটী বৃক্ষতলায় আনিয়া দাঁড় করাইল এবং বালকদিগকে বলিল "তোমরা ইহাকে এই প্রকারে কিছুক্ষণ ধর, আমি ইহার হাতের বাঁধন খুলিয়া দিয়া মন্ত্র পাঠ করিব।" অর্দ্ধঘণ্টা সময় মন্ত্র পাঠের পর ক্রমে শিউচরণের চৈতন্য হইতে লাগিল, ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই সে সুস্থ হইয়া গেল। তখন রোজা তাহাকে তাহার অবস্থা জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল "সামান্য দুর্ব্বলতা ভিন্ন অন্য প্রকার অসুস্থতা আর তাহার দেহে নাই।" সেই রোজা তখন শিউচরণকে সে দিবস কিছুমাত্র আহার করিতে নিষেধ করিল এবং তাহাকে আর কোন ভয় নাই বলিয়া আশ্বাস দিল। তারপর শিউচরণ তাহার গাড়ী লইয়া গন্তব্য স্থানে চলিয়া গেল। রোজাও চলিয়া যাইবার উপক্রম করায় পাড়ার অনেক লোক যাহারা ঐ সময়ের মধ্যে ঐ স্থানে জমায়েত হইয়াছিল তাহারা বিশেষ ভাবে ঐ রোজার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল কিন্তু সে কিছুতেই তাহা প্রকাশ করিল না। কেবল মাত্র সকলের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিল এবং বলিল "মহাশয় পরিচয় দিলে যখনই কোথাও ঐ প্রকার সর্পদংশন হইবে তখনি সকলে আমার জন্য আমার ঠিকানায় যাইবে কিন্তু আমি অধিকাংশ

সময় একস্থানে থাকিনা সুতরাং লোককে হতাস হইয়া ফিরিতে হইবে, অথচ আমার আশায় অন্য রোজার চেষ্টাও হইবে না, পরে যখন আমাকে পাওয়া যাইবার কোন সম্ভাবনা থাকিবে না দেখিবে, তখন অন্য চেষ্টা হইবে, ইতিমধ্যে অনেক স্থলেই এই অকারণ বিলম্বে রোগীর প্রাণনাশ হইবার সম্ভাবনা। হয়ত প্রথম হইতে অপর চিকিৎসকের অনুসন্ধান করিলে রোগীর মৃত্যু না হইতেও পারিত। আর মহাশয়গণ, যাহাকে শ্রীহরি রাখিবেন সে আমার মতন আর এক জনকে পাইবে। মনুষ্য ত উপলক্ষ মাত্র, যার কার্য্য তিনিই করেন।" উপরোক্ত কথার পর রোজা চলিয়া গেল। জনতার মধ্যে স্থানীয় পাঠশালার গুরুমহাশয় ছিলেন, তিনিও একজন ছোট খাট ওস্তাদ, অনেক মন্ত্র তন্ত্র জানেন, তাঁহার অভিমত যে, যেরূপ অবস্থায় রোগী উপস্থিত হইয়াছিল তাহাতে এত অল্প সময়ের মধ্যে রোগীকে এ প্রকার একেবারে আরোগ্য করা যে সে রোজার কর্ম্ম নহে, তবে শ্রীহরির দয়ায় সবই সম্ভব। আমরা মায়ামুগ্ধ, জীব, দয়াময় হরি হাতের কাছে আসিয়া ধরা দিতে চাহিলেও আমরা ধরি কৈ, বা পারি কৈ ?"

শ্রীসতীশচন্দ্র ঘোষ বাগুই

বৈষ্ণব-ব্রত-তালিকা।

(বঙ্গাব্দ ১৩২৮, চৈতন্যাব্দ ৪৩৬।৪৩৭।)

বৈশাখ।

শ্রীরামনবমী	৩রা শনিবার।
একাদশী	৫ই সোমবার।
শ্রীশ্রীবলদেবের রাসযাত্রা	৯ই শুক্রবার।
একাদশী	২০এ মঙ্গলবার।
অক্ষয় তৃতীয়া, শ্রীশ্রীকৃষ্ণের চন্দনযাত্রা	২৭এ মঙ্গলবার।
জহ্নুসপ্তমী	৩১এ শনিবার।

জ্যৈষ্ঠ।

একাদশী	৪ঠা বুধবার।
শ্রীশ্রীনৃসিংহচতুর্দ্দশী	৬ই শুক্রবার।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণের পুষ্প দোলযাত্রা	৭ই শনিবার।
একাদশী	১৯এ বৃহস্পতিবার।

আষাঢ়।

একাদশী	২রা বৃহস্পতিবার।
শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা	৬ই সোমবার।
একাদশী	১৭ই শুক্রবার।
শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা	২৩এ বৃহস্পতিবার।
শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের পুনর্যাত্রা	৩০এ বৃহস্পতিবার।
শয়নৈকাদশীর উপবাস মধ্যরাত্র ১২।৪১ মিনিটের পর শ্রীশ্রীহরির শয়ন চাতুর্মাস্যব্রতারম্ভ	৩১এ শুক্রবার।

শ্রাবণ।

একাদশী	১৫ই রবিবার।
একাদশী শ্রীশ্রীকৃষ্ণের ঝুলন যাত্রারম্ভ	২৯এ রবিবার।
শ্রীশ্রীকৃষ্ণের পবিত্রারোপণ	৩০এ সোমবার।

ভাদ্র।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণের ঝুলনযাত্রা সমাপন শ্রীশ্রীবলদেবের জন্মযাত্রা	২রা বৃহস্পতিবার।
শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমীব্রত	১০ই শুক্রবার।
একাদশী	১৩ই সোমবার।
শ্রীশ্রীরাধাষ্টমীব্রত	২৪এ শুক্রবার।
একাদশী (ব্যঞ্জুলী মহাদ্বাদশী) মধ্যাহ্নে শ্রীশ্রীবামনদেবের জন্মপূজাদি সায়ংকালে শ্রীশ্রীহরির পার্শ্বপরিবর্ত্তন	২৮এ মঙ্গলবার। পরদিন ২৯এ বুধবার প্রাতে ৭টার মধ্যে পারণ

আশ্বিন।

একাদশী	১২ই বুধবার।
শ্রীশ্রীরামচন্দ্রের বিজয়োৎসব	২৫এ মঙ্গলবার।

একাদশী	২৬এ বুধবার।
শ্রীশ্রীকৃষ্ণের শরৎরাসযাত্রা	৩১এ রবিবার।

কার্ত্তিক।

একাদশী	১০ই বৃহস্পতিবার।
গোবর্দ্ধনযাত্রা বা অন্নকূট	১৪ই সোমবার।
গোপাষ্টমী	২২এ মঙ্গলবার।
উত্থানৈকাদশী ভীষ্মপঞ্চকারম্ভ	২৫এ শুক্রবার।
ইংবেলা ১০।২৪ মিঃ গতে শ্রীশ্রীহরির উত্থান ও রথযাত্রা। চাতুর্ম্মাস্যব্রত সমাপন	২৬এ শনিবার।
শ্রীশ্রীকৃষ্ণের রাসযাত্রা	২৯এ মঙ্গলবার।

অগ্রহায়ণ।

একাদশী	৯ই শুক্রবার
একাদশী	২৫এ রবিবার।

পৌষ।

একাদশী	২৫এ সোমবার। (ক)
পুষ্যাভিষেক যাত্রা	২৯এ শুক্রবার।

মাঘ।

একাদশী	৯ই সোমবার।
বসন্ত পঞ্চমী—শ্রীশ্রীকৃষ্ণার্চ্চন	১৯এ বৃহস্পতিবার।
মাকরী সপ্তমী, শ্রীশ্রীঅদ্বৈত প্রভুর আবির্ভাবোৎসব	২১এ শনিবার।
ভৈমী একাদশী	২৫এ বুধবার।
শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাবোৎসব	২৭এ শুক্রবার।

ফাল্গুন।

একাদশী	১০ই বুধবার।
শ্রীশ্রীশিবরাত্রিব্রত	১৩ই শনিবার।
একাদশী	২৫এ বৃহস্পতিবার।
আমর্দ্দকীব্রত শ্রীশ্রীগোবিন্দার্চ্চন	২৬এ শুক্রবার।

শ্রীশ্রীগৌর পূর্ণিমা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভা-বোৎসব—শ্রীশ্রীকৃষ্ণের দোলযাত্রা ৪৩৭ চৈতন্যাব্দ আরম্ভ	২৯এ সোমবার।

চৈত্র।

একাদশী	১০ই শুক্রবার।
শ্রীরামনবমী	২৩এ বৃহস্পতিবার।
একাদশী	২৫এ শনিবার।
শ্রীশ্রীবলদেবের রাসযাত্রা	২৮এ মঙ্গলবার।

(ক) কোন কোন পঞ্জিকাতে পরদিন ২৬এ পৌষ জয়ন্তী মহাদ্বাদশী লিখিত হইয়াছে উহা সম্পূর্ণ ভ্রম। বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিতা যতিধর্ম্মপরায়ণা (বিধবা) দ্বিজপত্নীগণেরও এই নিয়মে উপবাস হইবে। কিছু জিজ্ঞাস্য থাকিলে ১৬১নং হ্যারিসনরোড, "সম্পাদক ভাগবত ধর্ম্মমণ্ডল" এই ঠিকানায় পত্র লিখিতে হইবে।

শ্রীনামদেব জী।

ভক্তমাল গ্রন্থে বহু ভক্তের জীবনী আছে, আমরা ক্রমে ২।১টী জীবনী ভক্ত পাঠকগণের নিকট উপস্থিত করিবার চেষ্টা করিব, আজ দাক্ষিণাত্য প্রদেশস্থ শ্রীরঙ্গপত্তনের নিকটবর্ত্তী কোন গ্রামের "নামদেব" নামক একজন পরম ভগবদ্ভক্ত সাধকের জীবনী সম্বন্ধে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম। ইহাঁর সম্বন্ধে ভক্তমাল গ্রন্থ ব্যতিত অন্য কোনও স্থলে বিশেষ কোনও আলোচনা দেখিতে পাওয়া যায় না কাজেই ভক্তমালের বর্ণিত মতানুসারেই আমরা যথা শক্তি আলোচনা করিব। *

নামদেবের জন্ম বৃত্তান্ত অতিশয় রহস্যপূর্ণ, ইহাঁর মাতামহের নাম বামদেব, ইনি জাতিতে ব্রাহ্মণ হইলেও ব্রাহ্মণেতর কোনও নীচকার্য্য দ্বারা কোন রকমে দিনপাত করিতেন। কিন্তু এত কষ্টের মধ্যেও তাঁহার ভগবদ্ভক্তির কিছুমাত্র ন্যূনতা দেখা যায় না। ভক্তমালে বর্ণিত আছে—

* বলা বাহুল্য "শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকা" হইতে এ সম্বন্ধে আমরা যথেষ্ট সাহায্য পাইয়াছি। (লেখক)

"বামদেব নাম সাধু ছিপি কর্ম্ম করি।"
কাল গুজরাণ্ করে কৃষ্ণে মন ধরি ॥

বামদেব কোথায় বিবাহ করেন তাহার কোনও বর্ণনা নাই। অল্প বয়সে ১টী মাত্র কন্যা রাখিয়া তাঁহার স্ত্রী পরলোক গতা হন। কন্যাটীও বিবাহের কিছুদিন পরেই বিধবা হয়। ভবিষ্যৎ বিষয় সম্পূর্ণ অজ্ঞাত মানব জানে না যে, কোন্ বিপদ সূত্র ধরিয়া পরম সম্পদের আবির্ভাব ধীরে ধীরে হইতে আরম্ভ হয়। এত দুঃখ কষ্টেও বামদেবের মন কখনও চঞ্চল হয় নাই কিন্তু কন্যাটীর বৈধব্য দশা দেখিয়া বামদেব যথার্থই অতিশয় কাতর হইয়া ছিলেন। বামদেবের গৃহে শ্রীবিগ্রহ সেবা বর্ত্তমান, তাহার আপন বলিতেত একমাত্র এই বিধবা কন্যা, কে সেবা চালাইবে, কিপ্রকারে সেবা চলিবে এই সব ভাবিয়া শেষে স্থির করিলেন যে, নিজের ঐ বিধবা কন্যাটীকেই প্রভুর সেবায় নিযুক্ত করিবেন। কালে তাহাই হইল। উপযুক্ত পিতার সুশিক্ষায় কন্যাটী অল্পদিন মধ্যেই ভগবানের সেবায় সুনিপুণা হইয়া উঠিল। কিছুদিন এই ভাবে যায় হঠাৎ—

"সেবা পরিচর্য্যা আদি করিতে করিতে।
কৃপা লেশ হৈল, হরি চাহে বর দিতে ॥"

ভগবান একদিন কন্যার নিকট প্রকট হইয়া উহাকে বর দিতে চাহিলেন। একে স্ত্রী জাতি তাহাতে অল্প বয়স, কিসে ভাল কিসে মন্দ হয় কিছুই জানে না শ্রীভগবানের বর দিতে চাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেও তাঁহার নিকট একটী পুত্র কামনা করিয়া বসিল, শ্রীভগবানও ভক্তের প্রার্থনা বুঝিয়া "তথাস্তু" বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন।

এ দিকে যে এত বড় একটা ঘটনা ঘটিয়া গেল বামদেব তাহার কিছুই জানিতে পারিলেন না। সময় কাহারও হাত ধরা নয়, সে অগ্রপশ্চাৎ কিছু না দেখিয়া সমান ভাবে অবিরাম গতিতে চলিয়া যায়। কালক্রমে বামদেবের সেই বিধবা কন্যার গর্ভে একটী পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করিল। এতক্ষণে বামদেবের চৈতন্য হইল। তিনি লজ্জায় মৃতপ্রায় হইয়া ভগবানের লীলা-রহস্য চিন্তা করিতে লাগিলেন। একদিন শেষ রাত্রিতে বামদের স্বপ্ন দেখিতেছেন যেন তাঁহার গৃহস্থিত শ্রীবিগ্রহ সচল অবস্থায় তাঁহার নিকট আসিয়া বলিতেছেন—

"মোর বরে তোমার কন্যার হৈল গর্ভ।
মোর আজ্ঞা তব যশ নাহি হবে খর্ব্ব ॥"

আরও বলিলেন—

"তব কন্যা দুষ্টা নহে লজ্জা নাহি পাবে।"

বামদেব চমকিত হইয়া একেবারে উঠিয়া বসিলেন। মনে মনে বলিতে লাগিলেন এ কি ঠাকুর! এ কি খেলা, সত্য সত্যই কি এই অধমকে লইয়া তোমার লীলা মাহাত্ম্য প্রচারের সূচনা করিয়াছ।" তাড়াতাড়ি শয্যা ত্যাগ করিয়া প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন পূর্ব্বক নবজাত শিশুটীকে দেখিয়া আসিলেন, শ্রীভগবানের কৃপায় জন্ম হইয়াছে বলিয়া এবং কালে ইহার দ্বারা ভগবন্নাম মাহাত্ম্য প্রচার হইবে বুঝিয়া তাহার নাম রাখিলেন "নামদেব।"

বালক দিন দিন শশিকলার ন্যায় বর্দ্ধিত হইয়া অল্পবয়সেই নানা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইয়াছিলেন শুধু পণ্ডিত নয়, সর্ব্বজন সমাজে পরম ভাগবত বলিয়া পরিচিত হইলেন। সঙ্গী বালকগণ অন্যান্য ক্রিয়ায় রত হইত বটে কিন্তু নামদেব বাল্যকাল হইতেই শ্রীকৃষ্ণ সেবার অনুকূল নানাবিধ খেলায় সর্ব্বদা মগ্ন থাকিতেন। কিছুদিন এই ভাবে গেলে যথাশাস্ত্র বিধানে বামদেব নামদেবের উপনয়ন সংস্কার করিয়া দিলেন। এখন ইহার এক মহা আব্দার যে "আমি কৃষ্ণ সেবা করিব।" মাতামহ বামদেবও "একটু বড় হইলেই তোমাকে কৃষ্ণ সেবায় নিযুক্ত করিব" বলিয়া প্রতি নিবৃত্ত করিলেন।

একদিন বিশেষ কার্য্য বশতঃ বামদেব গ্রামান্তরে গমন করিতে বাসনা করিয়া শিশু দৌহিত্রেরে ডাকিয়া বলিলেন, বৎস!—

"দুই তিন দিন মুই পশ্চাতে আসিব।
ঠাকুরের সেবা পূজা দুগ্ধ খাওয়াইব॥

মাতামহের আদেশ শ্রবণে এতদিনে চিরবাঞ্ছিত শ্রীকৃষ্ণ-সেবার অধিকারী হইলেন এই ভাবিয়া নামদেব ক্রমে পবিত্র ও শ্রদ্ধাপুতঃ হৃদয়ে শ্রীবিগ্রহের পূজা সমাপন করিয়া দুগ্ধ আনয়ন পূর্ব্বক চুল্লির উপর সংস্থাপন করিলেন কিন্তু দুগ্ধ নাড়িয়া মিষ্টান্নাদি সংযোগ পূর্ব্বক শ্রীবিগ্রহকে নিবেদন করিতে হইবে সে কথা ভুলিয়া, সেবা প্রাপ্তি জনিত আনন্দে একেবারে বিভোর হইয়া গেলেন। এদিকে দুগ্ধ নষ্ট হইয়া যায় দেখিয়া নামদেবের—

"মাতা কহে বাপু দুগ্ধ হইল, উতার।"

মাতৃবাক্যে প্রকৃতিস্থ হইয়া দুগ্ধ উদ্বর্ত্তন পূর্ব্বক তাহাতে সর্করা খণ্ড উত্তম রূপে মিশ্রিত করিয়া শীতল করণানন্তর ঠাকুরের সম্মুখে রাখিয়া করজোড়ে বলিলেন "প্রভো, দুগ্ধ ভোজন কর"। বালক নামদেব জানিতেন না যে, তাহার

মাতামহ ঠাকুরের সম্মুখে ভোগের দ্রব্যাদি রাখিয়া নিবেদন করিয়া দিতেন তাহাতেই ঠাকুরের ভোজন হইত। নামদেব ভাবিলেন আমরাও যেমন হাতে তুলিয়া খাদ্যদ্রব্য ভোজন করি ঠাকুরও বুঝি তেমন করিয়াই ভোজন করেন। তাই কাতর ভাবে বলিতে লাগিলেন, প্রভো!—

"শ্রীহস্তে তুলিয়া পান কর কৃপা করি।"

নামদেব হাত জোড় করিয়া বিগ্রহের বদন পানে চাহিয়া আছেন কিন্তু বিগ্রহ দুগ্ধ ভোজনও করিতেছেন না কোন উত্তরও দিতেছেন না, তখন নামদেব ভাবিলেন বুঝি হাতে করিয়া ঠাকুরের মুখে তুলিয়া দিতে হয় তাই আবার বলিলেন, যদি তুমি নিজে তুলিয়া না খাও তবে—

"* * তুলিয়া মুঞি ধরোঁ শ্রীবদনে।"

তথাপি কোন উত্তর নাই দেখিয়া একটু উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন—

"মৃদু হাস্য কর দুগ্ধ নাহি খাও কেনে॥"

দাদা মহাশয় তোমাকে প্রত্যহ খাওয়াইতেন, আমি নূতন লোক আজ আমার নিকট খাইতে তোমার লজ্জা হইতেছে? আচ্ছা, আমি এই দুগ্ধ ও মিষ্টান্ন রাখিয়া বাহিরে গেলাম তুমি আনন্দে ভোজন কর। এই বলিয়া নামদেব শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে সমস্ত রাখিয়া বাহিরে গেলেন এবং বাহিরে বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন আমার সঙ্গে মাধবের পরিচয় নাই, তাই আমার সম্মুখে খাইলেন না এতক্ষণে বোধ হয় খাইয়াছেন। এই ভাবিয়া উঁকি মারিয়া দেখিলেন যেমন দুগ্ধ তেমনই রহিয়াছে। তখন যথার্থই বালক নামদেবের মনে বিশেষ দুঃখ হইল, ভাবিলেন দাদা মহাশয় ঠাকুরকে দুগ্ধ খাওয়াইতে বলিয়া গেলেন আমি তো খাওয়াইতে পারিতেছি না, দাদা মহাশয় আসিয়া আমাকে কি বলিবেন। একবার ভাবেন মাকে ডাকিয়া সকল ব্যাপার খুলিয়া বলেন—আবার ভাবেন না আর একবার বিশেষ করিয়া ঠাকুরকে বলিয়া দেখি, এইরূপ নানা প্রকার ভাবিতে ভাবিতে বিগ্রহের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন—"প্রভু! আমার দাদার নিকট তুমি সকলই খাও, আমি কি দোষ করিয়াছি যে, আমার নিকট খাইতেছ না, দাদা তোমাকে খাওয়াইবার কথা বলিয়া গিয়াছেন এখন যদি না খাও তবে দাদা আসিলে আমি তাঁহাকে কি বলিব। যদি নিতান্তই তুমি আমার দুগ্ধ না খাও তবে নিশ্চয় জানিও আজ আমি তোমার সম্মুখে প্রাণ ত্যাগ করিব।"

এত বলিয়াও যখন কিছু হইল না তখন বালক নামদেব একখানি ছুরিকা গ্রহণ পূর্ব্বক যেমন গলদেশে আঘাত করিতে যাইবেন অমনি ভাবগ্রাহী জনার্দ্দন

বামহস্তে বালকের হস্ত ধারণ করিয়া দক্ষিণ হস্তে সেই দুগ্ধ পান করিলেন। এবার আর নামদেবের আনন্দ ধরে না। তিনি ঠাকুরকে ভোজন করিতে দেখিয়া ভক্তি ভরে প্রণাম পূর্ব্বক অন্যান্য সেবার কার্য্য সমাপনান্তে অবশিষ্ট দুগ্ধ লইয়া প্রস্থান করিলেন। এই ভাবে তিন দিন শ্রীবিগ্রহের সেবা করিলে তাঁহার মাতামহ বামদেব গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া নামদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন "বৎস নামদেব! ঠাকুর সেবার কোন বিঘ্ন হয় নাই তো?" দাদা মহাশয়ের প্রশ্ন শুনিয়া—

"নামদেব কহে ঠাকুরেরে খাওয়াইয়া।
প্রসাদ রাখ্যাছি ধর্য়া তোমার লাগিয়া॥"

এই বলিয়া শ্রীবিগ্রহের সেবাবশিষ্ট দুগ্ধ মাতামহ বামদেবের সম্মুখে রাখিলেন।

বামদেব দেখিয়া বলিলেন "ঠাকুর কি নিজে দুগ্ধ ভোজন করিয়াছেন, না তুমি খাইয়া অবশিষ্ট রাখিয়াছ?" বালক নামদেব এই কথা শুনিয়া ঠাকুর সেবা সম্বন্ধে যাহা যাহা ঘটিয়া ছিল আনুপূর্ব্বিক সমস্ত দাদা মহাশয়ের নিকট বলিলেন। কিন্তু বালকের কথায় বিশ্বাস করিতে না পারিয়া বামদেব বলিলেন "আচ্ছা আমায় দেখাইতে পার যে ঠাকুর নিজে হাতে দুগ্ধ ভোজন করিয়াছেন?" নামদেব বলিলেন "হাঁ কালই দেখাইব।"

পর দিবস পূর্ব্বের ন্যায় দুগ্ধ লইয়া নামদেব ঠাকুরের সম্মুখে রাখিয়া বলিলেন —"প্রভু ভোজন কর, আমার দাদা তোমার ভোজন করা বিশ্বাস করিতেছেন না, শীঘ্র ভোজন করিয়া দাদার ভ্রম দূর কর।" এই বলিয়া বালক ক্রন্দন করিতে লাগিলে ঠাকুর পূর্ব্ব পূর্ব্ব দিনের ন্যায় সেই দুগ্ধ গ্রহণ পূর্ব্বক ভোজন করিলেন। বামদেব দূর হইতে এই অদ্ভুত ব্যাপার দর্শন করিয়া আপনাকে শত শত ধিক্কার প্রদান পূর্ব্বক নামদেবকে বলিলেন "বৎস নামদেব! তুমিই যথার্থ ঠাকুরের প্রিয় সেবক, আমি এতদিন পর্য্যন্ত সেবা পূজা করিয়া যাহা করিতে পারি নাই তুমি মাত্র তিন দিন সেবা করিয়াই তাহা অনায়াশে করিয়াছ, ধন্য তোমার ভক্তি, আর ধন্য তোমার সেবা পরিপাটী। আজ হইতে তোমার উপরই শ্রীবিগ্রহের সেবার সম্পূর্ণ ভার রহিল, তুমি মনের মত তোমার ঠাকুরকে খাওয়াও। এই বলিয়া বামদেব প্রেম-বিহ্বল ভাবে বালক নামদেবকে আলিঙ্গন করিয়া শ্রীবিগ্রহের প্রতি চাহিয়া ভক্তি গদ গদ কণ্ঠে স্তবপাঠ করিতে লাগিলেন।

ক্রমশঃ

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গরূপ

আহা! ঢল ঢল চাহনি, অত্যুজ্জ্বল মুখ খানি,
পূর্ণচন্দ্র ক্ষয় হয় লাজে।
কিবা মনোহর রূপ, ভুবন রূপের ভূপ,
যেন কোটী কন্দর্প বিরাজে॥
এমন সুন্দর বপু, ত্রিভুবনে নাহি কভু,
আদি-প্রেম রসের মুরতি।
রূপ রসে মাখা মাখি, কি সুন্দর প্রেম-আঁখি,
শ্রীগৌরাঙ্গ নবদ্বীপ-পতি॥
অতি মনোহর বেশ, সুন্দর চাঁচর কেশ,
শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়েশ গৌরাঙ্গ।
কিবা সে সুন্দর নাসা, তুলনার নাহি ভাষা,
তুলনায় হয় ছন্দ ভঙ্গ॥
অতি শোভা যুগ্ম ভুরু, হৃদি করে দুরু দুরু,
কি সুন্দর গৌর গুণমণি।
কত সুধা গণ্ড দেশে, সদা মৃদু মৃদু হাসে,
ওষ্ঠ দ্বয় বিম্বফল জিনি॥
কত না সুন্দর গ্রীবা, উপমা দিব বা কিবা,
উপমেয় নাহি কদাচিত।
অপূর্ব্ব সে বক্ষদেশ, নেহারিলে প্রেমাবেশ,
ভব ক্লেশ হয় দূরীভূত॥
ভুজ যুগ সুশোভিত, তাহে আজানুলম্বিত,
কটিশোভা অতি নিরুপম।
উপমা না হয় শেষ, করী শুণ্ড উরুদেশ,
শ্রীগৌরাঙ্গ রূপ মনোরম॥

জিনি স্থল কোকনদ, অত্যুজ্জ্বল যুগ্ম পদ,
চন্দ্র জ্যোতি নখরে প্রকাশে।
শ্রীগৌরাঙ্গ রূপ রাশি, রূপ রসে মনমিশি,
দিবা নিশি রহ প্রেমাবেশে॥
গৌরচন্দ্র রূপ-সুধা, দূর করে ভব-ক্ষুধা,
নিত্যানন্দ হৃদে সদা রহে।
দাস নরোত্তম কহে, যতদিন প্রাণ দেহে,
থাকি যেন গৌর-রূপ-মোহে।

শ্রীনরোত্তম দাস অধিকারী

রয়দাসীসম্প্রদায়

রয়দাসী সম্প্রদায় প্রসিদ্ধ। এই রয়দাস রামানন্দ স্বামীর শিষ্য। ইঁহাকে শিখদের গ্রন্থে রবিদাস বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। রয়দাস জাতিতে চামার, সুপণ্ডিত ও সুলেখক বলিয়া ইনি প্রসিদ্ধ ছিলেন। স্বজাতি ভিন্ন অন্য কোনও জাতির মধ্যে ইহার বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল না। ভক্তমালে রয়দাসের জীবন-বৃত্তান্ত সবিশেষ বর্ণিত আছে। প্রবাদ, রয়দাসের রচিত কোনও কোনও গ্রন্থ গুজরাঠে শিখেরা আপন আপন আদি গ্রন্থের মধ্যে সন্নিবেশ করিয়াছেন। কাশীধামস্থ শিখেরা যে সকল স্তব ও গান পাঠ করে, তাহাদের অধিকাংশ রয়দাসের রচিত। ভক্তমাল ভিন্ন অন্য কোনও গ্রন্থে বা ইতিহাসে রয়দাসের বৃত্তান্ত পাওয়া যায় না। এ সম্প্রদায় কেবল নামেই পৃথক্, কিন্তু ইহাদের আচরণ ও সাধন-প্রণালীতে রামানন্দী সম্প্রদায়ের সহিত কোনও বিভিন্নতা নাই। সমস্তই রামানন্দী সম্প্রদায়ের অনুরূপ। এই সম্প্রদায় জাতিভেদ মানেন না। রামানন্দের মতানুসারেই ইঁহারা সাধন ভজন করেন।

ইঁহার জন্ম সম্বন্ধে একটি গল্প আছে। রামানন্দ স্বামীর একজন ব্রহ্মচারী-ব্রাহ্মণ শিষ্য পাঁচ জন ব্রাহ্মণের বাড়ীতে ভিক্ষা করিয়া আনিতেন। গুরু উহা রন্ধন করিয়া ভগবান্‌কে নিবেদন করিতেন ও নিবেদিত অন্ন স্বয়ং গ্রহণ করিতেন।

একদিন বৃষ্টির জন্য ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণ শিষ্য আর বাহির হইতে না পারিয়া এক বেনের প্রদত্ত দ্রব্য সামগ্রী গুরুর জন্য লইয়া আসেন। গুরু সেই বেনের দেওয়া সামগ্রী রন্ধন করিয়া ভগবান্‌কে নিবেদন করিলে ভগবান্ তাহা অশুচি বলিয়া প্রত্যাখ্যান করেন। রামানন্দ স্বামী অনুসান্ধন করিয়া জানিলেন, এই বেনের চামারের সঙ্গে টাকার দেনা পাওনা আছে। রামানন্দ এই ব্যাপারে ক্রোধান্বিত হইয়া শিষ্যকে অভিসম্পাত করিলেন যে, তুমি চামারীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিবে।

ব্রাহ্মণের তখনই মৃত্যু হয়। তিনি প্রতিবেশী এক চামারের ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর পূর্ব্ববৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া শিশু মাতৃস্তন্য পানে নিবৃত্ত হইল। শিশুর এই ঘটনায় সমস্ত পরিবার দীক্ষিত হইলে তখনই শিশু স্তন্য পান করিতে আরম্ভ করিল।

১৮ বৎসর বয়সে তিনি রামসীতার মৃন্ময়ী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া উপাসনা আরম্ভ করেন। রয়দাসের পিতা ইহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন। তিনি স্ত্রীকে লইয়া পর্ণকুটীরে অতি দরিদ্র অবস্থায় কাল যাপন করিতে আরম্ভ করেন। রয়দাস জুতা প্রস্তুত করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে থাকেন, এবং পূর্ব্ববৎ রামসীতার পূজা অর্চ্চনা আরম্ভ করেন। তিনি পরিব্রাজক সাধুসন্ন্যাসীর জন্য জুতা প্রস্তুত করিয়া দান করিতে লাগিলেন। এই সময় একজন সন্ন্যাসী তাঁহাকে একখানা পরশ পাথর দান্ করেন। পরশ পাথরের দিকে তাঁহার মন আকৃষ্ট হয় নাই। তিনি বলিতেন একমাত্র ঈশ্বরই সত্য, এবং তাঁর নামে আত্মোৎসর্গই একমাত্র কাজ। সন্ন্যাসী একথা শুনিয়া রয়দাসের জুতা-সেলাই করার যন্ত্র পাতি স্পর্শ করিয়া সোণা করিয়া দিলেন ও ঐ পরশ পাথর রয়দাসের ঘরে রাখিয়া গেলেন। রয়দাস পাথর ব্যবহারের জন্য মোটেই ইচ্ছুক হইলেন না। ত্রয়োদশ মাস পরে সাধুর বেশে স্বয়ং বিষ্ণু আসিয়া পর্ণকুটীরে পরশ পাথর দেখিয়া স্বর্ণ সৃষ্টি করিয়া গেলেন। তবুও রয়দাস প্রস্তাবিত ধন রত্ন গ্রহণ করিলেন না। কারণ তিনি ধন-রত্নের আসক্তিকে বড় ভয় করিতেন। পরে কৃষ্ণ স্বপ্নে তাঁহাকে দেখা দিয়া বলিলেন, রয়দাস! এ ধন রত্ন তোমার, হয় তুমি নিজে সম্ভোগ কর, না হয় এই ধনরত্ন দ্বারা ভগবানের সেবা কর। রয়দাস এতদিন পরে ধন রত্ন ভগবানের নামে গ্রহণ করিয়া বিরাট্ ধর্ম্মমন্দির নির্ম্মাণ করিয়া নিয়মিত পূজা অর্চ্চনা আরম্ভ করিলেন। (কাহারও মতে শ্রীরামচন্দ্রের কৃপাতেই তিনি ধনী হন।) ইহাতে ব্রাহ্মণেরা উত্তেজিত হইয়া রাজার কাছে

অভিযোগ আনয়ন করেন, এবং রয়দাসকৈ রাজ-সমক্ষে হাজির করেন। রয়দাস তাহার অলৌকিক শক্তি সামর্থ্যের পরীক্ষা দিতে আদিষ্ট হন। তাঁহার আদেশে শালগ্রাম স্থান পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার হাতে আসিয়া উপস্থিত হন। ইহার পরে চিতোরের রাণী ঝালী তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তীর্থযাত্রার পথে কাশী হইতে ফিরিবার সময়ে তিনি রয়দাসকে নিমন্ত্রণ করিয়া বিরাট্ ভোজ দেন। কিন্তু স্থানীয় ব্রাহ্মণেরা রাজ-প্রাসাদের এই নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিয়া বাগান বাড়ীতে বিশুদ্ধ ও শুচিভাবে দ্রব্য সামগ্রী লইয়া রান্না করিয়া খান। কেহ বলেন ফল মূল গ্রহণ করেন, রাঁধিয়া খান নাই। সহসা তাঁহারা দেখিতে পান যে, তাঁহাদের প্রত্যেক দুইজনের মধ্যে বসিয়া রয়দাস আহার করিতেছেন। ইহা দেখিয়া তাঁহারা অনুতপ্ত হইয়া রয়দাসের পদতলে পড়েন, এবং তাঁহার ধর্ম্ম-মতে অশ্রদ্ধা দূর করেন। তিনি গাত্রচর্ম্ম কাটিয়া দেখাইলেন যে ইহার নিম্নে তাঁহার ব্রাহ্মণের স্বর্ণ যজ্ঞোপবিত রহিয়াছে, এবং প্রমাণ করিলেন যে, পূর্ব্ব জন্মে তিনি ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি এই সময়ে দেহত্যাগ করেন ও স্বর্গে গমন করেন।

আর একটা গল্প আছে যে, এক সদ্বংশ-জাত ব্যক্তি রায়দাসকে দেখিতে যান। গিয়া দেখেন যে, গুরু তখন জাত ভাই চামারের সঙ্গে জুতা তৈয়ারী করিতেছেন। রায়দাসের সঙ্গে কি সব কথাবার্ত্তা বলিয়া একজন চামার এক পাটী জুতায় করিয়া জল লইয়া আসিল, এবং রায়দাস তাহার পা জুতার মধ্যে স্পর্শ করিয়া দিলে সকলে সেই পাদোদক গ্রহণ করিল। কিন্তু ঐ ভদ্রলোক ঐ চরণামৃত না খাইয়া মাথার উপর দিয়া ফেলিয়া দিলেন। কিঞ্চিৎ জল তাহার জামায় পড়িয়া শুকাইয়া গেল। বাড়ী আসিয়াই তিনি অত্যন্ত যন্ত্রণা অনুভব করিতে লাগিলেন। যে কাপড় চোপড়ে তিনি সাধু সন্দর্শনে গিয়াছিলেন, তাহা তিনি এক ঝাড়ুদারকে দান করিলেন। একদিকে ঝাড়ুদারের অতি অদ্ভুত রূপে উন্নতি হইল, অন্যদিকে ধনী ব্যক্তি কুষ্ঠ রোগগ্রস্ত হইলেন। অনেক চিকিৎসার পর ধনী ব্যক্তি চরণামৃতের আশায় রয়দাসের শরণাপন্ন হইলেন। কিন্তু রয়দাসের কৃপালাভে সমর্থ না হইয়া তিনি ভগ্ন মনোরথ হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। পুনর্ব্বার তিনি অনুনয় বিনয় করিয়া রয়দাসের কৃপাপ্রার্থী হইলে রয়দাস কৃপা প্রদর্শন করিলেন। ধনী ব্যক্তি দুরারোগ্য কুষ্ঠ ব্যাধি হইতে অব্যাহতি পাইলেন।

আরএকটা গল্প আছে যে, প্রতিবেশী একজন চামারের একটা গরু মরিয়া গেলে সেই গরু ভাগাড়ে ফেলিবার জন্য সে রয়দাসের সাহায্য চাহিল। রয়দাস

ভগবানের সাহায্যে গরু ভাগাড়ে ফেলিয়া দিলেন। সেখানে গরুর মাংস দুভাগ করা হইল, এবং রয়দাস গরুর মহাপ্রাণীকে মাটীর নীচে লুকাইয়া রাখিলেন। অবশেষে ভগবান্ আসিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, মরা গরুর কোনও অংশ সে লুকাইয়া রাখিয়াছে কি না? রয়দাস বলিলেন—না। বলিবামাত্র অমনি সেখানে কলাগাছ হইল, মোচা হইল, সেই মোচাটা মহাপ্রাণীর আকার হইল, মহাপ্রাণীর রং হইল।

আরএকটা গল্প আছে, বারণসীতে একব্রাহ্মণ এক যোদ্ধার জন্য তর্পণ করিতেন। একদিন রয়দাসের দোকানে ঐ ব্রাহ্মণ এক জোড়া জুতা কিনিতে যান। সেখানে গঙ্গা-পূজা সম্বন্ধে রয়দাসের সহিত অনেক কথাবার্ত্তা হয়। রয়দাস বলেন যে তিনি জুতাজোড়া অমনিই দিলেন। তারপরে বলিলেন আমার হইয়া আপনি এই সুপারিটী গঙ্গায় দিবেন? ব্রাহ্মণ সুপারী লইয়া আসিলেন বটে, কিন্তু সেদিনও সেই যোদ্ধা বন্ধুটীর জন্যই গঙ্গায় তিনি পূজা অর্চ্চনা করিলেন, রয়দাসের কথা একে বারেই ভুলিয়া গেলেন। পথিমধ্যে আসিয়া মনে পড়িলে তাড়াতাড়ি তিনি গঙ্গায় গিয়া রয়দাসের সুপারি গঙ্গায় নিক্ষেপ করিলেন। ব্রাহ্মণ আশ্চর্য্য হইয়া দেখিলেন, মা গঙ্গা তাঁহার হাত তুলিয়া ভক্তের দান গ্রহণ করিলেন। মা গঙ্গা কেন যে রয়দাসের ভক্তির দান হাত তুলিয়া গ্রহণ করিলেন, ব্রাহ্মণ তাহা বুঝিতে পারিলেন না।

রয়দাসের ভক্তেরা বিশ্বাস করেন যে তিনি ১২০ বৎসরে ব্রহ্মপদ লাভ করেন।

পঞ্চদশ শতকের প্রারম্ভে রয়দাস বারাণসীতে জন্মগ্রহণ করেন। এই রয়দাস রামানন্দ স্বামীর শিষ্য ছিলেন ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। রামানন্দের মত ও প্রভাবে তিনি প্রভাবান্বিত ছিলেন। কবিরের চেয়েও বোধ হয় ধর্ম্মবিশ্বাস তাঁর বিশুদ্ধ ছিল। তাঁর শিক্ষা ও উপদেশের প্রভাব এত অধিক ছিল যে তাঁহাকে উপদেষ্টা বা ব্রহ্মচারীর আসনে শিষ্যেরা বসাইয়া ছিলেন। সমগ্র পঞ্জাবের চামার সম্প্রদায়, বিশেষতঃ গিরগাঁও, রোহ্তক ও দিল্লী প্রভৃতি স্থানে বিশ বছরে তাঁর সহস্র সহস্র শিষ্য হয়।

রয়দাস ঈশ্বর হইতে আত্মাকে প্রভেদ করিতেন শুধু এই জন্যে সে আত্মাদেহকে আশ্রয় করেন। ঈশ্বরই সব। তিনি ভগবান্‌কে লাভের জন্য কৃচ্ছ্র সাধনেরও পক্ষপাতী। তিনি বিশ্বাস করেন যে, ভগবান্ জাতিধর্ম্ম

নির্ব্বিশেষে সকলের। একমাত্র ভগবানই মানুষকে সর্ব্ববিধ দুঃখ-ভোগ হইতে রক্ষা করিতে পারেন। ধর্ম্ম সংস্কারকগণের সাধারণ উপদেশের সহিত তাঁর শিক্ষার পূর্ণ সামঞ্জস্য আছে।

এই সম্প্রদায় অযোদ্ধায় ও আগ্রায় অনেক আছে। ১৮৯১ সালের আদম সুমারীতে এই সম্প্রদায়ের লোক সংখ্যা ৪১৭০০০ এবং ১৯০১ সালের সেন্সস্ রিপোর্টে ৪৭০০০ ইহাদের বিশেষ কোনও পবিত্র ধর্ম্ম গ্রন্থ নাই বটে, কিন্তু শিখগ্রন্থে এবং "রয়দাস জীকী বাণী" নামক (১৯০৪) একখানি সংগ্রহ-গ্রন্থ আছে। এই সংগ্রহ-গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় যে বেদ বা ব্রাহ্মণদের প্রচারিত হিন্দুধর্ম্ম অপেক্ষা রাম নামের গুণ-গানেই তাঁর শ্রদ্ধা, ভক্তি তিনি অর্পণ করিয়াছেন।

রয়দাস সাধু ও ধর্ম্মোপদেষ্টা হইলেও বিবাহিত জীবন যাপন করেন। নাভাদাস ভক্তমালে এই সমস্ত লিপিবদ্ধ করেন, প্রিয়দাসও লেখেন। ভক্তমালের সর্ব্বোৎকৃষ্ট সংস্করণ সীতারামশরণ ভগবান্ প্রসাদ প্রকাশিত (বেনারস ১৯০৫) ইহার সঙ্ক্ষিপ্ত বিবরণ এইচ, এইচ উইলসনের The sketch of the religious seets of the Hindus, london 1861 p 113 দ্রষ্টব্য। মূলগ্রন্থের সঙ্গে ঠিক মেলে না। রাধাকৃষ্ণ দাস সম্পাদিত ধ্রুবদাসের ভক্ত-নামাবলী গ্রন্থেও রয়দাসের কথা আছে। (নাগরী প্রচারিণী সভা, বেনারস ১০৯১) এখনও রয়দাসের বংশ বারাণসীতে আছে। ইঁহারা এখনও উপানৎ-কারের ব্যবসা করে।

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

শ্রীনামদেব জী

(২)

গত বারে আমরা নামদেব জীর অসাধারণ ভগবৎ সেবার পরিচয় পাইয়া বামদেবের অবস্থার বর্ণনা করিয়াছি—বামদেব শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে করজোড়ে বলিতে লাগিলেন—

"মৎসমো নাস্তি পাপাত্মা নাপরাধী চ কশ্চন।
পরিহারেঽপি লজ্জা মে কিং ব্রুবে পুরুষোত্তম॥

কদাহং যমুনাতীরে নামানি তব কীর্ত্তয়ন।
উদ্‌বাষ্পঃ পুণ্ডরীকাক্ষ! রচয়িষ্যামি তাণ্ডবন্॥
ভূমৌ স্খলিত পাদানাং ভূমিরেবাবলম্বনম্।
ত্বয়ি জাতাপরাধানাং ত্বমেব শরণং প্রভো॥
যস্ত্বহং নির্গুণা হীনা পাপিষ্ঠা শিশুদারুনা।
তথাপি জগতাং নাথ! ত্বমেব শরণং প্রভো॥
মদন্যা পাপচিত্তাহি বদন্তি নাস্তি ভূতলে।
তথাপি জগতাং নাথ! ত্বমেব শরণং প্রভো॥
হা কৃষ্ণ! করুণাসিন্ধো বন্ধুর্বন্ধোরিতিস্মৃতঃ।
জ্ঞাত্বা মাং সর্ব্বতো নাথ! ত্যক্তুং নার্হতি দুর্গতম্॥
মৎসমঃ পাতকী নাস্তি তৎসমো নাস্তি পাপহা।
ইতি বিজ্ঞায় গোবিন্দ যথাযোগ্যং তথাকুরু॥

বামদেব এই ভাবে ঠাকুরের নিকট বহুক্ষণ প্রার্থনা করিয়া বিদায় লইলে পর নামদেব অতিশয় নিষ্ঠা সহকারে শ্রীবিগ্রহের সেবা পূজা করিয়া নিজ জীবন পরমানন্দে যাপন করিতে লাগিলেন।

অনেকে মনে করেন কিছু অলৌকিক ভাব না দেখাইতে পারিলে ভক্তের মহিমা যেন সম্পূর্ণ দেখান হয় না, আমরা কিন্তু তাহা আদৌ ভাবি না, যিনি ভগবানের সঙ্গে এমন ভাবে প্রীতি সংস্থাপন করিয়া শ্রীভগবানকে একেবারে আপনার মত করিয়া লইতে পারিয়াছেন, যিনি দারু বা পাষাণ নির্ম্মিত বিগ্রহকে সচল ভাবে নিজে প্রত্যক্ষ করিতেছেন ও অপরকে করাইতেছেন, তিনি যে সামান্য জগতের জীবকে দু'একটা অলৌকিক ভাব দেখাইয়া স্তম্ভিত করিবেন তাহাতে আর বিচিত্র কি? যাহা হউক নামদেব সম্বন্ধে কথা হইতেছে তাহাই বলি।

সাধু নামদেব সম্বন্ধে যে সকল অদ্ভুত ঘটনার পরিচয় গ্রন্থ মধ্যে পাওয়া যায় আমরা তাহার ২।৪টী পাঠকগণের অবগতির জন্য ক্রমে বিবৃত করিতে চেষ্টা করিব।

নামদেব জী যখন জন্মগ্রহণ করেন তখন মুসলমানগণ সগর্ব্বে রাজত্ব করিতে ছিলেন, পাদ্‌শা নানাজনের নিকট নানাভাবে নামদেবের কাহিনী শুনিতে পাইতেন, একদিন কেমন কৌতুহল হইল যে নামদেবকে দিয়া কিছু অলৌকিক ভাব দেখিবেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাকে সংবাদ দিয়া আনা হইল,

পাদ্‌শার সঙ্গীগণ সকলেই যখন উপস্থিত, তখন তিনি নামদেবকে বলিলেন, দেখ, আমি বহুলোকের নিকট তোমার বিষয় অনেক ভাবের কথা শুনিতে পাই কিন্তু আমি নিজে প্রত্যক্ষ না করিতে পারিলে কেবল পরের মুখে শুনিয়া আমার কিছুই বিশ্বাস হইতেছে না তুমি আমাকে কিছু কেরামত দেখাইতে পার ? বিনয়ের আধার ভক্ত নামদেব বলিলেন, "যদি আমার কিছু কেরামতই থাকিবে তবে অতি সামান্য কার্য্য করিয়া দিনপাত করিব কেন, আমি কেরামত কিছুই জানিনা কেবল দাদা মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত শ্রীভগবানের বিগ্রহ সেবায় নিযুক্ত আছি।"

পাদ্‌শা ভক্তের মহিমা বুঝিতে পারিলেন না মনে করিলেন নামদেব বুঝি আমাকে তাচ্ছল্য করিল, এই ভাবিয়া ক্রোধে নানাপ্রকার কটুবাক্য বলিয়া তাঁহাকে কারারুদ্ধ করিবার আদেশ দিলেন,

প্রকৃত কথাও এই, কৃষ্ণ ভক্ত আপন মহিমা আপনি জাহির করিয়া লোক সমাজে "একজন" হইয়া থাকিতে চায় না। ভক্ত চায় কেবল সেবা, আর সেই কারণেই সর্ব্বদা তাহার হৃদয় দৈন্যে পরিপূর্ণ থাকে। কিন্তু ভক্ত না চাহিলেও ভগবান ভক্তের মহিমা অপ্রাকাশিত রাখিতে চান না; তিনি সামান্য বিষয়ও অতি বৃহৎ করিয়া দেখাইয়া তাহার ভক্তের মহিমা প্রকাশ করিয়া থাকেন। এখানে নামদেব নিজের শক্তি কিছু দেখাইতে অস্বীকার করিলেও সর্ব্বান্তর্য্যামী লীলা-ময় ভগবানের ইচ্ছায় এক অদ্ভুত ব্যাপার সংঘটিত হইল। যখন নামদেবকে কারাগারে লইয়া যাওয়া হয় তখন পথের ধারে একটী মৃত গোবৎস পড়িয়া ছিল তাহা দেখিয়া পাদ্‌শা পুনরায় নামদেবকে বলিলেন, "যদি এই বাছুরটীকে তুমি বাঁচাইতে পার তাহা হইলেই তোমার কেরামত জাহির হয়।" নামদেব পুনরায় করজোড়ে বলিলেন "আমিতো পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে আমি কোন কেরামতই জানিনা তথাপি আপনি আমাকে অনুরোধ করিতেছেন কেন ? জানিনা কৃষ্ণের কি ইচ্ছা।" এই বলিয়া নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও সেই বাছুরের নিকট গিয়া মনে মনে কৃষ্ণকে স্মরণ করিয়া একটী তুড়ি দিয়া বাছুরটীকে বলি-লেন—"বৎস! শীঘ্র উঠ, তুমি এখানে পড়িয়া রহিয়াছ আর তোমার মাতা তোমার জন্য ক্রন্দন করিতেছে, যাও শীঘ্র উঠিয়া মাতার নিকট যাও।" নাম-দেবের এই কথা কয়টী বলিবার পরই পাদ্‌শা ও অন্যান্য সকলে দেখিল বাছুরটী উঠিয়া চলিয়া গেল। পাদ্‌শা এই অদ্ভুত ব্যাপার দর্শনে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বিশেষ লজ্জিত ভাবে নামদেবকে নানাপ্রকার মিষ্ট বাক্য দ্বারা সন্তুষ্ট করিতে

লাগিলেন। এবং বিশেষ বিনীত ভাবে বলিলেন, "আমার অপরাধ হইয়াছে আমাকে মাপ করুন।

পাঠকগণ! এই ভাবের একটী ঘটনা কিছুদিন পূর্ব্বে আমরা সাধকের মন্ত্রশক্তি বলের পরিচয়ে লিখিয়া ছিলাম, কিন্তু এখানে কোনরূপ মন্ত্র তন্ত্র নাই এ শুধু অকপট চিত্তে সুদৃঢ় বিশ্বাসে ভগবদ্ভজনের ফল। অবশ্য ইহাই চরম নয় সাধকের এ সকল ক্ষমতা সিদ্ধি লাভের বহু পূর্ব্বেই ঘটিয়া থাকে তবে যে সাধক এই সকল পাইয়া ভজন সাধন ছাড়িয়া দিয়া লোক সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভের প্রত্যাশায় ঘুরিয়া বেড়ায় তাহাদের এই খানেই ইতি হয়। আর যাহারা এ সকল গ্রাহ্য না করিয়া উপাসনায় রত থাকে তাহারা এ সকল শক্তিতো পায়ই অধিকন্তু আনন্দ-রস-বিগ্রহ শ্রীভগবানের দর্শনে চির আনন্দ লাভে কৃত কৃতার্থ হইয়া থাকে। আমরা এমন অনেক স্থলে দেখিতে পাই যে কেহ কেহ এইরূপ দু'চারটা সিদ্ধাই ভাব দেখাইয়া জন সমাজে খুব পসার প্রতিপত্তি করিয়াছেন কিন্তু আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে বুঝিতে পারি না যে তাহাতে হইল কি।

যাহা হউক নামদেবের এই অলৌকিক কাণ্ড দর্শনে পাদ্‌শার সমস্ত সন্দেহ দূর হইল। তিনি যথার্থই নামদেবকে মহাপুরুষ জানিয়া অকপট ভক্তি করিতেন এবং সর্ব্বদা নিজের নিকটে রাখিবার চেষ্টা করিতেন। এই সময় আর এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটিল আমরা ভক্তমালের ভাষায়ই তাহার বর্ণনা করি—ভক্তমালে বর্ণিত আছে—

"হেনকালে বহু মূল্য পালঙ্ক বিছানা।
রঙ্গ স্থলে লইয়া আইল কোনজনা॥
বহু মূল্য চমৎকৃত দেখিয়া রাজন্।
নামদেবে ভেট করিবারে হৈল মন॥
অনেক যতনে তাঁর সম্মতি করিয়া।
দিলা লোক সব বহিয়া যাইতে লইয়া॥
তেঁহ বলে কিবা কাজ বাহক মনুষ্যে।
মুই মাথে করিয়া লইয়া যাব বাসে॥
ইহা কহি মাথায় উঠায়্যা লয়্যা যায়।
কিবা করে কোথা যায় রাজার সংশয়॥
ইসারা করিয়া লোক পাঠায় পশ্চাতে।
দেখে কথোদূরে এক বিস্তার নদীতে॥

টানমারি ফেলাইয়া চলে সাধু ঘরে।
লোক আসি শীঘ্র গতি কহয়ে রাজারে ॥"

পাদ্‌শা ভৃত্যগণের মুখে এই সমস্ত শ্রবণ করিয়া পুনরায় নামদেবকে ডাকিয়া বলিলেন "তুমি এমন বহু মূল্য দ্রব্য সকল নদীতে নিক্ষেপ করিলে কেন? পাদ্‌শার কথা শুনিয়া নামদেব হাসিতে হাসিতে বলিলেন উহা এমন কি বহু মূল্য যে তুমি উহার জন্য আক্ষেপ করিতেছ, যদি ঐ সকল দ্রব্য তোমার প্রয়োজন হয় তবে বল আমি পুনরায় তোমাকে উহা আনিয়া দিতেছি। এই বলিয়া নামদেব সে গুলি যে ভাবে লইয়া গিয়াছিলেন সেইরূপ শুষ্ক ভাবেই আনিয়া দিলেন পাদ্‌শা ব্যাপার দেখিয়া আশ্চর্য্যতো হইলেনই পরন্তু নামদেবের উপর বিশ্বাস ভক্তি আরও প্রগাঢ় হইল। সেই অবধি পাদ্‌শা সর্ব্বত্র প্রচার করিয়া দিলেন যে, যে কেহ নামদেবের কোনরূপ বিরুদ্ধাচরণ করিবে সে নিশ্চয়ই দণ্ডার্হ।

পাঠকগণ! আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, অলৌকিকত্ব প্রকাশ করিয়া ভক্তের মহিমা প্রচারে আমাদের ইচ্ছা নাই তথাপি যে গ্রন্থ অবলম্বনে আমাদের মহাপুরুষের চরিত্র আলোচনা করিবার সুযোগ হইয়াছে তাহাতে যতটুকু পাইয়াছি তাহা অলৌকিক হইলেও প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না। তাই পুনরায় নামদেবের বাসগ্রামের একটী কাহিনী পাঠকগণকে উপহার দিতে বাধ্য হইলাম। ভক্তমাল বলিতেছেন—

"আর কিছু শুন নামদেবের কথন।
সুপবিত্র গাথা হয় ভুবন পাবন ॥"

নামদেব যে গ্রামে বাস করিতেন সেই গ্রামে একজন ধনবান বণিক এক সময় তুলাদান ব্রত করিয়াছিল, সে নামদেবের অপূর্ব্ব কাহিনী সকল শ্রবণ করিয়া তাহাকে একজন পরম ভগবদ্ভক্ত সাধু পুরুষ জানিয়া কিছু স্বর্ণ দান করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করে, নামদেবের উহা গ্রহণে ইচ্ছা না থাকিলেও ভগবৎ প্রেরণায় নাম মাহাত্ম্য প্রকাশের জন্য দানগ্রহণ করিতে স্বীকার করিলেন, কিন্তু বণিককে বলিলেন, "আমি যতটুকু চাহিব তাহাই দিতে হইবে।" বণিক "তাহাই হইবে" বলিয়া আকাঙ্খার পরিমাণ জানিতে চাহিল। নামদেব বণিককে পূর্ব্ব হইতেই জানিতেন এবং ভগবন্নামে যে তাহার আদৌ বিশ্বাস নাই তাহাও তাঁহার বেশ জানাছিল তাই আজ বণিককে ভগবন্নাম মাহাত্ম্য প্রত্যক্ষ করাইতে মনস্ত করিয়া একটী তুলসীপত্রে কৃষ্ণনাম লিখিয়া বণিক ভবনে উপস্থিত হইয়া বলিলেন

"আমাকে ইহার তুল্য স্বর্ণদান করিলে আমি গ্রহণ করিব।" নামদেবের কথা শুনিয়া ও তুলসী পত্র দেখিয়া বণিক বলিল—

"তুলসীর সম স্বর্ণ রতি দুই হবে।
তাহা যে লইয়া তব কি কার্য্য হইবে॥"

বণিকের কথা শুনিয়া নামদেব বলিলেন—

"* * * ইথে যে কার্য্য হউক।
ইহা বিনা যে করিবে তাহে মোর দুঃখ॥"

নামদেবের ভাব দেখিয়া বিষয় বিমুগ্ধ বণিক প্রকৃত তত্ত্ব বুঝিতে না পারিয়া হাসিয়া বলিলেন—

"ভাল, তাহি দিব তব মনস্থ যে হয়ে॥"

এই বলিয়া তুলাদণ্ড আনয়ন করিয়া নামদেবের আনিত তুলসীপত্র এক দিকে স্থাপন করিয়া অন্যদিকে কিছু স্বর্ণ দিলেন, কিন্তু তাহাতে দণ্ড সমান না হওয়ায় আরও কিছু স্বর্ণ দিলেন কিন্তু কি আশ্চর্য্য তথাপিও ঠিক হইল না, ক্রমে তুলাদানের সমস্ত স্বর্ণ নিঃশেষ হইল, অতঃপর অন্তঃপুরস্থ মহিলাগণের অলঙ্কার আনিয়া দিতে লাগিলেন তাহাতেও অকুলান দেখিয়া প্রতিবাসীর নিকট কর্জ্জ করিয়া দিতে লাগিলেন কিন্তু কৃষ্ণের কি ইচ্ছা বলা যায় না কিছুতেই তুলাদণ্ড সমান হইল না, এতক্ষণে বণিক ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন, একটী তুলসী পত্রে এমন কি বস্তু আছে যাহাতে এত রাশি রাশি স্বর্ণও সমান হইল না, বণিকের মনে এবার যথার্থই হতাশভাব আসিয়াছে, সে আর স্বর্ণ সংগ্রহের চেষ্টা না করিয়া ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে সাধু নামদেবের চরণতলে পতিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে করিতে বলিতে লাগিল, "প্রভো! আমার অপরাধ ক্ষমা করুন, আমি সামান্য ধনগরিমায় মুগ্ধ হইয়া আপনার মহিমা বুঝিতে পারি নাই, এক্ষণে দয়া করিয়া আমাকে বলুন কেন এত স্বর্ণ দিয়াও তুলসীপত্রের সমান করিতে পারিলাম না।" বণিকের কাতর প্রার্থনায়—

নামদেব কহে শুন ইহার কারণ।
ত্রিজগতে নাহি ভাই কৃষ্ণনাম সম॥
বড় বড় কর্ম্ম করে বড় অভিমানে।
কৃষ্ণনাম-সিন্ধু বিন্দু না হয় সমানে॥

ভাই! কৃষ্ণ নামের সমান কিছুই নাই, জীব অভিমান বশতঃ কত কর্ম্ম করিয়া থাকে কিন্তু কৃষ্ণনাম রূপ সিন্ধুর এক বিন্দুরও সমান হয় না।

পাঠকগণ! আপনারা দ্বারকাধামে সত্যভামার ব্রতছলে এই প্রমাণ প্রকৃষ্ট রূপেই দেখিয়া থাকিবেন। সেখানেও সত্যভামা নারদ ঋষিকে শ্রীগোবিন্দকে দান করিয়া শেষে গোবিন্দের সমান ধনরত্ন নারদকে দিয়া গোবিন্দকে রাখিতে চাহিয়াছিলেন কিন্তু সেখানেও এইরূপ কিছুতেই গোবিন্দের সমান ধনরত্ন হয় না দেখিয়া দ্বারকাধামের মহিষীবৃন্দ ব্যাকুল হইলে পরম ভক্ত উদ্ধব মহাশয় আসিয়া কৃষ্ণ নামাঙ্কিত তুলসী পত্র দ্বারা শ্রীগোবিন্দের তুল্য করিয়াছিলেন যাহা হউক এখানে বণিককে সাধু নামদেব ঐভাবে উপদেশ দিয়া পুনরায় বলিলেন—

[illegible] ভক্তি বিনে আর যত দেখ ধর্ম্ম।
সকলি অনর্থ মাত্র শ্রুতিগণের মর্ম্ম॥
ভক্তি ফল দিতে নারে সংসার না যায়।
পুনঃ পুনঃ তাপত্রয়ে যাতনা ভুঞ্জায়॥"

সর্ব্বশাস্ত্রসার পঞ্চমবেদ স্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবতেও বলিয়াছেন—

"ধর্ম্মঃস্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বকৃসেন কথা সুয।
নোৎপাদয়েদ্ যদি রতিং শ্রম এবহি কেবলম্॥"

অর্থাৎ যে ধর্ম্মদ্বারা ভগবানের কথায় অনুরাগ উৎপাদন না করে তাহা অতি সুন্দররূপে অনুষ্ঠিত হইলেও তাহা কেবল পণ্ডশ্রমভিন্ন আর কিছুই নয়। এই ভাবে নানা শাস্ত্র যুক্তি দ্বারা নামদেব বণিককে কৃষ্ণনাম মাহাত্ম্য বুঝাইয়া দিলে বণিক বুঝিল যে, এই যে সকল দান ব্রত সকলই অভিমানের কার্য্য শ্রীকৃষ্ণ চরণে অহেতুক ভক্তি ভিন্ন আর শান্তিলাভের দ্বিতীয় উপায় নাই।

বণিক সাধু নামদেবের কৃপায় ভ্রান্ত মত পরিহার পূর্ব্বক তাঁহার শরণাগত হইয়া কৃষ্ণভজনে অবশিষ্ট জীবন পরমানন্দে অতিবাহিত করিতে লাগিলেন।

ধন্য সাধু সঙ্গের প্রভাব, শাস্ত্রে সাধুসঙ্গের ভুয়সী প্রশংসা দেখা যায় কারণ এক সাধুসঙ্গের বলে জীবের যাবতীয় অভাব দুর হইতে পারে—গঙ্গা পাপহরণ করেন বলিয়া লোকে পাপহারিনী গঙ্গা বলে, চন্দ্রতাপ হরণ করিতে সমর্থ, এমন যে কল্পবৃক্ষ সে-ও জীবের আকাঙ্খিত বিষয় অবগত হইয়া জীবের দৈন্য দুর করিতে সমর্থ কিন্তু একমাত্র সাধুসঙ্গ দ্বারা জীবের পাপ তাপ ও দৈন্য সমস্তই সদ্য সদ্য বিনষ্ট হইয়া থাকে, তাই শাস্ত্রেও দেখিতে পাই—

"গঙ্গাপাপং শশীতাপং দৈন্যং কল্পতরুর্হরেৎ।
পাপং তাপং তথা দৈন্যং সদ্য সাধু সমাগমে॥"

সাধুসঙ্গের কথা আমরা বারান্তরে আলোচনা করিবার চেষ্টা করিব। আগামী বারে সাধু নামদেবের হরিবাসর নিষ্ঠা প্রভৃতি আরও দু'একটী বিষয় বলিবার ইচ্ছা রহিল।

ক্রমশঃ

শ্রীশ্রীঈশ্বরতত্ত্ব

(প্রেমভক্তি)

প্রাগুক্তরূপে জীব যখন বুঝিতে পারে যে তিনি এক অখণ্ড বিরাটের অংশাংশ মাত্র, তাহার ইচ্ছামতে জগতে কিছুই হয় না, সকলই সেই বিরাটেরও বিরাট যাহার অংশ তাহার ইচ্ছা, তিনি সেই পুরুষের অগণিত সেবকগণের মধ্যে একজন অতি ক্ষুদ্র নগণ্য আজ্ঞাধীন ও আজ্ঞাবহ সেবকমাত্র; যখন জীব সেই বিরাটের লীলাহেতু জগৎ মধ্যে অবতার স্বীকার অনুভব করেন এবং তাঁহাকে একমাত্র পরমানন্দের উৎস বলিয়া বুঝিতে পারেন, জাগতিক আনন্দ প্রকৃত পক্ষে নিত্য আনন্দ নয়, আনন্দের মত অথচ অবসাধ কর ও কর্ম্মবন্ধন জনক মায়ার মোহিনী লীলামাত্র উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম করেন, এবং যখন তিনি কর্ম্ম জ্ঞান বা ভক্তি প্রচার হিসাবে কোন না কোন অবতারে অর্থাৎ সেই বিরাট মূর্ত্তিতে প্রেমবান হইয়া উঠেন, তখনি তাঁহার প্রেমভক্তির আবির্ভাব হয়।

তখন তিনি আত্মসুখ চিরতরে বিস্মৃত হন—সেই প্রেমাস্পদের সুখই তাঁহার একমাত্র লক্ষ্য হয়। তখন তাঁহার ক্ষুদ্র আমিত্ব বিশ্বত্ব সমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া যায়। "কৃষ্ণ মোর প্রভু ত্রাতা জীবের হয় জ্ঞান।"

প্রেম ইন্দ্রিয় সেবীর ধর্ম্ম নয়, স্বসুখ বাঞ্ছা বর্ত্তমান থাকিতে প্রেমের বিন্দুও লাভ হইবার নয়। ইহা দেখাইয়া বুঝাইবার জন্য আমাদের শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তাঁহার বহু পার্ষদবৃন্দ সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন। সর্ব্ববিধ অহমিকা অপগত না হইলে প্রেমের ধর্ম্ম পাওয়া যায় না। প্রেমময় স্বভাব অধিকার করা যায় না।

যাঁহারা মনে করেন 'প্রেম' একটি সামান্য নায়কনায়িকাগত আত্মসুখজনক ব্যাপার মাত্র, তাঁহারা ভ্রান্ত, প্রমাদগ্রস্ত, তাঁহারা বহির্ম্মুখ ও আহাম্মুখ। শ্রীমন্মহাপ্রভুর চিরসেবক ও মহাপূজ্য শ্রীল গোবিন্দদাস বলিয়াছেন—

"প্রেম প্রেম করে সবে প্রেম জানে কেবা।
প্রেম কি কথন হয় রমণীর সেবা?
পুত্রের লাগিয়া আর্ত্তি মনে যদি হয়।
তা হলে কি প্রেমতত্ত্ব তাহারে কহয়?
পুরুষ রমণী ভেদ যখন ঘুচিবে।
তখনি প্রেমের তত্ত্ব হৃদয়ে স্ফুরিবে॥

কবিরাজ মহাশয় প্রেমের লক্ষণ করিয়াছেন—

"আত্মেন্দ্রিয় তৃপ্তি ইচ্ছা ধরে কাম নাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি বাঞ্ছা প্রেম তার নাম॥

এই আত্মতৃপ্তি বাঞ্ছা বিরহিত কৃষ্ণ-প্রীতি জগতে দুর্ল্লভ। তাই কবিরাজ গোস্বামী গাইয়াছেন—

অকৈতব কৃষ্ণপ্রেম যেন জাম্বুনদ হেম
সেই প্রেম নৃলোকে না হয়।
যদি হয় তরে যোগ না হয় তার বিয়োগ
বিরহ হৈলে কেহ না জীয়ায়॥

স্বয়ং মহাপ্রভু বলিতেছেন—

দূরে শুদ্ধ প্রেমবন্ধ কপট প্রেমের গন্ধ
সেই মোর নাহি কৃষ্ণ পায়।
তবে যে করি ক্রন্দন স্বসৌভাগ্য প্রখ্যাপন
করি ইহ: জানিহ নিশ্চয়॥
নিজ দেহে করি প্রীতি কেবল কামের রীতি
প্রাণ কীটেরে করিয়ে ধারণ॥
কৃষ্ণ প্রেম সুনির্ম্মল যেন শুদ্ধ গঙ্গাজল
সেই প্রেমা অমৃতের সিন্ধু।
নির্ম্মল সে অনুরাগে না লুকায় অন্য দাগে
শুক্ল বস্ত্রে যৈছে মসীবিন্দু॥

এই প্রেম আস্বাদন তপ্ত ইক্ষু চর্ব্বণ
মুখ জ্বলে না যায় ত্যজন।
সেই প্রেম যার মনে তার বিক্রম সেই জানে
বিষামৃতে একত্র মিলন॥

অষ্টসাত্ত্বিক বিকারাদি, রাগ, বিরহ, মিলনাদি প্রেমের নানা প্রকারভেদ ও লক্ষণভেদ আছে। সে সকল গোস্বামী গ্রন্থে ও শ্রীচরিতামৃতে দ্রষ্টব্য।

বৈষম্য নিরাস

জগতে কেহ ধনী, কেহ নির্ধন, কেহ সাধক কেহ সিদ্ধ ইত্যাদি বৈষম্য দর্শনে অনেকে বলেন যে, ঈশ্বর পক্ষপাত করেন তিনি সকলকে সমান করেন নাই। এইরূপ সন্দেহ দূর করা বিশেষ প্রয়োজন। এরূপ সন্দেহ থাকিলে ঈশ্বরের প্রতি ভালবাসা হওয়া মানুষের পক্ষে অসম্ভব।

আমরা যে উক্ত সংশয় ছেদন করিতে পারিব এরূপ আশা নাই। কারণ আমরাও মায়াধীন মানব, যদি মায়ার পরপারে যাইতে সমর্থ হইতাম তাহা হইলে ব্যাপারটা কি উত্তমরূপে বুঝিয়া জগৎজীবের উপকারার্থ প্রচার করিয়া দিতাম।

যাহা হউক আমরা যতদূর জানিতে পারিয়াছি তাহাতে জাগতিক ব্যাপার নিচয় কেবল অনিত্য ক্রীড়া মাত্র বলিয়াই বোধ হয়। এবং ক্রীড়া বলিয়া ঐ সকল ব্যাপারে আনন্দই মুখ্য লক্ষ্য। দুঃখ বিষাদ হাহাকার কেবল মায়ার বিকার মাত্র।

যেমন শিশুগণ কেহ চোর, কেহ বিচারক প্রভৃতি নানা সাজে সাজিয়া কেহ দণ্ড ভোগকরে, কেহ রাজা হয় অথচ প্রত্যেকেই আনন্দ ভোগ করে, সেইরূপ শ্রীভগবানও জীবগণকে লইয়া নানা ভাবে সেই এক আনন্দ রসেরই অবতারণা করিতেছেন, এইরূপই মনে হয়। যে মানব এই কথা বিস্মৃত হইবে সে তাহার সেই ক্ষণিক সাজ সজ্জাকে সত্য ও স্থায়ী বিবেচনা করিয়া নিরানন্দে বিষণ্ণ ও মহানন্দে উন্মত্ত হইয়া উঠিবে, যিনি সে কথা বিস্মৃত হইবেন না সদাই মনে রাখিতে পারিবেন যে, জগতে কেবল শিশু-ক্রীড়া চলিতেছে এবং যে যাহার কার্য্য করিয়া সেই ক্রীড়ার পোষকতা করিয়া শ্রীভগবানকে আনন্দ উপভোগ করাইতেছেন তিনি কখনই আর্ত্তরব করিতে

পারিবেন না বা আনন্দে প্রমত্ত হইবেন না। নিরন্তর শান্তমধুর আনন্দ রসে বিভোর থাকিয়া ভগবৎসেবা-সুখে মগ্ন থাকিবেন। তাঁহার মন সততই সন্তুষ্ট থাকিবে, কিছুতেই তাঁহাকে উদ্বিগ্ন বা উত্তেজিত করিতে পারিবে না।

ঈশ্বরের রাজ্যে ও সেই রাজ্যের পথে মায়িক বা জাগতিক সুখ বা দুঃখ পাপ বা পুণ্য, শীত বা উষ্ণ, ছোট বা বড় এমন কি স্ত্রী বা পুরুষ প্রভৃতি মায়িক দ্বন্দ্বাত্মক কোন ভেদ নাই। ইহ জগতের ধনজনাদিতে মমত্ব বোধ থাকিতে সে রাজ্যের পথিক হওয়া যায় না। সে সকল তাঁরই কার্য্যে ব্যয় করিতে হইবে, আমার নিকট গচ্ছিত ন্যাসমাত্র স্বরূপে আছে এইরূপ বোধ করিতে হইবে। সুতরাং তাহাতে প্রমত্ত বা বিহ্বল হইবার কিছুই নাই। দেহের বা মনের সুখ দুঃখ পঞ্চেন্দ্রিয় ও তত্তৎইন্দ্রিয়ের বিষয়ের উপর নির্ভর করে। তাহা ভক্তির রাজ্য নয়। "বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হবে মন। কবে হাম হেরব শ্রীবৃন্দাবন॥" শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের এই উক্তিই আনন্দরাজ্যে প্রবেশ পাইবার মূলমন্ত্র। রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দাদি বিষয় সমূহে যতক্ষণ মন ক্রীড়া করিবে ততক্ষণ বিষয়াতীত প্রেমের রাজ্যের আস্বাদ সে পাইবে না। ঐরূপ রসাদি যেথান হইতে আসিয়াছে যখন মন সেই থানে বিচরণ করিবে এবং উপরের বা বাহিরের ঐরূপ রসাদিতে মোহিত হইবে না তখনি জীবন ভক্তির রাজ্যে প্রবেশ করিবে। বৈষম্য মায়িক জগতের কথা। মায়ার মোহে আঁখি যখন অন্ধপ্রায় থাকে, তখন কাহাকেও সুখী কাহাকেও দুঃখী কাহাকেও ছোট কাহাকেও বড় মনে হইবে। সেটা কেবল "অসত্যেরে সত্য করি মানি"—এই ঠাকুর নরোত্তমের কথা। অতি সত্য। আপনি যাহাকে সুখী মনে করিতেছেন বস্তুতঃ তাহার সহিত অলাপ ও ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ করিয়া বুঝুন দেখিবেন আপনার অনুমান অসত্য। আপনি যাহাকে বড় বা ছোট মনে করিতেছেন উত্তমরূপে দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন উক্ত ধারণা সত্য নয়। এই গেল এ জগতের ব্যাপার। আবার আপনি কৃষ্ণ কৃপায় মায়ার সীমা অতিক্রম করিয়া কৃষ্ণের অপ্রাকৃত রাজ্যে বসিয়া দেখুন—ব্যোমযান আরোহীর নিম্ন দৃষ্টির ন্যায় দেখিবেন সবই সমান। এই অবস্থায় বৈষম্য আর থাকে না। একটু উপরে উঠা চাই একটু উন্নত হওয়া চাই। নচেৎ যে বৈষম্য সেই বৈষম্যই আছে। এই বৈষম্যই মায়া। বৈষম্য দর্শনই বহির্ম্মুখতা। জলে তরঙ্গ দর্শনের ন্যায়।

অন্তর্ম্মুখীন হইয়া দেখিলে, ভগবদুন্মুখ হইয়া দেখিতে স্পষ্টই অনুভূত

হইবে যে কৃপার কিরণ ধারা সূর্য্যাংশুর ন্যায় সর্ব্বত্রই সমভাবে বর্ষিত হইতেছে। বরং বলিতে হইলে দরিদ্রের উপরেই সে কৃপা প্রবল বলিতে হয়, পতিতের উপরেই সে ধারা সমধিক বলিতে হয়। ধনী, মানী, কুলীনের উপর সে কৃপা কিছু কম বলিয়া অনুভব হয়। সে কৃপা জাগতিক দ্রব্যের বাহুল্যে বা স্বল্পতায় পরিমাণ হয় না। সাধুরূপে, শাস্ত্ররূপে ও গুরুরূপে তিনি যে তাঁহাকে জানাইবার জন্য সদাই ব্যস্ত, অবতার স্বীকার করিয়া মানবরূপে তিনি যে দেশ বিদেশে নানাবিধ শিক্ষা উপদেশ দিতেছেন এই সকলই তদীয় কৃপার নিদর্শন। জীবনের উদ্দেশ্য যদি ভুক্তি মুক্তি হয় তাহা হইলে কাজে কাজেই জাগতিক দ্রব্যের স্বল্পতা বা বহুতা হিসাবে কৃপার বৈষম্য দর্শন হইবে। কিন্তু ভক্তগণের ত সে উদ্দেশ্য নয়। অভক্তগণেরও তাই। জীব মাত্রের উদ্দেশ্য—"কৃষ্ণ ভজিবার তরে সংসারে আইনু"। কৃষ্ণ ভজন যাহার উদ্দেশ্য, তাহার ভজনের বিঘ্ন যাহাতে হয় সেইটিই অকৃপা, তাহা অতিক্রম করাই ভক্তের বীরত্ব বা আগ্রহ, সুতরাং তিনি জাগতিক দ্রব্য বাহুল্য ইচ্ছা করিতে পারিবেন না। কারণ তাহাতে চিন্তাধিক্য হেতু ভজন বিঘ্ন হয়। এইরূপে ধীর ভাবে বিচার করিলে বুঝা যায় যে, যাহা দেখিয়া মনুষ্য ঈশ্বরের বৈষম্য বলেন তাহা প্রকৃত দৃষ্টিতে বৈষম্য নয়। কৃষ্ণ ভজন বিষয়ে শ্রীভগবান সকলকেই সমান করিয়াছেন তথায় জাতি, বর্ণ, ধন মানের মোটেই বেশী কম নাই, সব সমান। সাম্যই তাঁহার নীতি। সমত্বই তাঁহার বিধান।

শ্রীসত্যচরণ চন্দ্র, বি, এল।

কপিলোপাখ্যান

একথা বিশেষ করিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই যে, ভগবান্ জন্মমৃত্যুর অতীত। কিন্তু জীব যখন পাপে ডুবিয়া থাকে, যখন ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হয় তখন ভগবান লোকমধ্যে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। এইরূপ এক সময় যখন মানুষের মন পাপে ভরিয়া উঠিল তখন মানবকে

* সাংখ্যমত প্রচারক কপিলের উপাখ্যান ভাগবতে বর্ণিত আছে। এই কপিলের উপাখ্যান আবার মহাভারত, রামায়ণ, হরিবংশ, বিষ্ণুপুরাণ, লিঙ্গপুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থে, বিবৃত আছে। কিন্তু ভাগবতের বিবরণের সহিত এই সমস্ত গ্রন্থের বিবরণের অনেক স্থলে ঐক্য

আত্মজ্ঞান প্রদান করিবার জন্য যোগমায়ার সঙ্গে ভগবান কপিলরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। এই অবতারে তিনি তত্ত্ব উপদেশ দিবার জন্য সাংখ্য নামে এক গভীর আত্মদর্শন শাস্ত্র প্রবর্ত্তন করেন।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে কর্দ্দম ঋষি কপিলের আজ্ঞা পাইয়া বনে প্রস্থান করেন। কপিলও এদিকে মাতার প্রিয় অনুষ্ঠান করিবার জন্য সেই বিন্দু সরোবরের তীরেই রহিলেন।

দেবহূতির মনে পড়িল ব্রহ্মা তাঁহাকে বলিয়াছেন স্বয়ং ভগবান্ তাঁহার পুত্র হইয়া জন্মিবেন। তিনি এই কথা ভাবিতে লাগিলেন আর অতৃপ্ত নয়নে পুত্র কপিলের দিকে বারবার দেখিতে লাগিলেন। দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে ভাববিভোরা দেবহূতির উপলব্ধি হইল সত্যই কপিল নারায়ণের অবতার। কর্ম্মের সম্পূর্ণ বাহিরে থাকিয়াও তত্ত্বমার্গের সূক্ষ্মতম ভাব প্রদর্শন নিরত কর্ম্মে রহিয়াছেন। মূর্ত্তি দর্শন করিতে করিতে দেবহূতির বিষয় বাসনার নির্ব্বেদ উপস্থিত হইল। তিনি মুখ ফুটিয়া না বলিয়া আর থাকিতে পারিলেন না। কপিল যে তাঁর পুত্র তাহা তিনি ভুলিয়া গেলেন; ভগবদ্দর্শনের পূর্ণানন্দে বিভোর হইয়া বার বার তাঁহাকে প্রণাম করিতে লাগিলেন আর বলিতে লাগিলেন—প্রভু হে, ইন্দ্রিয় বাসনা পূর্ণ করিতে করিতে আমি যে ঘোর অন্ধকারে ডুবিয়া রহিয়াছি। বুঝি না যে এই ইন্দ্রিয় ও ইহার বাসনা ত চিরকাল থাকিবে না ইহা অতি তুচ্ছ। 'আমি' ও 'আমার' বলিয়া আমার যে ভ্রম রহিয়াছে, সে ভুল ত তুমিই আমাকে দিয়াছ, তোমার দেওয়া জিনিষ তুমি ছাড়া আর কেহ ত দূর করিতে পারিবে না। ওগো, তুমি আমার এ বিষম ভুল ভাঙ্গিয়া দাও। আমাকে বাঁচাও। আমি একেবারে নিরুপায়। প্রকৃতি ও পুরুষ কে জানিবার জন্য আমার মন বড়ই ব্যাকুল হইয়াছে। তুমি ভিন্ন আর কে এই তত্ত্ব আমাকে বুঝাইতে পারে? তোমারই শরণ লইলাম। শরণাগত বৎসল! তুমি আমার উপায় কর। আমি কিছু জানি না, বুঝিনা তোমাকে বার বার নমস্কার করিতেছি।"

হয় না, উপাখ্যানের বিচারে প্রবৃত্ত না হইয়া আমি বর্ত্তমান প্রবন্ধে ভাগবত গ্রন্থেরই অনুসরণ করিয়াছি। কেহ আবশ্যক মনে করিলে অন্যান্য পুরাণ মিলাইয়া পড়িতে পারেন। শ্রীমদ্ভাগবত, মহাভারত, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ প্রভৃতি বৈষ্ণব পুরাণগুলিতে কপিলদেব নারায়ণের অবতাররূপে বর্ণিত হইয়াছেন। কিন্তু লিঙ্গপুরাণ ও শিবপুরাণ প্রভৃতি শৈবপুরাণগুলিতে ইহাকে শিবাবতার বলা হইয়াছে। (লেখক)

আত্মতত্ত্বজ্ঞ ভগবদ্ভক্তগণের অধিপতি ভগবান শ্রীকপিলদেব জননী দেবহূতির এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া ঈষৎ হাস্য যুক্ত প্রফুল্ল বদনে বলিলেন—

মা, জীবগণের ভববন্ধন ছেদনের জন্য অধ্যাত্মযোগই আমার অভিমত, আর যে যোগ অনুষ্ঠিত হইলে জীবগণের আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক তাপত্রয় এবং অকিঞ্চিৎকর সংসার সুখের বাসনা একেবারে নিবৃত্তি হইয়া যায় তাহাকে ভাল না বলিবে কে? পূর্ব্বে এই সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর আত্মযোগ ঋষিদিগের নিকট যাহা বলিয়াছিলাম সেই অধ্যাত্মযোগই আপনার নিকট আমি ক্রমে ক্রমে বর্ণন করিব।

চেতঃ খল্বস্য বন্ধায় মুক্তায় চাত্মনোমতম্।
গুণেষুশক্তং বন্ধায়রতং বা পুংসি মুক্তয়ে॥
অহং মমাভিমানোত্থৈঃ কামলোভাদিভির্ম্মলৈঃ।
বীতং যদা মনঃ শুদ্ধমদুঃখমসুখং সমম্॥
তদা পুরুষ আত্মানং কেবলং প্রকৃতেঃ পরম্।
নিরন্তরং স্বয়ং জ্যোতিরণিমানমখণ্ডিতম্॥
জ্ঞানবৈরাগ্যযুক্তেন ভক্তি যুক্তেন চাত্মনা।
পরিপশ্যত্যুদাসীনং প্রকৃতিঞ্চ হতৌজসম্॥
ন যুজ্যমানয়া ভক্ত্যা ভগবত্যখিলাত্মনি।
সদৃশোঽস্তি শিবঃ পন্থা যোগিনাং ব্রহ্মসিদ্ধয়ে॥
প্রসঙ্গমজরং পাশমাত্মনঃ কবয়ো বিদুঃ।
স এব সাধুষু কৃতো মোক্ষদ্বারমপাবৃতম॥

অর্থাৎ মনই জীবের আসক্তি ও মুক্তির কারণ, "মনএব মনুষ্যনাং কারণং বন্ধমোক্ষয়ে" বিষয়াশক্ত মনই সংসার বন্ধনের হেতু আর ভগবান পরমেশ্বরে আসক্ত মনই ভববন্ধন বিমুক্তির উপযুক্ত হয়। যখন জীবের মন, আমি আমার ইত্যাদি ভাবে উৎপন্ন যে কাম ক্রোধাদির বিকার তাহা রহিত হয় এবং সুখ দুঃখ নিরাসযুক্ত হয় অর্থাৎ কিছুতেই বিচলিত না হয় তখন জীব মুখ্যতম প্রকৃতির পর অর্থাৎ নির্গুণভেদ শূন্য স্বয়ং প্রকাশ স্বরূপ সূক্ষ্ম অপরিচ্ছিন্ন পরমাত্মা শ্রীভগবানকে, জ্ঞান বৈরাগ্য এবং ভক্তি প্রবন চিত্ত দ্বারা অবিচলিত ভাবে অবলোকন করে এবং নিজের প্রকৃতিকে ক্ষোভিত করিতে অসমর্থা যে মায়া তাহাকেও জানিতে পারে।

হে জননি! যোগীদিগের আত্মজ্ঞান লাভের নিমিত্ত সর্ব্বান্তর্যামী ভগবান

শ্রীহরির প্রতি প্রযুক্ত ভক্তি যোগের তুল্য আর মঙ্গল কর দ্বিতীয় উপায় নাই। অপাত্রে আসক্তিকেই জ্ঞানিগণ অব্যর্থ বন্ধন বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন।

অসেবয়ায়ং প্রকৃতেগু'ণানাং জ্ঞানেন বৈরাগ্য বিজৃম্ভিতেন।
যোগেন ময্যর্পিতয়া চ ভক্ত্যা মাং প্রত্যগাত্মানমিহাবরুন্ধে॥

অর্থাৎ—সেই সাধুগণ সমস্ত নশ্বর আশক্তি ত্যাগ করিয়া থাকেন, আপনি তাঁহাদিগের সঙ্গ প্রার্থনা করুন। কেননা গঙ্গাজল যেমন যাবতীয় মলিনভাবাপন্ন ব্যক্তিগণের পাপতাপাদি দূর করিয়া দিয়াও নিজে যেমন নির্ম্মল তেমনই থাকে, সেইরূপ সাধুগণও নিজসংসর্গের দ্বারা কলুষিত জীবের পাপতাপাদি হরণ করিয়া থাকেন, কিন্তু নিজেরা যেমন নির্ম্মল, শান্ত দান্ত সেইরূপই থাকেন। সাধু সংসর্গ হইলে হৃদয় ও কর্ণের আনন্দ বর্দ্ধক যে আমার লীলাদি তাহার আলোচনা হয় এবং তদ্দ্বারা ক্রমান্বয় চিত্তের মলিনতা দূর হইয়া পরম কৈবল্যধাম শ্রীহরির প্রতি শ্রদ্ধা, রতি ও ভক্তির উদয় হয়। সাধুগণ মদীয় লীলাদির চিন্তাদ্বারা জাতা যে ভক্তি তদ্দ্বারা ঐহিক ও পারত্রিক ইন্দ্রিয়সুখে বিরক্ত হইয়া ভক্তিযোগ সহকারে আমার প্রচারিত ভক্তিপ্রধান যোগমার্গ অবলম্বন করতঃ মনকে বশীভূত করিতে যত্ন করে। হেমাতঃ! জীবগণ প্রকৃতির গুণ বিষয় সকল সেবা না করায় বৈরাগ্য যুক্ত তত্ত্বজ্ঞান, অষ্টাঙ্গযোগ ও আমাতে অর্পিত প্রেম ভক্তি দ্বারা সর্ব্বময় ভগবান যে আমি আমাকে এই স্থূলদেহেই অনুভব করিয়া থাকে।

ভগবান কপিলদেবের এইরূপ সুধামধুর তত্ত্বোপদেশপূর্ণ বাক্যাবলি শ্রবণ করিয়া দেবহূতি পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন :—

শ্রীদেবহূতিরুবাচ।

কাচিত্ত্বয্যুচিতা ভক্তিঃ কীদৃশীমমগোচরা।
যয়া পদং তে নির্ব্বাণ মঞ্জসান্বাশ্নবা অহম্॥
যো যোগো ভগবদ্বাণোনির্ব্বাণাত্মং ত্বয়োদিতঃ।
কীদৃশঃ কতি চাঙ্গানি যত স্তত্ত্বাববোধনম্॥
তদেতন্মে বিজানীহি যথাহং মন্দধীর্হরে।
সুখং বুধ্যেয়দুর্ব্বোধং যোষাভবদনুগ্রহাৎ॥

দেবহূতি বলিলেন, হে ভগবন! আপনার প্রতি কি প্রকার ভক্তি করা উচিত এবং যে যোগের দ্বারা নির্ব্বাণ পদরূপ আপনার পাদপদ্ম শীঘ্রই লাভ করা যায়, ও যে যোগকে আপনি "ভগবদ্বাণা" অর্থাৎ শর যেমন লক্ষ্যপ্রাপ্ত হয়

সেইরূপ যে যোগ তত্ত্বজ্ঞানকে প্রাপ্ত করাইয়া ভগবানকে লাভ করাইয়া দেয়, সেই সকল যোগ কিপ্রকার এবং তাহার কত প্রকার অঙ্গ আমরা স্ত্রীজাতি আমাদেরই বা কিপ্রকারের যোগ সম্ভব, এই সমুদায় আমার নিকট কৃপাকরিয়া বিস্তারিতভাবে বর্ণন করুন। হে শ্রীহরে! আমি স্ত্রীজাতি তাহাতে আবার নিতান্ত অল্পবুদ্ধি বিশিষ্টা অতএব যাহাতে সেই দুর্ব্বোধ্যতত্ত্ব সকল সহজে বুঝিতে পারি কৃপা পূর্ব্বক তাহা করিয়া আমাকে কৃতার্থ করুন।

কর্দ্দমাত্মজ কপিলরূপি ভগবান জননী দেবহূতির এই সকল কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়া যাহা হইতে শরীরধারী হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সেই জননীর প্রতি তত্ত্বজ্ঞানপ্রদ যে যোগ অর্থাৎ পণ্ডিতগণ যাহাকে সাংখ্য যোগ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন তাহা বলিতে লাগিলেন।

শ্রীভগবানুবাচ

দেবানাং গুণলিঙ্গানামানুশ্রবিককর্ম্মণাম্।
সত্ত্ব এবৈকমনসো বৃত্তিঃ স্বাভাবিকি তুষা॥
অনিমিত্তা ভাগবতী ভক্তিঃ সিদ্ধের্গরীয়সী।
জরয়ত্যাশু যা কোশং নিগীর্ণমনলো যথা॥
নৈকাত্মতাং যে স্পৃহয়ন্তি কেচিন্মৎ পাদসেবাভিরতা মদীহাঃ।
যেহন্যোহন্যতো ভাগবতাঃ প্রসজ্য সভাজয়ন্তে মম পৌরুষাণি॥
পশ্যন্তি তে মে রুচিরাণ্য সন্তঃ প্রসন্নবক্ত্রা রুণলোচনানি।
রূপানি দিব্যানি বরপ্রদানি সাকং বাচংস্পৃহণীয়াং বদন্তি॥
তৈর্দর্শনীয়াবয়বৈরুদারবিলাসহাসেক্ষিতবামসূক্তৈঃ।
হৃতাত্মনো হৃতপ্রাণাংশ্চ ভক্তিরনিচ্ছতোগতিমণ্বীং প্রযুঙ্‌ক্তে॥

শ্রীভগবান বলিলেন, মা! শুদ্ধ সত্ত্বনির্ব্বিকার চিত্ত পণ্ডিতগণ বিষয় গ্রহণপটু ইন্দ্রিয় ও তাহার অধিষ্ঠাতৃ দেবতাগণের বেদ-বোধিত কর্ম্মানুষ্ঠান বশতঃ যে শ্রীভগবানে নিস্কামা মনোবৃত্তি অর্থাৎ ভগবানেরতি, তাহাকেই ভক্তি বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। ঐভক্তি, মুক্তিহইতেও শ্রেষ্ঠা জানিবেন। জঠরাগ্নি যেমন ভুক্ত অন্নাদি পরিপাক করে সেইরূপ ভক্তিও লিঙ্গশরীরকে শীঘ্র শীঘ্র ক্ষয় করিয়া দেয় অর্থাৎ অনিত্য বাসনাদি দূর করিয়া শ্রীভগবানের লাভ ঘটাইয়া দেয় আর ভগবানের পাদপদ্ম সেবায় যাহারা আসক্ত চিত্ত এবং আমাকে (শ্রীভগবানকে) যাহারা প্রার্থনা করে এবং যে ভক্তগণ আমার লীলা গুণাদি সর্ব্বদা

আলোচনা করে এরূপ কোন ভক্তই কেবল ঐকান্তিক ভক্তি ভাবভিন্ন আমার সহিত একাত্মতা অর্থাৎ সামুজ্যমুক্তি অভিলাষ করেনা।

হে জননি! সেই ভক্তগণ প্রফুল্লবদন, ঈষৎ রক্তনেত্র মনোজ্ঞ অভিলষিত বরপ্রদ আমার দীব্যমূর্ত্তি দর্শনকরে এবং ঐ মূর্ত্তিকে অবলম্বন করিয়া প্রেমের সহিত বাক্য প্রয়োগ অর্থাৎ অভিমত স্তোত্র প্রার্থনাদি করিয়া থাকে সুতরাং মুক্তি অপেক্ষা উহাতে ভক্তের অধিক আনন্দ হয়, আর মুক্তিও তাহাদের আনায়াস লভ্য হয়, দেখুন, সেই পূর্ব্বোক্ত ভক্ত বাঞ্ছাপ্রদ মনোহর লীলা রহস্য অবলোকন ও মনোহর সম্ভাষনাদিযুক্ত শ্রীভবানের অপূর্ব্ব আকৃতিদ্বারা যে সকল ভক্তের চিত্ত ও মন আকৃষ্ট হয় সেই সকল ভক্ত মুক্তি ইচ্ছা না করিলেও আমার ভক্তিই তাহাদিগকে মুক্তিরূপ ফল প্রদান করিয়া থাকে।

অথোবিভূতিং মমমায়য়াচিতামৈশ্বর্য্যমষ্টাঙ্গমনুপ্রবৃত্তম্।
শ্রিয়ং ভাগবতীং বাস্পৃহয়ন্তি ভদ্রাং পরস্য মে তেহশ্নুবতে তু লোকে॥
ন কর্হিচিন্মৎপরাঃ শান্তরূপে নঙ্ক্ষ্যন্তি নো মেহনিমিষো লেঢ়িহেতি।
যেষামহং প্রিয় আত্মা সুতশ্চ সখা গুরুঃ সুহৃদো দৈবমিষ্টম্॥
ইমংলোকং তথৈবামুমাত্মানমুভযায়িনম্।
আত্মানমনু যে চেহ যেরায়ঃ পশবোগৃহাঃ॥
বিসৃজ্য সর্ব্বানন্যাংশ্চ মামেবং বিশ্বতোমুখম্।
ভজন্ত্যনন্যয়া ভক্ত্যা তান্মৃত্যোরতি পারয়ে॥

এই প্রকার মুক্ত পুরুষ অজ্ঞান নাশের পর আমার মায়াদ্বারা রচিত সত্যলোক প্রভৃতিতে যে অতুলনীয় সুখসম্পত্তি এবং ভক্তির পশ্চাতে উপস্থিত যে অনিমা লঘিমা প্রভৃতি অষ্টৈশ্বর্য্য এবং বৈকুণ্ঠস্থ আমার পার্ষদত্বাদি কিছুরই কামনা করে না কিন্তু প্রার্থনা না করিলেও আমাতে ঐকান্তিকী ভক্তিদ্বারা সে বৈকুণ্ঠধামে উপস্থিত হইয়া আমার কৃপায় সকল লাভ করিয়া থাকে। হে শান্তরূপে! আমার ভক্তগণ ভক্তিযোগেদ্বারা বৈকুণ্ঠধাম প্রাপ্ত হইয়া আর কখনও পতিত হয়না এমনকি আমার অখণ্ডনীয় কালচক্রও তাহাদের আয়ু বা ভোগক্ষয় করিতে অক্ষম। আমি তাহাদিগের নিকট পতির ন্যায় প্রিয়, প্রেমাস্পদ আত্মাস্বরূপ বা ব্রহ্মের ন্যায় উপাস্য পুত্রের ন্যায় স্নেহের ও বন্ধুর ন্যায় বিশ্বাসের পাত্র আর গুরুর ন্যায় হিতোপদেষ্টা ও আত্মিয় বান্ধবগণের ন্যায় মঙ্গলাকাঙ্খী এবং ইষ্টদেবের ন্যায় পূজ্যহইয়া থাকি, ইহাদের আর কোনই বিপদের আশঙ্কা থাকেনা। কিন্তু হে মাতঃ! সকলেই

সহজে এইরূপ গতি লাভে সমর্থ হয় না, যে সকল ভক্ত ইহলোক ও পর-লোকে স্বর্গাদিগত সোপাধিক আত্মা এবং ঐ সোপাধিক আত্মাকে অবলম্বন করিয়া বর্ত্তমান যে পুত্রকলত্র ধন জনাদি থাকে সেই সকল ও অন্যান্য পরিগ্রহ সকল পরিত্যাগ পূর্ব্বক সর্ব্বব্যাপি যে আমি, আমাকে নিষ্কামভক্তিদ্বারা ভজনা করে, তাহাকে আমিই সংসাররূপ অনন্তসাগর হইতে উদ্ধার করি ও শ্রেষ্ঠ গতি প্রদান করি।

ন্যাগত্রমদ্ভগবতঃ প্রধান পুরুষেশ্বরাৎ।
আত্মনঃ সর্ব্বভূতানাং ভয়ং তীব্রং নিবর্ত্ততে॥
মদ্ভয়াদ্বাতি বাতোঽয়ং সূর্য্যস্তপতিমদ্ভয়াৎ।
বর্ষতীন্দ্রো দহত্যগ্নির্মৃত্যুশ্চরতি মদ্ভয়াৎ॥
জ্ঞানবৈরাগ্যযুক্তেন ভক্তিযোগেন যোগিনঃ।
ক্ষেমায় পাদমূলং মে প্রবিশন্ত্যকুতোভয়ম্॥
এতাবানেব লোকেঽস্মিন্ পুংসাং নিঃশ্রেয়সোদয়ঃ।
তীব্রেন ভক্তিযোগেন মনোময্যর্পিতং স্থিরম্॥

হে মাতঃ, সকলের অন্তর্যামী সর্ব্বজীব জীবন পরমাত্মা শ্রীভগবান যে আমি এই আমাভিন্ন অর্থাৎ শ্রীহরিভিন্ন অন্যকোন উপায়দ্বারা এই দুস্তর সংসার ভয় নিবৃত্ত হয় না অধিক আর কি বলিব পরমাত্মা শ্রীহরির শাসনেই বায়ু বহিতেছে, সূর্য্য উত্তাপ দান করিতেছে, ইন্দ্র যথাকালে বর্ষণ করিতেছে ও অগ্নি দগ্ধ করিতেছে এবং মৃত্যু যথাকালে জীবগণের প্রতি ধাবিত হইতেছে। এমন কি যোগীগণ আমার শক্তি দ্বারাই চালিত হইয়া জ্ঞান-বৈরাগ্য যুক্ত ভক্তিযোগদ্বারা মঙ্গলপদ প্রাপ্তির একমাত্র উপায় স্বরূপ যে পাদপদ্ম তাহা আশ্রয় করিতেছে। ফলতঃ যদি একাগ্রভাবে ভক্তিযোগদ্বারা আমাতে মন অর্পিত হয় তবে তাহাই জীবের পরমপুরুষার্থ বলিয়া জানিবেন। যে তত্ত্ব জ্ঞাত হইলে জীব প্রকৃতির গুণ মায়াদি হইতে একেবারে বিমুক্ত হয়, এক্ষণে আপনাকে সেই সকল তত্ত্ব সমূহের পৃথক লক্ষণ সকল বলিতেছি শ্রবণকরুন। আর হৃদয়ের অন্ধকার বিনাশক, ত্রিবিধ দুঃখের একান্ত নিবৃত্তি কারক ও আত্মতত্ত্বপ্রদর্শক যে জ্ঞান যাহা মুনিগণ সর্ব্বদা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন তাহাও আপনাকে ক্রমে বলিব।

অনাদিরাত্মা পুরুষো নির্গুণঃ প্রকৃতেঃপরঃ।
প্রত্যগ্ধামা স্বয়ং জ্যোতির্বিশ্বং যেনসমন্বিতম্॥

স এব প্রকৃতিং সূক্ষ্মাং দৈবীং গুণময়ীং বিভুঃ।
যদৃচ্ছয়ৈবোপগতা মভ্যপদ্যত লীলয়া॥
গুণৈর্ব্বিচিত্রাঃ সৃজতীং সরূপাঃ প্রকৃতিং প্রজাঃ।
বিলোক্য মুমুহে সদ্যঃ স ইহজ্ঞান গূহয়া॥

হে জননি! সকল ইন্দ্রিয়ের অগম্য নিত্য সত্য নির্গুণ ও প্রকৃতির গুণে আসক্ত সর্ব্বময় স্বয়ম্প্রকাশ স্বরূপ এই পুরুষই পরমাত্মা। যাঁহার তেজে এই বিশ্ব প্রকাশিত হইতেছে সেই পরম পুরুষের নিকট সূক্ষ্ম দৈবী গুণময়ী মায়া লীলার জন্য উপস্থিত হইলে অর্থাৎ লীলা প্রকাশের জন্য আবির্ভূত হইলে তিনি স্বয়ং ইচ্ছাক্রমে ঐ মায়াকে গ্রহণ করেন। অর্থাৎ মায়া সম্বন্ধ যুক্ত হয়েন। ঐ মায়ার অবস্থা আবার প্রকার ভেদে দ্বিবিধ। মায়া ও অজ্ঞান, তন্মধ্যে অজ্ঞান যুক্ত পুরুষ জীব এবং মায়াযুক্ত চৈতন্য কে শাস্ত্রে ঈশ্বর বলিয়া ব্যাখ্যা করেন।

জীবসংজ্ঞাধারী ঐপুরুষ সত্ত্বাদিগুণ দ্বারা নিজের সমান বহুবিধ প্রজা সৃষ্টি কারিণী মায়াদ্বারা বিমোহিত হইয়া থাকে।

"এবং পরাভিধ্যানেন কর্ত্তৃত্বং প্রকৃতেঃ পুমান্।
কর্ম্মসু ক্রিয়মাণেষু গুণৈরাত্মনি মন্যতে॥
তদস্য সংসৃতির্ব্বন্ধঃ পারতন্ত্র্যঞ্চ তৎ কৃতম্।
ভবত্য কর্ত্তুরীশস্য সাক্ষিণো নির্বৃতাত্মনঃ॥
কার্য্য কারণ কর্ত্তৃত্বে কারণং প্রকৃতিং বিদুঃ।
ভোক্তৃত্বে সুখঃদুঃখানাং পুরুষং প্রকৃতেঃ পরম্॥"

এইরূপে প্রকৃতির ভাবে বিমুগ্ধ হওয়ায় জীবাত্মা প্রকৃতির সত্ত্ব রজ ও তম এই গুণত্রয় দ্বারা যাহা সৃষ্টি করেন সেই সকল কার্য্যে আপনাকে কর্ত্তা বলিয়া মনে করেন। হে মাতঃ এই কর্ত্তৃত্বাভিমানই, অকর্ত্তা, সর্ব্বসাক্ষী, সর্ব্বশক্তিমান সুখস্বরূপ ঐ পুরুষের, জন্মমৃত্যু-প্রবাহরূপ সংসার এবং সংসারকৃত বন্ধন ও বন্ধনজনিত অধীনতা সম্পাদন করে। অতএব কার্য্য, কারণ ও কর্ত্তৃত্বকে অর্থাৎ দেহকার্য্য, ইন্দ্রিয়কারণ, ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃদেবতা কর্ত্তা ইহাদের সেই সেই ভাব প্রাপ্তির বিষয়ে প্রকৃতিকে কারণ বলিয়া পণ্ডিতেরা কীর্ত্তন করেন এবং সুখদুঃখাদির ভোগবিষয়ে পুরুষের অর্থাৎ প্রকৃতির ভাবে উপহিত চৈতন্যের কারণত্ব স্বীকার করেন। অর্থাৎ দেহাদি জড়ের কার্য্য বলিয়া দেহাদিতে প্রকৃতির প্রাধান্য এবং সুখদুঃখাদির জ্ঞান, চৈতন্যের কার্য্য বলিয়া প্রকৃতি উপহিত চৈতন্যের সুখাদিভোগ প্রাধান্য স্বীকার করেন। (ক্রমশঃ)

প্রেমই পঞ্চম পুরুষার্থ

পদকর্ত্তা শ্রীল চণ্ডিদাস, শ্রীমতীরাধিকার উক্তি কীর্ত্তন করিতে যাইয়া বলিয়াছেন—

"বধুঁ কি আর বলিব আমি।
জীবনে মরণে জনমে জনমে
প্রাণনাথ হ'য়ো তুমি ॥
তোমার চরণে আমার পরাণে
লাগল প্রেমের ফাঁসি।
সব সমপিয়া একমন হৈয়া
নিশ্চয় হইলাম দাসী ॥"

অর্থাৎ শ্রীমতী শ্রীকৃষ্ণকে সমস্ত অর্পণ করিয়া তাঁহার শ্রীপদে একান্ত শরণ লইলেন। কিন্তু এই শরণ লওয়াতেই সমস্ত শেষ হইল না, এখানে আকাঙ্ক্ষা অতৃপ্ত এবং চিরবর্দ্ধনশীল, কেন না পদেই রহিয়াছে যে "জীবনে মরণে জনমে জনমে প্রাণনাথ হ'য়ো তুমি" এই যে আকাঙ্ক্ষা ইহার তৃপ্তি বা বিরাম হইতে পারে না, দিন দিন বাড়িতেই থাকে, তাই আমরা অন্যত্র দেখিতে পাই পদকর্ত্তা বলিয়াছেন "অনুদিন বাঢ়ল অবধি না গেল।" এ আকাঙ্ক্ষার অবশ্য উৎপত্তি আছে কিন্তু বিনাশ নাই, উদয় আছে কিন্তু অস্ত নাই, মোট কথা ইহার আরম্ভ আছে শেষ নাই। এই অনন্তোন্মুখী অবিশ্রান্ত প্রেমের আকাঙ্ক্ষা লইয়াই শ্রীমতী রাধিকা শ্রীকৃষ্ণকে আত্ম-নিবেদন করিতেছেন।

*　　*　　*

শ্রীভগবানের সহিত জীবের কি সম্বন্ধ তাহা নির্ণয় করাই বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্য। বৈষ্ণবগণ ব্রজের পঞ্চভাবের যে কোন একটী ভাবের সম্বন্ধ শ্রীভগবানের সহিত পাতাইয়া ভজনা করিয়া

থাকেন। তাঁহাদের সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ সম্বন্ধের ভাবটী হইতেছে 'মধুরভাব'।

শ্রীমতী তাই সেই ভাবে ভাবিত হইয়া কুল, শীল, লজ্জা, ধৈর্য্য সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে 'প্রাণ বধুঁয়া' বলিয়া সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, "বধুঁ হে আমি সকল ত্যাগ করিয়া তোমার শ্রীপদে দাসী হইলাম তুমি আমাকে অঙ্গীকার কর।"

* * *

এই ভাবে আত্মনিবেদন করিয়াও যখন শ্রীকৃষ্ণের বিরহ শ্রীমতীর হৃদয়ে জাগে তখন কি ভাবের উদয় হয় তাহা বর্ণনা করিয়া বিদ্যাপতি ঠাকুর বলিয়াছেন—

"মাধব সো অব সুন্দরী বালা।
অবিরত নয়নে বারিঝরু নিঝর
জনু ঘন শাঙন মালা॥
পুণমিক ইন্দু নিন্দি মুখসুন্দর
সো অব ভেলশশী রেহা।
কলেবর কমল কাঁতি জিনি কামিনী
দিনে দিনে ক্ষীণ ভেল দেহা॥
উপবন হেরি মুরছি পড়ি ভূতলে
চিন্তিত সখীগণ সঙ্গ।
পদ অঙ্গুলি দেই ক্ষিতি পর লিখই
পানি কপোল-অবলম্ব॥"

শ্রীমন্মহাপ্রভুও এই ভাবটী নিজ জীবনে প্রকট দেখাইয়া জীবকে শিক্ষা দিয়াছেন যে, জীব! তোমাকেও এই ভাবে সেই প্রাণনাথের জন্ম ব্যাকুল হইতে হইবে।

* * *

মিলনে কি সুখ আছে জানি না, জানা তো দূরের কথা ধারণাতেও আনিতে পারি না, "সুখ অন্বেষণে যত সুখ, সুখ প্রাপ্তিতে তত সুখ নাই" এই সিদ্ধান্ত যদি সত্য হয় তাহা হইলে বলিতে হইবে জন্ম জন্ম এমনি কৃষ্ণ বিরহ জনিত দুঃখই আমার থাকিয়া যাউক, হা কৃষ্ণ, হা প্রাণনাথ বলিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়াই আমার জন্ম জন্মান্তর কাটিয়া যাউক, আমি

মিলন চাই না, যেন বিরহের কান্না প্রাণ ভরিয়া কাঁদিতে পারি। প্রেমিক কবি বলিয়াছেন :—

"চাই না মিলনে হরি। (আমি)
জনমে জনমে বহে যেন আঁখি
তোমার বিরহ বারি॥
আশা যাওয়া মম রেখ এই ভবে
মিলনেতে নাথ সকলি ফুরাবে
হরি হরি ব'লে ডাকা নাহি হবে
রেখ চির দাস করি॥
ঘুরে ফিরে ভবে আসিব যাইব
নাচিব গাহিব (নাম) শুনিব শুনাব
প্রেমের তুফানে ভাসিয়া বেড়াব
এ সাধ হৃদয়ে ধরি॥
কোন্ থানে তোমার নাই আনা গোনা
কোথা নাই তুমি তাতো হে জানি না
যেখানে থাক না (আমিও) যেখানে থাকি না
তবুত তুমি আমারি॥"

* * *

হয়তো কেহ কেহ বলিবেন যদি মিলনই না চাও তবে মিলনের অভাবে এত কষ্ট অনুভব কর কেন? শ্রীমন্মহাপ্রভুর উক্তি :—

"যুগায়িতং নিমেষেণ চক্ষুসা প্রাবৃষায়িতং।
শূন্যায়িতং জগৎসর্ব্বং গোবিন্দ বিরহেণ মে॥"

এই যে বিরহ, হে গোবিন্দ, তোমার অদর্শনে এক নিমেষ কালও আমার নিকট যুগযুগান্তর বলিয়া মনে হইতেছে, নয়নে শ্রাবণের ধারার ন্যায় জলধারা পড়িতেছে সমস্ত জগৎ আমার নিকট শূন্য বলিয়া বোধ হইতেছে, ইহাই বৈষ্ণব-সাধনার চরম সিদ্ধি, এই চূড়ান্ত লাভের পর যদি তিনি দর্শন দেন ভাল, আর যদি না দেন তাহাতেও প্রেমের বৃদ্ধি ব্যতিত হ্রাস হইবার সম্ভব নাই। প্রেমিক সাধক অদর্শন জনিত দুঃখে দুঃখিত না হইয়া শ্রীমতীর মত বলেন—

"আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মা—
মদর্শনান্মর্ম্ম হতাং করোতু বা।
যথাতথাবা বিদধাতু লম্পটঃ
মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ ॥ ॥"

অর্থাৎ—কৃষ্ণ আমাকে আলিঙ্গন দিয়া তাঁহার শ্রীচরণের দাসীই করুণ অথবা আমাকে মহা কষ্টেই রাখুন, কিম্বা দেখা না দিয়া বিরহে আমার প্রাণ ওষ্ঠাগত করুণ অথবা তিনি বহু বল্লভ হইয়া যথাতথা বিহার করুন তিনি কিন্তু আমারই প্রাণ বল্লভ। প্রশ্ন হইতে পারে যে, জীবের পক্ষে এতদূর সম্ভব হইতে পারে কি না। তাহার উত্তরে বলাযায় অবশ্যই পারে। কেন পারে তাহা বলিতেছি।

* * *

প্রেমই হইল জীবের জীবন স্বরূপ, কিন্তু কৃষ্ণ ভুলিয়া জীব এই প্রেম হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে, কাজেই জীবের আত্ম-বিস্মৃতি আসিয়া প্রেমই যে জীবের জীবন স্বরূপ, সেই জীবন যে সুখস্বরূপ, একথা ভুলিয়া যায়।

'কৃষ্ণভুলি যেইজীব অনাদি বহির্ম্মুখ।
একারণে মায়া তারে দেয় সংসার দুঃখ ॥"

কাজেই শ্রীকৃষ্ণ প্রেমোন্মুখতাই জীবনের প্রকৃত আকর্ষণ, জীব যদি মায়া বিক্ষিপ্ত না হয় তবে শ্রীকৃষ্ণের প্রেম সাগরেই চিরদিন নিমজ্জিত রহে। মহাভাব স্বরূপিনী শ্রীমতী রাধিকাই এ বিষয়ে জীবের একমাত্র শিক্ষাগুরু, কিন্তু লোকে প্রেমময়ী শ্রীরাধাকে চিনিল না তাই শ্রীরাধার প্রাণবল্লভ প্রেমলীলা প্রচার জন্য রাধাভাব কান্তি লইয়া নদীয়ায় উদয় হইলেন এবং জীবজগতে নিজে আচরণ করিয়া দেখাইলেন যে, প্রেমই জীবের পঞ্চম পুরুষার্থ।

নিভৃত চিন্তা।

লীলা-মানুষ বিগ্রহ শ্রীভগবান যখন মানবের আকার ধারণ করিয়া জগতের মধ্যে আগমন করেন, তিনি ধরা না দিলে কেহই তাঁহাকে ধরিতে পারে না। তাঁহাকে ভক্তাধীন বলা হয়—বাস্তবিক তিনি

ভক্তজনের উপর দয়াপরবশ হইয়া ভক্তের অধীন হয়েন এবং ভক্তকে লইয়া তাঁহার কার্য্য সমাধা করেন ও ভক্তকে আনন্দ দান করিয়া থাকেন।

তিনিই আশার আশা, অসহায়ের সহায়। তিনি যেমন দয়া করিতে সক্ষম, তিনি যেমন ভালবাসা দান করিতে ও লইতে পারেন মোট কথা তিনি যেমন বিমল আনন্দ দান করিয়া জীবকে মাতাইয়া রাখিতে পারেন তেমন আনন্দ তেমন ভালবাসা আর কেহ দিতে পারে না। তিনি নিজে আনন্দময় তজ্জন্য তাঁহার শ্রীনাম যিনি উচ্চারণ করেন, যিনি শ্রীনামে মজিতে পারেন তিনিও মরজগতে থাকিয়া অপার অতুলনীয় আনন্দরস উপভোগ করিয়া ধন্য হন। সঙ্গীত দ্বারা তাঁহার অর্চ্চনা করিলে তিনি সঙ্গীতের মধ্যে সুর তাল ও লয়ের একমাত্র বিষয় হইয়া জ্বালাময় সংসারের পারে জীবকে স্থান দান করিয়া থাকেন। তাঁহার অমৃতবর্ষী শ্রীনাম, লীলা ও রূপ হৃদয়ে উদয় হইলে হৃদয়ের দুর্ব্বাসনারূপ কোলাহল দূর হইয়া নির্জ্জনতাময় হইয়া নিশিদিন প্রেমানন্দে মজিয়া থাকে।

"আপনি আচরি ধর্ম্ম জগতে শিখায়" তাই ভক্তজনের একমাত্র আশ্রয় শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের শেষ দ্বাদশ বৎসর নীলাচলে কাশী মিশ্রের বাটীতে গম্ভীরায় অবস্থান করিয়া এই রস নির্জ্জনে স্বরূপদামোদর ও রায় রামানন্দের সহিত আস্বাদন করিয়া জীবের জন্য রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। আর তাহাই হইল শুদ্ধ প্রেমিকের একমাত্র গ্রহণীয়। আত্মারাম মুনিগণ যে শ্রীভগবানকে অহৈতুকী ভক্তির দ্বারা ভজনা করিয়া গিয়াছেন, তাহার কারণ তাঁহারা আত্মপ্রেমিক ছিলেন ও সেই আত্মপ্রেম সফল জন্য যিনি সমস্ত অনির্ব্বচনীয় রসের নিদান, যিনি সমস্ত অতুলনীয় রূপে রূপবান, যিনি সমস্ত অপার অতুলনীয় প্রীতির একমাত্র আশ্রয় তাঁহাকে তাঁহাদের আত্মপ্রেমের দ্বারা ভজনা করিয়া যথার্থই আত্মারাম হইয়া ছিলেন।"

"হরি, হরি, হরি"—আমার এমন দিন কবে হইবে যে দিন সেই শ্রী-গৌররূপী পরমব্রহ্মের অপ্রাকৃত রূপ রসে চিত্তকে একেবারে বহু যুগ যুগান্তরের জন্য ডুবাইয়া দিতে পারিব! হায়, হায়, এমন দিন কবে হইবে যে দিন আনন্দময়ের অপার করুণা, অফুরন্ত স্নেহ পূর্ণমাত্রায় লাভ

করিয়া প্রেমময়ের প্রেমে ভাসিয়া যাইব। প্রভু আমার অবশ্যই তাহা করিবেন—কারণ আমি যে তাঁহর নিকট কেবল তাহাই চাহি। চিদানন্দ-রূপী প্রভু আমার শুদ্ধজ্ঞানরূপ, শুদ্ধাভক্তিরূপ, শুদ্ধপ্রেমরূপ। তিনি যে বাঞ্ছাকল্পতরু—তাঁহার নিকট অন্য ফল অর্থাৎ ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ ফল কামনা না করিয়া প্রেমফলের প্রার্থী হইলে তিনিই কৃষ্ণপ্রেমফল দান করিবেন—যাহার ফল আত্মসুখ বিসর্জ্জন ও শ্রীগুরু কৃষ্ণার্থে সর্ব্বময় চেষ্টা ও শান্তি সুখ উপলব্ধি। শ্রীভক্তমাল গ্রন্থ বলেন,—

"অতএব গুরু ইষ্ট গুরু বন্ধু হন।
গুরু হৈতে মিলে কৃষ্ণ মিলে প্রেমধন॥"
"গুরুভক্তি বিনা যদি শতযুগ ধ্যায়।
প্রেম কভু নাহি মিলে সব ব্যর্থ হয়॥"

সাধারণ জীব কামের তাড়ণে জর্জ্জরিত, সাধারণ জীব এই কাম্য বস্তুর আশায় প্রলুব্ধ হইয়া সমস্ত রিপুর বশবর্ত্তী হয় ও চুরি-নারী-মিথ্যা-সংশ্রবে সতত শান্তি সুখের জন্য আকাঙ্ক্ষিত হইয়া যেরূপ দুঃখময় ও ভারযুক্ত জীবন বহন করে তাহাতে সংশয় ও অবিশ্বাস আসিয়া পরমার্থধন শ্রীগুরু ইষ্টের শ্রীপাদপদ্মে ভক্তি ও প্রীতি হারাইয়া ফেলে। "হরি, হরি—আমর মত অভাগা আর কে আছে, এই সমস্ত চিন্তা মনে আসিয়াও মন আমার একমাত্র সেই শ্রীপাদপদ্ম লাভের জন্য মত্ত হয় না!

বাস্তবিক পক্ষে আমি কাঙ্গাল ও দরিদ্র—তবে একমাত্র ভরসা তিনি কাঙ্গালজনের বন্ধু, অতএব এই অভাগা সেই বন্ধুকে সর্ব্বদা যদি হৃদয়ে গ্রহণ না করে তবে এই অভিপ্সিত দেশ হইতে দূরে যাইয়া কামের পীড়ণে মোহের তাড়ণে অনন্ত কালের জন্য দুঃখভোগ কেন না করিবে? Imitation of Christ বলেন, man considers the actions but god weighs the intentions." অবোধ মনরে, তোর যদি সেই অকৃত্রিম বন্ধুলাভের জন্য তীব্র ইচ্ছা না থাকিয়া কেবল অন্যবিধ ফল আকাঙ্ক্ষা থাকে তবে আর তোর মঙ্গল কি করিয়া হইবে?

তাই বলি মন অন্য চিন্তা ত্যাগ করিয়া চিন্তামণির চিন্তাতে মত্ত হও। তোমার অশেষ মঙ্গললাভ হইবে। তোমাতে যত যত ভাব উপস্থিত হয় সেই সমস্ত ভাব তাঁহাতে অর্পণ কর,—তাহাতে তোমার কোন অভাব থাকিবে না। তাঁহার উপর যে কোন ভাবের উদয় হইলে তাহাই দিব্য

ভাব। দিব্য যাহা তাহা কখনই আনুমানিক নহে। যোগাচার্য্য সর্ব্ব-ধর্ম্ম নির্ণয় সার গ্রন্থে লিখিয়াছেন, "ভগবানের প্রতি যাহার কোন ভাব হয়, তাহার নিকট ভগবান আনুমানিক নহেন। যাহার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয় তিনি ভগবানকে দর্শন স্পর্শন করেন, তিনি তাঁহাকে সম্ভোগ করেন। যাঁহার প্রতি কোন ভাব হয় তাঁহাকে সম্ভোগ ব্যতীত উহা হয় না। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত বলেন—

"যার যেই ভাব সেই সর্ব্বোত্তম।
তটস্থ হইয়া বিচারিলে আছে তারতম॥"

সর্ব্বভাবেই তাঁহাকে সম্ভোগ করা যায় ইহা নিশ্চয়, কিন্তু মাধুর্য্য ভাবের উদয় হইলে ঐশ্বর্য্যভাব সেখানে সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে। তথাপি শ্রীমদ্ভাগবত দশম স্কন্ধে নবম অধ্যায়ের দ্বাদশ শ্লোকে দেখিতে পাই—

"তং মত্বাত্মজমব্যক্তং মর্ত্ত্যলিঙ্গমধোক্ষজং।
গোপীকোলূখলে দাম্না ববন্ধ প্রাকৃতং যথা॥"

গোপী যশোদা সেই নরাকারে প্রতীয়মান অধোক্ষজকে আত্মজ জ্ঞান করিয়া প্রাকৃত বালকের ন্যায় রজ্জুর দ্বারা উদূখলে বন্ধন করিয়া-ছিলেন। তাঁহার উপর শুদ্ধ ভাবযুক্ত ভালবাসা অর্পিত হইলে তিনি সকাম দ্রব্যের পরিবর্ত্তে তাঁহার নিজেকেই দান করিয়া থাকেন—এইরূপ একটী শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত প্রসঙ্গ মনে হইল।

শ্রীকৃষ্ণ যখন গুরুগৃহে থাকিয়া পাঠ অভ্যাস করিতেন সেই সময় সুদামা নামক এক ব্রাহ্মণ বালকের সহিত তাঁহার অত্যন্ত সখ্যভাব হইয়া ছিল। সুদামা যখন যাহা মিষ্ট ফল পাইতেন তাহা শ্রীকৃষ্ণের মুখে তুলিয়া দিতেন - না দিলে বলিতেন, "সখা, কৈ আমাকে অদ্য কিছু খাইতে দিলে না?" এইরূপে সান্দীমুনির পাঠশালায় পাঠ সমাপন করিয়া কিছুকাল পরে যখন তিনি দ্বারকাতে রাজাধিরাজ রাজচক্রবর্ত্তী হইয়াছেন সেই সময় অতি দরিদ্র স্বধর্ম্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ সুদামা একদিন পতিব্রতা স্ত্রীর উপদেশে বন্ধুকে দর্শন করিবার জন্য যাইতে প্রস্তুত।

ধন্য ব্রাহ্মণ সুদামা! তুমি যথার্থ পতিপরায়ণা স্ত্রী লাভ করিয়াছিলে —যাহার প্রেরণায় অনেক দিন পরে সর্ব্বজনের পতি শ্রীকৃষ্ণ দর্শন লাভ জন্য তোমার সময় উপস্থিত হইল। ঐশ্বর্য্যলাভে শ্রীকৃষ্ণ আজ রাজচক্র-বর্ত্তী আর তুমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ, তুমি সেখানে কেমন করিয়া যাইবে?

হয়ত রাজপুরীর মধ্যে প্রবেশাধিকারও লাভ করিতে পারিবে না—এই সব মনে করিয়া সঙ্কুচিত হইতেছ ? কিন্তু তুমি কি জান না যে, তিনি ভক্তের নিকট চিরদিনের জন্য বিক্রীত। যাও, যাও, অনেক দিনের পর ঐ দরিদ্রজনের একমাত্র পতি ও ভক্তজনের আশ্রয় শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া সর্ব্বার্থ সিদ্ধ কর। যাও ব্রাহ্মণ, তোমারে নিকট অভাগা করযোড়ে প্রার্থনা করিতেছে, তোমার সখাকে বলিও তিনি যেন চিরদিনের জন্য এই অভাগাকে তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে স্থান দান করেন। তুমি তাঁহার সখা তুমি বলিলে অবশ্যই তিনি তোমার কথা রক্ষা করিবেন। ব্রাহ্মণী এক দিবস সুদামাকে বলিতেছেন, "আপনি দারিদ্র যন্ত্রণায় ক্লিষ্ট অথচ আপনার নিকট শুনিয়াছি সেই রাজাধিরাজ শ্রীকৃষ্ণ আপনার বন্ধু। তাঁহার নিকট গিয়া আপনার দুঃখ নিবেদন করুন—অবশ্যই তিনি আপনার দুঃখ মোচন করিবেন।" ধন্য ব্রাহ্মণী তুমি সত্যই বলিয়াছ। তাঁহাকে অভিলষিত যে কোন বিষয়ের জন্য একবার মনে সঙ্কল্প করিলেও তিনি তাহা পূরণ করেন। তোমাদের জাগতিক অর্থ জন্য দারিদ্রতা ত নষ্ট হইবেই, এতদ্ব্যতীত দরিদ্রজনের একমাত্র গতি তাঁহাকেও চিরকালের জন্য লাভ হইবে।

ব্রাহ্মণ বলিতেছেন, "আমি নিজের দারিদ্রতা সম্বন্ধে বন্ধুকে কিছু বলিতে পারিব না।" ব্রাহ্মণী বলিতেছেন, "তাহা না বলুন, কিন্তু বন্ধুর সহিত অনেক দিন যাবৎ দেখা হয় নাই—একবার দর্শন করিয়াই আসুন।

ব্রাহ্মণ একদিন মধ্যাহ্নে নিজের সেবা পূজা শেষ করিয়া শ্রীকৃষ্ণদরশনে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন এমন সময় সেই গুরুকূলে অবস্থানের কথা মনে করিয়া স্ত্রীকে বলিতেছেন, "প্রিয়ে, বন্ধুর জন্য কিছু খাওয়ার জিনিষ লইয়া যাইতে হইবে, কারণ তিনি যখন বলিবেন "বন্ধু, অনেক দিন পরে আসিয়াছ, কৈ আমার জন্য খাওয়ার জিনিষ কি আনিলে ? তখন আমি কি বলিব ?"

ব্রাহ্মণের বৃত্তি ভিক্ষা। ঘরে তণ্ডুলকণাও নাই। ব্রাহ্মণী স্বামীর মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া প্রতিবেশিনীদিগের নিকট হইতে চারি মুষ্টি অপরিষ্কৃত চিপিটক আনিয়া স্বামীর হস্তে দিলেন। তিনি তাহা চীর বসনে বাঁধিয়া গোপন করিয়া লইয়া বন্ধু-দর্শনোদ্দেশে যাত্রা করিলেন।

দ্বারকায় পৌঁছিয়া রাজ অন্তঃপুর মধ্যে বিনা বাধায় (শুধু দ্বারকা নগরীতে কেন, বৈকুণ্ঠ, গোলক কৈলাস--সর্ব্বস্থানেই ব্রাহ্মণের চিরদিন অবারিত দ্বার) প্রবেশ করিলেন। সেই সময় শ্রীকৃষ্ণ দেবী রুক্মিণীর শয়ন মন্দিরের পর্য্যাঙ্কে বিশ্রাম করিতেছিলেন এবং শ্রীমতী রুক্মিণী দেবী তাঁহাকে ব্যজন করিতেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ বাল্যবন্ধু সুদামাকে শয়ন কক্ষের সমীপবর্ত্তী দেখিয়া বন্ধুসমাগমে অত্যন্ত হৃষ্ট হইলেন এবং রুক্মিণীকে বলিলেন, "ইনি আমার অত্যন্ত প্রিয় বন্ধু। ইনি আসিবামাত্র ইহার পরিচর্য্যা করিবে।" ইহা বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া নিজেই অগ্রসর হইয়া বন্ধুকে সমাদর পূর্ব্বক বক্ষে ধারণ করিয়া প্রেমাশ্রু মোচন করিতে করিতে স্বীয় শয়ন কক্ষের মধ্যে লয়ইা আসিয়া নিজ পর্য্যাঙ্কোপরি উপবেশন করাইলেন। ওদিকে রাজমহিষী রুক্মিণী সখিগণের সহিত স্বহস্তে সেই কুৎসিত বসন, মলিনবেশ, শীর্ণকলেবর ব্রাহ্মণের ব্যজন ও পরিচর্য্যা ইত্যাদি আরম্ভ করিলেন। একটু বিশ্রামের পর উভয়ে উভয়ের কুশল বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিয়া গুরুকুলে অবস্থান সময়ের কথায় অনেক সময় যাপন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণের শয়নকক্ষ হইতে বহির্গমনের কাল উত্তীর্ণ হওয়ায় অন্তঃপুরবাসিজনগণ ব্যস্ত হইয়া ঔৎসুক্যবশতঃ শ্রীকৃষ্ণের শয়ন মন্দিরের সমীপবর্ত্তী হইয়া দেখিলেন তাঁহাদিগের রাজা ছিন্ন অপরিস্কৃত বসন পরিহিত একজন দরিদ্র ব্রাহ্মণের সহিত একাসনে বসিয়া আনন্দে বিভোর আছেন। অন্তঃপুরবাসিগণ দেখিতেছেন শ্রীকৃষ্ণ ও ব্রাহ্মণ উভয়ে পরস্পর পরস্পরের কর গ্রহণ করিয়া গুরুকুলে বাস সময়ের অনুষ্ঠিত বিষয়ের কথা সকল কহিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ বন্ধুবরকে বলিতেছেন যে, তিনি পতিপ্রাণা ভার্য্যালাভ করিয়াছেন কিনা। ব্রাহ্মণ গৃহমেধী বটেন কিন্তু গৃহী হইয়াও তাঁহার অন্তঃকরণ কামে বিমোহিত হয় নাই বা ধন-রত্নাদি বিষয়ে অত্যন্ত প্রীতি না থাকায় সেই জগন্নিবাস ও ভক্তের আশ্রয়কে লাভ করিয়াছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন "বন্ধু আমাদের সেই গুরুকুলে বাস তোমার স্মরণ হয় কি? যে গুরুকুল হইতে জ্ঞাতব্য বিষয় অবগত হইয়া সংসার সাগর পার হওয়া যায়? পিতা আদ্যগুরু পুজনীয়, আর যাহা হইতে সমস্ত সৎকর্ম্মের সম্ভব হয় অর্থাৎ যিনি বেদাধ্যাপক তিনি দ্বিতীয় গুরু এবং সকল আশ্রমীর জ্ঞানদগুরু আমি তৃতীয়—আত্ম অপেক্ষাও পুজনীয়।

যাহারা গুরুরূপী আমার উপদেশ পালন করিয়া সুখে ভবার্ণব হইতে উত্তীর্ণ হন, বর্ণাশ্রমীদিগের মধ্যে তাঁহারাই সুপণ্ডিত। আমি সর্ব্বভূতাত্মা, গুরুশুশ্রূষা দ্বারা যদ্রূপ তুষ্ট হই, গৃহস্থধর্ম্ম, ব্রহ্মচর্য্য, বানপ্রস্থধর্ম্ম ও যতি-দিগের আচারেও তদ্রূপ সন্তুষ্ট হই না। সুতরাং সকল কার্য্যে বিশুদ্ধ ভাবে গুরুর শ্রীপাদপদ্মে আত্মসমর্পণ একান্ত কর্ত্তব্য কারণ তাঁহার অনু-গ্রহ হইলেই মানবের পরিপূর্ণ শান্তি লাভ হয়।

শ্রীকৃষ্ণ সেই ব্রাহ্মণের সহিত এইরূপ কথোপকথন কালে হাস্য করিয়া সখার মুখ নিরীক্ষণ করিতে করিতে কহিলেন, "বন্ধু তুমি এত কাল পরে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলে, আমার জন্য গৃহ হইতে কি উপায়ন আনয়ন করিয়াছ? ভক্তজনেরা প্রীতিপূর্ব্বক আমার জন্য অতি সামান্য দ্রব্যও আনয়ন করিলে তাহাতেই আমার যথেষ্ট পরি-তৃপ্তি হয়।

। পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।

তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রয়তাত্মনঃ॥

পত্র, পুষ্প, ফল জল যে যাহা ভক্তিপূর্ব্বক আমাকে অর্পণ করে, সেই ভক্তার্পিত দ্রব্য আমি প্রীতিপূর্ব্বক গ্রহণ করি।

এই সমস্ত শুনিয়া ব্রাহ্মণ লজ্জায় অধোমুখ হইয়া রহিলেন ও তাঁহার আনীত সামান্য দ্রব্য দান করিতে ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন।

সকল ভূতের অন্তর্য্যামী ভগবান ব্রাহ্মণের বিষয় অবগত হইয়া চিন্তা করিলেন, "এই ব্রাহ্মণ আমার সখা, পত্নীর প্রিয়েচ্ছু হইয়া আমার নিকট আসিয়াছেন। ইহাকে মর্ত্ত্যদুর্লভ সম্পদ প্রদান করিব।" এই চিন্তা করিয়া তিনি ব্রাহ্মণের চীরবন্ধন হইতে "ইহা কি" বলিয়া সেই চিপিটক-কণাসকল গ্রহণ করিলেন। এবং তাড়াতাড়ি একমুষ্টি মুখে দিয়া বলিতেছেন, "বন্ধু এই পরম উপাদেয় জিনিষ আমার জন্য আনিয়াছ? বিশ্বাত্মা যে আমি, আমার এই সামান্য দ্রব্যেই পরিতৃপ্ত হয়।" ইহা বলিয়া দ্বিতীয়বার যেমন গ্রহণ করিবেন অমনি রুক্মিণী দেবী শ্রীকৃষ্ণের হস্তধারণ করিলেন। রুক্মিণী দেবী মনে করিতেছেন "একমুষ্টি ভোজন করায় ব্রাহ্মণকে সর্ব্ব সম্পত্তি দান করা হইল। দ্বিতীয় মুষ্টি ভোজনে আমাকেও ইহার অধীন হইতে হইবে।"

প্রভো, তুমি অস্পৃশ্যা শবরী চণ্ডালিনীর উচ্ছিষ্ট ফল গ্রহণ করিয়া-

ছিলে। তুমি বিদুরের তণ্ডুলকণা ভক্ষণ করিয়াছিলে। তুমি এমন না হইলে তোমাকে জীব লাভ করিতে পারে? প্রীতির সহিত ভাব করিয়া তোমায় ডাকিলে তুমি দীন হীন বিচার কর না। আমি অভাগা দুর্ব্বাসনাময়, সংসারের জালায় অভিভূত, জানি না কি ভাবে তোমার সহিত ভাব করিলে তুমি সেই ভাব গ্রহণ করিয়া থাক। যে ভাব করিলে তোমাকে লাভ সুলভ হয় দয়া করিয়া সেই সহজ ভাবটি দান করিয়া চিরদিনের জন্য তোমার শ্রীপদপ্রান্তে একটু স্থানদান কর ইহাই শেষ প্রার্থনা।

ব্রাহ্মণ সেই রাত্রি শ্রীকৃষ্ণের গৃহে অবস্থান করিয়া অতি উপাদেয় আহার্য্য ভোজন ও পান করিয়া পরম আনন্দিত হইয়া নিজেকে অত্যন্ত সুখী মনে করিলেন।

পরদিন প্রাতঃকালে শ্রীকৃষ্ণের নিকট বিদায় লইয়া গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে শ্রীকৃষ্ণ-স্পর্শনলাভ ও যে বক্ষে স্বয়ং লক্ষ্মীকে ধারণ করেন সেই বক্ষে তাঁহাকে ধারণ করিয়াছেন—এই সমস্ত স্মরণ করিয়া নিজ দারিদ্র্যের বিষয় বিস্মিত হইয়াছেন। ব্রাহ্মণ মনে করিতেছেন, আমি অতি দরিদ্র ও নীচ আর কোথা সেই শ্রীভগবান তিনি আমাকে বক্ষে ধারণ করিয়াছেন ও পরম শুশ্রুষা দ্বারা যথোচিত সম্ভাষণ করিলেন। আমার দারিদ্র্যদুঃখ না থাকিলে আমি তাঁহাকে ভুলিয়া যাইব এই ভাবিয়াই বোধ হয় তিনি আমাকে ধনদান করেন নাই। এইভাবে চিন্তা করিতে করিতে ব্রাহ্মণ স্বীয় বাটীর নিকট গিয়া দেখেন এক অপরূপ পুরী বিদ্য-মান—বিচার করিতেছেন এ কাহার বাটী, আমার পর্ণকুটির কি প্রকারে কোথায় গেল? এই অদৃষ্ট-পূর্ব্ব প্রাসাদ কাহার কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইল? এমন সময় দেবতুল্য নরনারীগণ আসিয়া মনোহর গীত বাদ্যের দ্বারা তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলেন। ব্রাহ্মণী ব্রাহ্মণের আগমনবার্ত্তা অবগত হইয়া অত্যন্ত হর্ষ সহকারে স্বীয় স্বামীকে পুরন্দর পুরীর ন্যায় সেই সুন্দর পুরীমধ্যে লইয়া গেলেন। পুরী মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখেন সেখানে দেবদুর্লভ ঐশ্বর্য্য বিরাজ করিতেছে। ব্রাহ্মণ মনে করিতেছেন আমি দরিদ্র আমার এই সমৃদ্ধি শ্রীকৃষ্ণ দর্শন ব্যতীত অন্য আর কিছু দ্বারা উৎপন্ন হয় নাই, এক মুষ্টি চিপিটক গ্রহণ করিয়াই আমাকে এত সম্পদ দান করিলেন, নাজানি আর একমুষ্টি গ্রহণ করিলে কি হইত।

যাহা হউক জাগতিক সম্পদ লাভ করিয়া তাহাতে মোহিত হইয়া কৃষ্ণকে ভুলিয়া গেলেই জীবের পতন অবশ্যম্ভাবী, তাই ব্রাহ্মণ তাহা লাভ করিয়া প্রার্থনা করিতেছেন, জন্মে জন্মে তাঁহার সহিত আমার যেন প্রীতির সম্বন্ধ বজায় থাকে, আর সেই সর্ব্বগুণালয় মহতো মহীয়ানের সংসর্গ প্রাপ্ত ভক্তের সহিত প্রকৃষ্ট সঙ্গ হয়। আর ভাবিতেছেন ধনের আসক্তি দ্বারা পতন অনিবার্য্য সুতরাং তিনি তাহা ভক্তকে প্রদান না করিয়া দৃঢ়ভক্তি দান করিয়া থাকেন। এইরূপ নিশ্চয় করিয়া অনাশক্ত লইয়া স্ত্রীর সহিত বিষয় ভোগ করিতে লাগিলেন। কিছুকাল এইরূপ বিষয় ভোগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ দর্শনাভিলাষে ধ্যান যোগে আত্মবন্ধন শিথিলীকৃত হইয়া বৈকুণ্ঠে গমন করিলেন। অদ্যকার নিভৃত চিন্তা সমাধা করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ পদে প্রার্থনা করিতেছি যে এইরূপ নিভৃত চিন্তাই যেন এই অভাগার একমাত্র ভজনের বিষয় হয়।

শ্রীমুকুন্দ লাল গুপ্ত

গোপী-প্রেম

ধর্ম্মৈকপ্রাণ সুদৃঢ়ব্রত ভারতবাসী মানব জীবনের একমাত্র সাফল্য যে শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তি তাহা উত্তম রূপেই বুঝিয়াছিলেন এবং সেই পুরুষার্থ সাধন জন্য তাঁহারা যে কত অসাধ্য সাধন করিয়াছেন বেদ পুরাণ ইতিহাস তাহার জলন্ত সাক্ষ্য দিতেছে। জ্ঞানীগণ অবাঙমনস গোচর চিৎস্বরূপকে ধ্যানযোগে সাক্ষাৎকার করিয়া ব্রহ্মানন্দে ডুবিয়া রহিয়াছেন যোগীবর্গ মানবের শতবর্ষ পরমায়ুকে যোগবলে সহস্রবর্ষ করিয়া কঠোর তপশ্চরণ কৌশলে সেই পরমাত্মা চিন্ময় স্বরূপকে করতল গত আমলকবৎ লাভ করিয়া ভূমানন্দে মজিয়া আছেন কিন্তু ভক্তিশাস্ত্র ঐরূপ প্রাপ্তিকেও বড় একটা আমলেই আনেন নাই,

"ঐছে শাস্ত্র কহে—কর্ম্মজ্ঞান যোগ ত্যজি।
ভক্তে কৃষ্ণ বশ হয়—ভক্ত্যে তাঁরে ভজি॥

আনন্দস্বরূপ চিদ্‌ব্রহ্মকে অনুভব করিলাম বা পরমাত্ম স্বরূপকে

আত্মায় আত্মার প্রত্যক্ষ করিলাম ইহাকে বড় বেশী কথা বলিয়া ভাগবত মনে করেন নাই তিনি বলেন "কৃষ্ণ মোর প্রভু, ত্রাতা" এ সম্বন্ধে ভবভীত জন কৃতার্থ হইতে পারেন কিন্তু উহাতে ভক্তের পিপাসা মিটে না, ভক্তের সহিত ভয়ের কোন সম্পর্ক নাই, ভক্ত তাই ঐরূপ কৃষ্ণপ্রাপ্তি আদৌ প্রার্থনা করেন না। "কৃষ্ণপ্রাপ্তির উপায় বহুবিধ হয়। কৃষ্ণপ্রাপ্ত্যের তার তম্য বহুত আছয়॥" ভক্ত কৃষ্ণচন্দ্রকে ঠাকুর করিয়া বা উদ্ধারকর্ত্তা করিয়া রাখিতে পারিবেন না। ভক্ত কৃষ্ণকে একেবারে নিজের আয়ত্তাধীন করিতে চাহেন। তাই বুঝি ভক্ত রঘুপতি শ্রুতি স্মৃতি উপেক্ষা করিয়া বলিতেছেন আমি ব্রজরাজ নন্দের অনুগত হইয়া তাঁহার সেবা করিব, তাঁহার অনুগত হইলে আমি তাঁহার কৃপায় পূর্ণব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে ব্রজ ও নন্দদুলাল রূপে পাইয়া তাঁহার সেবা করিয়া ধন্য হইব—

শ্রুতিমপরে স্মৃতিমপরে ভারতমন্যে ভবভীতাঃ
অহমিহ নন্দং বন্দে যস্যালিন্দে পরং ব্রহ্ম॥

আবার জীবের চরম প্রাপ্তির দিকে তাকাইয়া ভাবাবেশে রঘুপতি বলিতেছেন—সকল ব্রজ গোপীদের প্রেমে মুগ্ধ হইয়া সেই অখিল ভুবন-পতি নাগর সাজিয়া কি করিতেছেন—সেই ব্রজ গোপীদের অনুগতা দাসী হইব তাহা হইলে নাগর চূড়ামণিকে আমার হাতে পড়িতে হইবে। সময়ে সময়ে শ্রীমতীর মানভঞ্জন জন্য হয়তো আমারও খোসামদ করিতে হইবে।

কংপ্রতি কথয়িতুমীশে সংপ্রতি কো বা প্রতীতিমায়াতু
গোপতি তনয়া কুঞ্জে গোপ বধুটী বিটং ব্রহ্ম।

ভক্তজন বাঞ্ছিত সেবানন্দ সিন্ধুর নিকট ব্রহ্মানন্দকে ভাগবত গোপ-দের সহিত তুলনা করিয়াছেন।

"কোটী ব্রহ্মানন্দ নহে সেবানন্দ কাছে"—

প্রেম হইতেই এই সেবানন্দ লভ্য হয়।

"পঞ্চম পুরুষার্থ এই প্রেম মহাধন। কৃষ্ণের মাধুর্য্যরস করয়ে আস্বদন॥
প্রেমা হৈতে কৃষ্ণ হয় নিজ ভক্ত বশ। প্রেমা হৈতে পাই কৃষ্ণ সেবা সুখরস॥"

ভক্তের অধিকার ও স্পর্দ্ধা শুনিয়া চমৎকৃত হইতে হয়, ভক্ত ভগ-বান্‌কে আপনার নিজজন করিয়া একেবারে করায়ত্ত করিতে চাহেন।

"ভক্তিরেবং নয়তি, ভক্তিরেবং দর্শয়তি" ভক্তিই সেই স্বতন্ত্র প্রেম

স্বরূপকে টানিয়া আনে, সেই অখিল রসামৃত মূর্ত্তিকে দেখাইয়া দেয়। তাই শ্রীভাগবত প্রমাণ দিতেছেন।

ত্বং ভক্তিযোগ পরিভাবিত হৃৎসরোজ,
আয়সে শ্রুতেক্ষিত পথো নমু নাথ পুংসাং।
যদ্‌যদ্ধ্যায়ত উরুগণ বিভাবয়ন্তি,
তত্তদ্বপুঃ প্রণয়সেসদনুগ্রহায়

হে নাথ, তুমি ভাবগ্রাহী ভক্তের বিশুদ্ধ ভক্তি ভাবাঢা হৃৎকমলে বাস কর। শ্রুতি আদি শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট পন্থা ব্যতীত ভক্ত তোমার যেরূপ রূপ লীলা ধ্যান করেন সেই ভক্তের ইচ্ছা পূর্ণার্থে তোমাকে সেই ভাবে সেই রূপ বপু প্রকটিত করিতে হয়।

শ্রীকৃষ্ণকে পাওয়া আর শ্রীকৃষ্ণকে নিজের হাতে পাওয়া দুইটিতে রাতদিন তফাৎ। আনন্দঘন শ্রীভগবানের স্মরণে মননে, দর্শনে, কীর্ত্তনে সর্ব্বানুশীলনেই অপার আনন্দ কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ সেবাতে যে আনন্দ, সে আনন্দ অতুলনীয়। "কৃষ্ণদাস অভিমানে যে আনন্দ সিন্ধু। কোটি ব্রহ্মানন্দ নহে তার এক বিন্দু॥"

ঠাকুর বৃন্দাবন দাস কৃষ্ণদাসের অধিকার বলিতেছেন—

"অল্প হেন না মানিহ দাস হেন নাম,
অল্প ভাগ্যে দাস নাহি করে ভগবান॥
দাস হয় কৃষ্ণের পিতামাতা ভগ্নি ভাই।
দাস বিনা কৃষ্ণের দ্বিতীয় আর নাই॥
যেরূপ করয়ে দাসে সেইরূপ হয়।
দাসে কৃষ্ণ করিবারে পারয়ে বিক্রয়॥"

এই প্রেম সেবার পরিপূর্ণ পরিণতি হইয়াছে মধুর ব্রজধামে, আর দাস্য সখ্য বাৎসল্য ও মধুর এই চতুর্বিধ ভাবের ভক্ত মধ্যে মধুর ভাবই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

পরিপূর্ণ কৃষ্ণ প্রাপ্তি এই প্রেমা হৈতে।
যেই প্রেমে বশ কৃষ্ণ কহে ভাগবতে॥
এই প্রেমার অনুরূপ না পারে ভজিতে।
অতএব ঋণীহয় কহে ভাগবতে॥ চৈঃ চঃ

মথুরা বিলাসী রাজোচিত বেশধৃত শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে কুরুক্ষেত্র মধ্যে পাইয়া ক্ষোভে ও রোষে শ্রীমতী রাধিকা প্রাণবঁধুকে মিষ্ট মিষ্ট করিয়া বেশ দুকথা শুনাইয়া দিলেন "বলি ওহে ব্রজের জীবন, গোপীজন বল্লভ বেশ সুখে আছ ত, তোমার প্রেমের বলিহারি যাই, রাজ্য ঐশ্বর্য্য হাতি ঘোড়া পাইয়া কিরূপে মাতা পিতা সখা সখীগণকে ভুলিয়া আছ, যাক্ তুমি সুখে থাকিলে তাহাতেই আমাদের সুখ।

ধৃষ্ট নিলাজ বঁধু তখন নিরুপায় হইয়া হলপ করিয়া বলিতেছেন— "বলিলে বিশ্বাস করিবেনা আমি যে কি সুখে আছি।"

"শুন প্রাণ প্রিয়ে শুন মোর সত্য বচন
তোমা সবার স্মরণে ঝুঁরো মুই রাত্রদিনে
মোর দুঃখ না জানে কোনজন।"

ব্রজবাসি তোমরা যে আমার কিরূপ মরমের ধন তাহা বলিতে পারি না

"ব্রজবাসী যতজন, মাতা পিতা সখাগণ
সবে হয় মোর প্রাণ সম।
তার মধ্যে গোপীগণ, সাক্ষাৎ মোর জীবন
তুমি মোর জীবনের জীবন।
তোমা সবার প্রেমরসে আমাকে করিলা বশে,
আমি তোমার অধীন কেবল।"

হা গোবিন্দ, তোমার যখন এই অবস্থা অহোরাত্র কাদিয়াও তোমার বিরতি নাই তখন তোমার কাছে কাঁদিয়া আর কি করিব; তুমি যাহাদের জন্য কাঁদিতেন, কাঁদিতে হয় সেই ব্রজগোপিদের নিকটই যাইয়া কাঁদিব!

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের মনের কথা ঠাকুর অন্যদিন প্রিয়সখা অর্জ্জুনকে গোপী মহিমা কীর্ত্তন করিয়া বলিতেছেন

সহায়া গুরবঃ শিষ্যাঃ ভুজিষ্যা বান্ধবাঃ স্ত্রিয়ঃ
সত্যংবদামি তে পার্থ গোপ্যঃ কিং মে ভবন্তি ন।
কৃষ্ণের সহায় গুরু বান্ধব প্রেয়সী।
গোপিকা হয়েন প্রিয়া শিষ্যা সখী দাসী॥

যে গোপীগণের মহিমা স্বয়ং গোপীনাথ বলিয়া শেষকরিতে পারেন নাই, ভক্তশ্রেষ্ঠ উদ্ধব মহারাজ যে গোপীগণের চরণ রেণু প্রার্থনা করিয়া-

ছেন সেই গোপী তত্ত্ব ও গোপীমহিমা জীব কিরূপে বুঝিবে? মথুরার নাগরী-গণই গোপীভাগ্যে ঈর্ষান্বিত হইয়া ক্ষোভে বলিয়াছেন কোন্ কঠোর তপস্যার ফলে গোপীদের এই দুর্লভ ভাগ্য ঘটিয়াছে জানিতে পারিলে আমরাও নাহয় সেইরূপ তপশ্চরণ করিতাম? ইহার উত্তর কলিযুগে সেই গোপীজনবল্লভ শ্রীচৈতন্যদেবের শ্রীমুখেই আমরা পাইতেছি সর্ব্বজ্ঞ-প্রভু শ্রীসনাতনকে বলিতেছেন—দেখ সনাতন বেদাদিকথিত জ্ঞানকাণ্ড, কর্ম্মকাণ্ডের অনুশীলনে বা যোগসাধনায় ঐরূপ সৌভাগ্যের উদয় হইবার কথা নহে, কৃষ্ণমাধুর্য্যসিন্ধুতে মজিবার একমাত্র উপায় রাগমার্গে গোপী অনুগত হইয়া ভজন।

"কর্ম্মজপ যোগজ্ঞান, বিধিভক্তি তপধ্যান
ইহাহৈতে মাধুর্য্য দুর্লভ
কেবল যে রাগমার্গে ভজেকৃষ্ণ অনুরাগে
তাহারে কৃষ্ণ মাধুর্য্য সুলভ ॥"

এই রাগমার্গের ভজন ব্রজ বিনা অন্য কুত্রাপি পাইবে না। ইহার অনুশীলনে শেষে বৈধী ধর্ম্মকর্ম্ম সব ছাড়িয়া যাইবে।

"ব্রজের নির্ম্মল রাগ শুনি-ভক্তগণ।
রাগমার্গে ভজে যেন ছাড়ি ধর্ম্ম কর্ম্ম— ॥"

শ্রীপাদরূপ গোস্বামী রাগের লক্ষণ বলিয়াছেন ইহার দুইটি বিশিষ্ট পরিচয়—প্রথমটি অভিষ্ট বস্তুতে স্বাভাবিকী প্রগাঢ় তৃষ্ণা, তৃষ্ণা যেমন স্বতোদ্ভুত এবং অদম্য অভীষ্ট বস্তুতে ঐরূপ অদম্য পিপাসা হওয়া চাই। দ্বিতীয় লক্ষণটি হইতেছে ইষ্টে আবিষ্টতা, যেমন ভূতাবিষ্ট জীবের নিজের স্বতন্ত্রতা কিছুই থাকেনা গুরুনাই ইষ্টানিষ্ট ধর্ম্মাধর্ম্মাজ্ঞান থাকেনা, রাগের ধর্ম্মও ঐরূপ।

ইষ্টে স্বারসিকী রাগঃ পরমাবিষ্টতা ভবেৎ।
তন্ময়ী-যা ভবেদ্ভক্তিঃ সাত্র রাগাত্মিকোদিতা ॥

এই রাগানুগা ভক্তি প্রচারণজন্য শ্রীগৌরাঙ্গ অবতার। নিজ আচরণ করিয়া প্রভু এই রাগভক্তির অনুশীলন শিখাইয়াছেন।

শ্রীবামাচরণ বসু

অনিত্য জীবনে নিত্য কর্ম্ম।

"নলিনীদলগতজলমতিতরলং
তদ্বজ্জীবনমতিশয় চপলম্।
বিদ্ধি-ব্যাধি-ব্যাল গ্রস্তং
লোকং শোকহতঞ্চ সমস্তম্॥" মোহমুদ্গর)

"পদ্ম-পত্রে বারিবিন্দু যেমন চঞ্চল।
জীবন তেমন হয় অতীব চপল॥
জানিও ক'রেছে গ্রাস ব্যাধি বিষধর।
সমস্ত সংসার তাই শোকে জরজর॥"

পঙ্কজ-দলস্থিত বারিকণার ন্যায় সতত টল টলায়মান এই জীবনে আস্থা সংস্থাপন করিয়া মানব জীবনের উদ্দেশ্য সাধনে শিথিল প্রযত্ন হওয়াই হইল মূঢ়ের কার্য্য। আহারাদি বিষয় ভোগই কেবল মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য নহে। আহার, নিদ্রা, ভয় ও মৈথুন এই বৃত্তি চতুষ্টয় পশু পক্ষ্যাদি জীবনেও আছে আর মনুষ্য-জীবনেও আছে। তবে পশু পক্ষ্যাদির জীবন অপেক্ষা মনুষ্য জীবন যে শ্রেষ্ঠ, তাহার কারণ এই যে, মনুষ্য যে জ্ঞান বলে অপবর্গ সাধনে বা পরমার্থ দর্শনে সক্ষম হয়, পশু পক্ষ্যাদির জীবনে সেই জ্ঞানের অভাব। সুতরাং মনুষ্য জীবনেও যদি সেই জ্ঞানের অভাব ঘটে, তাহা হইলে পশু পক্ষ্যাদির জীবনে ও মানব জীবনে কোন প্রভেদই রহিল না। সকল জীবনই সমান হইল।

অতএব অত্যুৎকৃষ্ট মনুষ্য পদবীতে আখ্যায়িত হইতে হইলে, কেবল আহারাদি বিষয় ভোগে মজিয়া থাকিলে মনুষ্যোচিত কার্য্য করা হয় না; পরন্তু ভোগাদির স্পৃহা পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রকৃত তত্ত্ব বিচার দ্বারা জ্ঞান লাভ করিয়া কালরূপ বিষম বিষধরের করাল কবল হইতে মুক্তি লাভ করাই হইল মনুষ্য জীবনের কর্ত্তব্য কার্য্য। কাল-কবলিত জীবনে জীবনের আশা ও ভোগ সুখাদির চেষ্টা যে কিপ্রকার তাহা যখন পূর্ণব্রহ্ম ভগবান শ্রীরামরূপে অংশ চতুষ্টয়ের সহিত অবনীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন তখন সুলক্ষণাক্রান্ত লক্ষ্মণকে জীব শিক্ষার ছলে তিনি বলিয়াছিলেন যে:—

"ভোগা মেঘ-বিতানস্থ বিদ্যুল্লেখেব চঞ্চলা।
আয়ুরপ্যগ্নি সন্তপ্ত লৌহস্থ জল বিন্দুবৎ॥
যথা ব্যাল গলাস্থাপি ভেকো দংশানপেক্ষতে।
তথা কালাহিনাগ্রস্তো লোকো ভোগানশাশ্বতান্॥"

অর্থাৎ-ভোগ সকল জলদ-জাল-সঞ্চারিনী বিদ্যুল্লতার ন্যায় চঞ্চল; আয়ুও অনল সন্তপ্ত লৌহপিণ্ড-নিপতিত জল বিন্দুর ন্যায় ক্ষণস্থায়ী। বিষধরের কণ্ঠ কুহরে প্রবেশ করিতে করিতেও আহারের জন্য ডাঁশ মশকাদির অপেক্ষা করা ভেকের পক্ষে যেরূপ—কালরূপ মহা-সর্প-কবলিত লোক-দিগের পক্ষে ক্ষণস্থায়ী ভোগ সকলের অপেক্ষা করাও তদ্রূপ। অতএব এই ত্রিতাপ সন্তপ্ত দেহে পতিতজল বিন্দুর ন্যায় অতিঅল্প ক্ষণ স্থায়ীআয়ু বিশিষ্ট জীবনে সংসারের নিবর্ত্তকবিদ্যা অভ্যাসে যত্ন না করিয়া, সংসারের প্রবর্ত্তক অবিদ্যায় অভিভূত থাকাই হইল শোক দুঃখের কারণ।

এই সংসার নিবর্ত্তিকা বিদ্যা অর্থাৎ জ্ঞান লাভ করিতে হইলে জ্ঞানের জনয়িত্রী ভক্তির আবশ্যক। কারণ শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে—

"ভক্তি জনয়িত্রী জ্ঞানস্য ভক্তির্মোক্ষ প্রদায়িনী।
ভক্তি হীনেন যৎকিঞ্চিৎ কৃতং সর্ব্বমসৎ সমম্॥"

আবার ভক্তি উপার্জ্জন করিতে হইলে ধর্ম্মাচরণ আবশ্যক। কারণ ধর্ম্ম হইতেই ভক্তি জন্মে। পূজা যজ্ঞাদি কার্য্য যথাবিধি অচারণ করাই ধর্ম্ম কার্য্য। ইহার প্রমাণ এইযে—

"জ্ঞানাৎ সংজায়তে মুক্তির্ভক্তির্জ্ঞানস্য কারণম্।
ধর্ম্মাৎ সংজায়তে ভক্তির্ধর্ম্মো যজ্ঞাদিকো মতঃ॥"

কিন্তু পূজা যজ্ঞাদি কার্য্য সম্পাদনার্থ এই কলিযুগে দেশ, কাল, পাত্র, মন্ত্র এবং বিশুদ্ধ উপকরণাদির সম্পূর্ণঅভাব অবলোকন করিয়া শাস্ত্র স্পষ্টা-ক্ষরে বলিয়াছেন যে :—

"কৃতে যদ্ধ্যায়তে বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতোমখৈ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌতদ্ধরি কীর্ত্তনাৎ॥

ইহার ভাবার্থ হইল এই যে, সত্যযুগে ভগবানের ধ্যানে, ত্রেতায় নানাবিধ যজ্ঞানুষ্ঠানে এবং দ্বাপরে পরিচর্য্যায় (সেবায়) যে যে ফল লাভ হয়, কলিতে একমাত্র শ্রীহরির নাম কীর্ত্তনে সেই সেই ফল লাভ হয় তাহাতে সন্দেহ নাই।

এই কলিযুগে স্বল্পায়ু বিশিষ্ট দুর্ব্বল মানব গণের পক্ষে, ধ্যান, যজ্ঞ ও পরিচর্য্যা সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত ও অসাধ্য বলিয়াই করুণাময় ভগবান ধর্ম্ম সংস্থাপনের নিমিত্ত শ্রীনবদ্বীপে গৌরাঙ্গরূপে অবতীর্ণ হইয়া ক্ষীণায়ু দুর্ব্বল জীবের উদ্ধারার্থ অতি সহজ উপায় নামব্রহ্মের প্রচার করিয়াছেন এবং মহাসাগর সদৃশ বেদ শাস্ত্রাদি আলোড়িত করিয়া তাহা হইতে সার উদ্ধার করণানন্তর জীবের দ্বারে দ্বারে এই মহামন্ত্র প্রদান করিয়াছেন যে :—

"হরের্ণাম হরের্ণাম হরের্ণামৈব কেবলং।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥

আর এই ধর্ম্মাচরণ এই ক্ষণভঙ্গুর জীবনের যৌবন প্রারম্ভ হইতেই যে অভ্যাস করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয় তাহাও শাস্ত্র বিশেষ রূপে উপদেশ দিয়া বলিয়াছেন যে, "যুবৈব ধর্ম্মশীলস্যাৎ অনিত্যং খলু জীবিতং। কোহি জানাতি কস্যাদ্য মৃত্যুকালো ভবিষ্যতি।"

'চঞ্চল জীবন কখন আছে কখন নাই। বিশেষতঃ প্রাণ বিয়োগের সময় কফ বাত-পিত্ত জনিত রোগে কণ্ঠ রোধ হইয়া আসিলে যখন ইন্দ্রিয়-গণ অবশ হইয়া পড়িবে, তখন তোমার নাম উচ্চারণ করিতে পারিব না, এই ভাবিয়া সাধক প্রার্থনা করিয়াছেন যে, হে পাপহারী শ্রীকৃষ্ণ! তোমার পাদ পদ্মরূপ পিঞ্জরে আমার চিত্তরূপ রাজ হংস এই ক্ষণেই প্রবেশ করুক।

"কৃষ্ণ ত্বদীয়-পাদ-পঙ্কজ পিঞ্জরান্তে, অদ্যৈব মে বিশতু মানস রাজ হংসঃ।
প্রাণ পয়ান সময়ে কফ-বাত-পিত্তৈঃ কণ্ঠাবরোধন বিধৌ স্মরণ কুতস্তে॥

অতএব ব্যাধি বিষধরের কবল হইতে এই শোক দুঃখ মণ্ডিত টল টলায়মান জীবনকে উদ্ধার করিতে হইলে শ্রীনাম ভিন্ন যে উপায়ান্তর নাই, তাহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই।

শ্রীভুপতি চরণ বসু

কেউ কারও নয়—সকলই আপন।

"কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ
সংসারোঽয়মতীব বিচিত্রঃ।
কস্য ত্বং বা কুত আয়াতঃ
তত্ত্বং চিন্তয় তদিদং ভ্রাতঃ॥—মোহ-মুদ্গর।

কেবা তব কান্তা আর কে তব কুমার,
অতীব বিচিত্র এই মায়ার সংসার॥
কোথা হ'তে আসিয়াছ তুমি বা কাহার?
ভাবনা করহ ভাই এই তত্ত্বসার॥"

যাঁহারা বিদ্যা অর্থাৎ জ্ঞান বলে, অবিদ্যা অর্থাৎ অজ্ঞানকে নষ্ট করিয়া প্রকৃত তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছেন, অথবা যাঁহাদের সুকোমল হৃদয়-কমল মায়াবারির উপরিভাগে প্রস্ফুটিত হইয়া বিমল ছটায় শরীর-বন্দরের শোভা সম্পাদন করিয়াছে, অথবা যাঁহাদের মায়া-ছানী পরিপূরিত অন্ধ চক্ষু ভগবৎ পাদপদ্মাসব ঔষধে পরিস্কৃত হইয়া দিব্য দৃষ্টি লাভ করিয়াছে; এই বিচিত্র সংসারে যে কেহ কাহারও নয় অথচ সকলই আপন, আর একমাত্র ভগবানই যে, সর্ব্বভূতের আশ্রয়, অথবা সর্ব্বভূতেই যে তিনি সতত বিরাজমান; তাহা তাঁহারাই বুঝিতে পারিয়াছেন। তদ্ভিন্ন আমার ন্যায় দেহাত্ম বুদ্ধি বিশিষ্ট অজ্ঞানান্ধ জীবের পক্ষে উহা বুঝিয়া উঠা কদাচই সম্ভবপর নহে। মায়া-মোহিত-চিত্ত ব্যক্তিগণের মোহাপনোদন করিবার অভিপ্রায়ে শাস্ত্র এই শিক্ষা দিয়াছেন যে, "এই বিচিত্র সংসারে পিতা, মাতা, ভ্রাতা, পত্নী এবং বন্ধু প্রভৃতির সম্বন্ধ পান্থশালাতে বহু পান্থ সমাগমের ন্যায় এবং নদী মধ্যে স্রোত-সমাহৃত কাষ্ঠরাশি সম্মিলনের ন্যায় অস্থির, সম্পত্তি ছায়ার ন্যায় চপল, যৌবন তরঙ্গের ন্যায় ক্ষণস্থায়ী; অতএব উহাদের প্রতি অত্যাসক্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক যাঁহারা একান্ত প্রাণে ভবভয় হারী, নরকান্তকারী ও নরকান্তিধারী শ্রীহরির পাদপদ্মকে আশ্রয় করিয়াছেন, তাঁহারাই এই সংসারে সারগ্রাহী এবং সাধু ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।" তাই ভক্তাগ্রগণ্য দৈত্যকুল প্রদীপ প্রহ্লাদ তাঁহার পিতা অসুরাধিপতি হিরণ্য-কশিপুকে প্রশ্নোত্তরে বলিয়াছিলেন :—

"তৎ সাধু মন্যেঽসুরবর্য্য দেহিনাং
সদা সমুদ্বিগ্নধিয়ামসদ্‌গ্রহাৎ।
হিত্বাত্মপাতং গৃহমন্ধকূপং
বনং গতো যদ্ধরিমাশ্রয়েত॥"

ভাবার্থ এই যে, 'হে অসুরাধিপতে! সর্ব্বদা 'আমি' 'আমার' ইত্যাদি অসদভিনিবেশ হেতুক অতিশয় চঞ্চলমতি মানবগণের আত্মার অধঃপতনের হেতুভূত অন্ধকূপ সদৃশ যে গৃহ, তাহাতে অত্যন্ত অভিনিবেশ পরিত্যাগ করিয়া একান্তপ্রাণে যে হরির আশ্রয় গ্রহণ করা, ইহাই আমি শ্রেষ্ঠ মনে করি'।

অতএব, আমরা কার? কোথা হইতে আসিয়াছি? এই যে আমাদের বলা ইহাই বা কি? পুত্রই বা কে? এবং এই বিচিত্র সংসারই বা কি? ইত্যাদি তত্ত্বের বিচারে আমাদের এই দুর্লভ মানব জীবন যাপন না করিয়া আত্মার অবনতির মূলীভূত অনিত্য পদার্থ সমূহকে নিত্য বা সত্য জ্ঞানে বৃথাভিমান বশতঃ 'আমার' 'আমার' করিয়া দুর্লভ জীবনকে ব্যর্থ করা কদাচই আমাদের উচিত নহে। সুরাপান সদৃশ অভিমানে মত্ত হইয়াই আমরা তত্ত্বজ্ঞানে বঞ্চিত। অভিমানরূপ সুরাপানের মত্ততা ছুটিয়া গেলেই তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয়। তাই রঘুবংশ-মণি শ্রীরামচন্দ্র জীবকে শিক্ষা দিবার জন্য তাঁর প্রিয়ভক্ত লক্ষ্মণকে উপলক্ষ করিয়া বলিয়াছিলেন :—

"পিতৃ মাতৃ সুত ভ্রাতৃদার বন্ধাদি সঙ্গমঃ।
প্রপায়ামিব জন্তূনাং নদ্যাং কাষ্ঠৌঘ বচ্চলঃ।"
"ছায়েব লক্ষ্মীশ্চপলা প্রতীতা, তারুণ্য মম্বূর্ম্মিবদধ্রুবঞ্চ।
স্বপ্নোপমং স্ত্রীসুখ মায়ুরল্পং, তথাপি জন্তোরভিমান এষঃ॥"

এই অভিমান বশতই অবিবেকী ব্যক্তি বিকারগ্রস্ত রোগীর প্রলাপ বাক্য কথনের ন্যায়, পুত্র, কলত্র, ক্ষেত্র, বিত্তাদি সকলই 'আমার' 'আমার' বলিয়া নিরন্তর চিৎকার করিয়া থাকে ও উহাদের প্রতি ঐকান্তিক প্রীতি প্রদর্শন করে। পরন্তু অবিদ্যা নাশিনী বিদ্যার সাহায্যে অভিমান দূর করিয়া বিষম ভবরোগ হইতে মুক্ত হইয়া, জীব যখন বিবেক সম্পন্ন হইয়া উঠে, তখন সকলই একমাত্র ভগবানের অথবা একমাত্র ভগবানই সকলের অথবা চরাচর সকলই ভগবান, এই জ্ঞানে সংসারের যাবতীয় পদার্থে ভগবানের সত্তানুভব করিয়া, পরমানন্দে নিমগ্ন হয়।

ভগবান সর্ব্বজীব ময়, ইহা অনুভব করিয়া গান্ধারী বলিয়াছিলেন 'হে ভগবন্! হে দেবাধিদেব! তুমিই আমার মাতা, তুমিই পিতা, তুমিই বন্ধু, তুমিই সখা, তুমিই বিদ্যা, তুমিই আমার ধন সম্পত্তি, অধিক আর কি বলিব তুমিই আমার সর্ব্বস্ব, আমার যাহা কিছু আছে সকলই তুমি'।

"ত্বমেব মাতা চ পিতা ত্বমেব ত্বমেব বন্ধুশ্চ সখা ত্বমেব।
ত্বমেব বিদ্যা দ্রবিণং ত্বমেব ত্বমেব সর্ব্বং মম দেবদেব"॥

জনক তনয়া সীতার উদ্ধারান্তে দেশাগমন সময়ে সস্ত্রীক ও সসৈন্য শ্রীরামচন্দ্র যখন ভরদ্বাজ-আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন, তখন আত্মজ্ঞ ঋষি ভরদ্বাজ শ্রীরামচন্দ্রকে স্তব করিতে করিতে বলিয়াছিলেন যে "হে রঘুবর! যাহা কিছু দৃষ্ট শ্রুত বা স্মৃত হয়, তৎ সমস্তই তুমি; তোমা ভিন্ন আর কিছুই নাই।"

"দৃশ্যতে শ্রূয়তে যদ্‌যৎ স্মর্য্যতেবা রঘুত্তম।
ত্বমেব সর্ব্বমখিলং ত্বদ্বিনান্যন্ন কিঞ্চন""

অতএব তত্ত্বজ্ঞান বা আত্মজ্ঞান বিনা সকলই ব্যর্থ; কারণ অজ্ঞান বা মায়া সত্ত্বে 'কেহই কাহারও নয়, আমিও আমার নয়, এ জ্ঞান কিছুতেই লাভ করিতে পারা যায় না। পরন্তু জ্ঞানরূপ ভাস্করের উদয় হইলেই অজ্ঞান-তিমির বা মায়া কু আশা আপনা আপনিই বিনষ্ট হইয়া যায় ও ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির ন্যায় "আত্মবন্মন্যতে জগৎ" এই অদ্বৈত ভাবের আবির্ভাব হয়; সুতরাং তখন জগৎ ও জগতে যা কিছু থাকে, সকলেই আত্মজ্ঞান স্ফূর্ত্তি পায়। ভিন্ন ভাব বা ভেদ জ্ঞান একেবারেই থাকে না। অদ্বৈত ভাবে বিভোর হইয়া জীব তখন পূর্ণানন্দ লাভ করে। যে পূর্ণজ্ঞান লাভ হইলে জানিতে আর কিছুই বাকি থাকে না এবং অপর লাভকে তাহার অপেক্ষা অধিক মনে করা যায় না।

"যংলব্ধাচাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।"

শ্রীভূপতিচরণ বসু।

বর্ষ-শেষ-বিজ্ঞপ্তি

সহৃদয় পাঠক পাঠিকাগণ শ্রীভগবানের কৃপায় বহুবিধ বাধা বিপত্তি অতিক্রম করিয়া আপনাদিগের স্নেহ পালিত। 'ভক্তি' আর একটি বর্ষ পূর্ণ করিতে সমর্থ হইল। শ্রাবণ মাসে ১৯শ বর্ষ পূর্ণ হইল, এই ভাদ্র মাসে ভক্তি বিংশ বর্ষে পদার্পন করিবে। মনের আবেগে ভক্তের পবিত্র হৃদয়ের ভাবের উচ্ছ্বাসে এতদিন নানাস্থানীয় ভক্ত লেখকগণের নানাবিধ গদ্য পদ্য প্রবন্ধালঙ্কারে আপনারা ভক্তিকে বিভুষিত দেখিয়া আসিতেছেন, এখনও বহু প্রবন্ধ আমাদের নিকট মজুত আছে যাহা প্রকাশ করিবার স্থান পাই নাই। এমন কি প্রাপ্ত প্রবন্ধের বাহুল্য নিবন্ধন নিজের বা দু'একজন বিশিষ্ট লেখক বন্ধুর প্রবন্ধও প্রকাশ করিতে পারি নাই, তবে আশা আছে ক্রমে ক্রমে সে সমস্তই প্রকাশ করিব।

'ভক্তি'র প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গীয় বেদান্তরত্ন মহাশয়ের পদানুসরণ করিয়া ভক্তগণের লিখিবার উৎসাহই আমাকে অবিচারে সকল প্রবন্ধ প্রকাশ করিতে বাধ্য করিতেছে। লোকের সুখ্যাতি বা আর্থিক লাভের প্রত্যাশা করিয়া 'ভক্তি' পত্রিকা প্রকাশ করিবার প্রবৃত্তি ছিল না বর্ত্তমানেও নাই; আর ভবিষ্যতে যাহাতে সেরূপ প্রবৃত্তি না আসে সে জন্যও আপনাদিগের নিকট কৃপা ভিক্ষা করিতেছি। সাধকরূপ মহাজনগণের নিকট হইতে কিছু কিছু সংগ্রহ করিয়া সাধন তত্ত্বান্বেষীগণের নিকট পৌছাইয়া দিব ইহাই আশা। বলিতে পারিনা আজ উনিশ বৎসর যাবৎ চেষ্টা করিয়া তাহাতে কতদূর কৃতকার্য্য হইতে পারিয়াছি।

অনেক সময় 'ভক্তি'তে এমন অনেক প্রবন্ধ প্রকাশ হয় যাহা অনেকের আবশ্যক হয় না, কিন্তু তাহা বলিয়া ঐসকল প্রকাশ করিতে প্রতিনিবৃত্ত হইতে পারিনা। কারণ হাটের প্রত্যেক বস্তু প্রত্যেকের প্রয়োজন বা প্রীতি সম্পাদনে সমর্থ না হইলেও প্রত্যেক বস্তুই যেমন কোন না কোন ব্যক্তির অবশ্য প্রয়োজন হইয়া থাকে। এওঠিক সেইরূপ—গদ্য বা পদ্য প্রবন্ধগুলির মধ্যে এক শ্রেণীর লোক যেগুলিকে যত্ন করিতেছেন না অপর শ্রেণীর লোক ঠিক সেইগুলিদ্বারাই বিশেষ উপকার পাইয়া আমাদিগকে পত্রাদি লিখিয়া থাকেন, কাজেই আমরা সকল প্রকারের প্রবন্ধই প্রকাশ করিতে বাধ্য

হই। আরও এককথা—ভক্তের যাহা মনের ভাব, ভাবুকের যাহা হৃদয়ের উচ্ছ্বাস তাহাতে জীবের হিত ভিন্ন অহিত কখনই হইতে পারেনা। এইরূপ নানা প্রকার ভাবিয়া আমরা সকল প্রবন্ধই প্রকাশ করিয়া থাকি। ভক্তগণ দুঃখিত হইবেন না—এই প্রত্যাশায়ই আমরা লাভ লোকসানের দিকে দৃষ্টি নারাখিয়া এই দারুণ অর্থ সমস্যার দিনে 'ভক্তি' বন্ধ না করিয়া প্রায় তিন গুণ বেশী খরচ করিয়া 'ভক্তি' প্রকাশে উদ্যোগী হইলাম।

এই উনবিংশ বর্ষে আমাদের ক্রটি-বিচ্যুতি যথেষ্ট হইয়াছে, তাহার প্রধান কারণ প্রেসের গোলমাল। এক বৎসরের মধ্যে আমাদিগকে বাধ্য হইয়া তিন বার প্রেস পরিবর্ত্তন করিতে হইয়াছে যেখানেই কার্য্য করিবার জন্য প্রস্তুত হই—সেই খানেই প্রথমে খুব উৎসাহপূর্ণ বাক্য দ্বারা কার্য্য হাতে লইয়া প্রেসের কর্ম্মকর্ত্তা ক্রমে কার্য্যে ঢিলা দিয়া থাকেন, তারপর আজকাল ডিক্লারেশন্ প্রভৃতির ব্যাপার যে কত কষ্টকর তাহা ভুক্তভোগী ভিন্ন কেহ জানে না। যাহা হউক অনেক চেষ্টার পর বর্ত্তমানে যে প্রেসে ছাপার ভার অর্পন করিয়াছি তাহার ম্যানেজার মহাশয় খুব ভরসা দিয়াছেন (বর্ত্তমানে কার্য্যেও দেখাইতেছেন) যে প্রতি মাসের প্রথমেই আপনার পত্রিকা বাহির হইবে। আমাদের আর বলিবার কিছু নাই এখন সেই সর্ব্বনিয়ন্তা শ্রীহরির উপর নির্ভর করিয়াও আপনাদিগের কৃপা স্মরণ করিয়া আগামী বিংশ বর্ষের জন্য প্রস্তুত হইলাম। আশা—পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় আপনারাও গ্রাহকগণও আমাদিগকে উৎসাহিত করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না।—

বিনীত

সম্পাদক